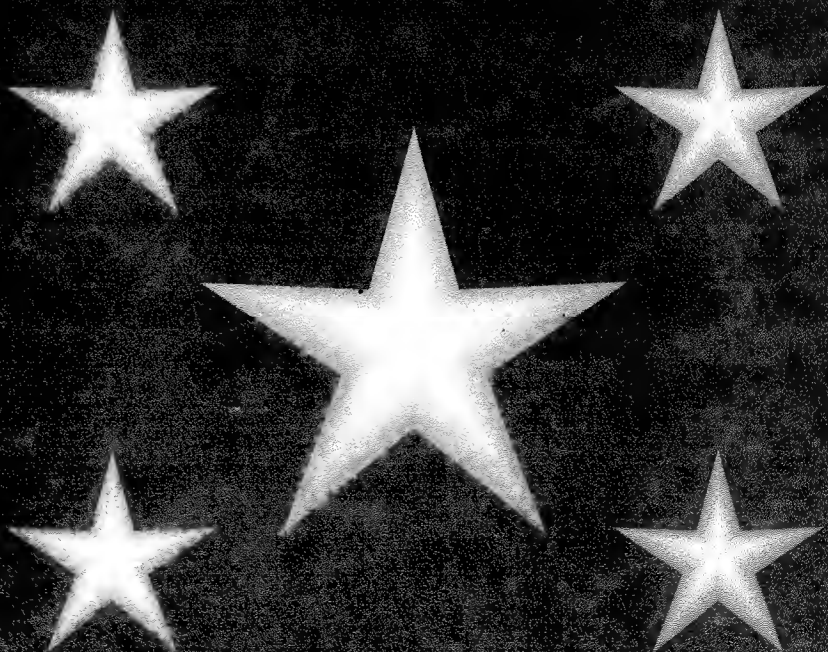


মাওলার অভিষেক

ও

মতভেদের কারণ



সদর উদ্দিন আহমদ চিশ্তী

প্রথম প্রকাশ :	ফেব্রুয়ারি,	১৯৯৯ ইং
পুনর্মুদ্রণ :	ফেব্রুয়ারি,	২০০৩ ইং
পুনর্মুদ্রণ :		২০১১ ইং
পুনর্মুদ্রণ :	আগষ্ট,	২০১৪ ইং

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বিশিষ্ট বর্ম বিজ্ঞানী দার্শনিক সূফী সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী কর্তৃক লিখিত এবং প্রকাশিত সকল পুস্তকাদির বিষয়ে ঢাকার ১ম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব হোসেনেআরা আক্তার দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৩০/২০১০ এ তাহার প্রদত্ত ৬/১০/২০১৩ইং তারিখের রায় এবং ১০/১০/২০১৩ইং তারিখের ডিক্রীমূলে ঘোষণা প্রদান এবং আদেশ করেন যে, জনাব সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী কর্তৃক লিখিত সকল পুস্তকাদির কপি রাইট তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীণের উপর উত্তরাধিকারীসূত্রে অর্পিত আছে মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন এবং তাহার উত্তরাধিকারী ব্যক্তি অনা কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপরোক্ত পুস্তক গুলির বিকৃতকরণ, মুদ্রণ এবং বিলিবিবরণের উপর চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী দ্বারা চিরস্থায়ী ভাবে নিবৃত্ত করেন।

প্রাপ্তিস্থান

চিল্লা ঘর
 দরবারে খাজা বারাহিণী দরবার শরীফ।
 জায়লস্কর, দাগনভূঞা, ফেনী।
 মোবা : ০১৭৯০-৬৫৯৫২৬

ইমামিয়া চিশ্তীয়া নেজামিয়া সংঘ
গ্রাম : চুনকুটিয়া গুভাচ্যা (আমিন পাড়া)
দক্ষিণ কোরাণীগঞ্জ, ঢাকা
মোবা : ০১৭১২-০২১৪০৫

হেরাবন চিশতীয়া দরবার
১৩৪, পশ্চিম জুরাইন (তুলা বাগিচা)
ঢাকা-১২০৪
মোবাস : ০১৯২২-৯১৩৯১০

সৈকত স্টোর
চান্দিন্দা পশ্চিম বাজার, কুমিল্লা।
মোবা : ০১৫৫৫-০২৬২২৩
০১৭৪০-৬২৮০৭০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
মাওলার অভিষেক	৯
১. শানে নজুল	১১
২. একটি হাদিস	১৬
৩. মোসলেম ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু মাওলাইয়াত	২০
৪. খেলাফতের ক্ষমতা	২১
৫. রাসুলুল্লাহর (আ) জামালী ও জালালীরূপ	২২
৬. মাওলাইয়াতের প্রতি খেলাফত	২৪
৭. মাওলাইয়াত বিরোধী উক্তি ২ : ২৪৬-২৫২	২৪
৮. আয়াত সাতটির উপর সমালোচনা ও মন্তব্য	২৬
৯. (৫ : ৬৭) এর উপর একটি মন্তব্য	৩১
১০. কোরান হইতে দ্বিতীয় উদ্ধৃতি	৩৩
১১. মাওলাইয়াত বনাম খেলাফত	৩৭
১২. হিজরী সন প্রবর্তনের ইতিবৃত্ত	৪০
১৩. লোক পরম্পরায় কথিত দুইটি ঘটনা	৪২
১৪. উলিল আমর এবং আল্লাহর খেলাফত	৪৩
১৫. হাদিসে কেরতাস	৪৪
১৬. ইয়াওমাল খামিস	৪৮
১৭. পরম্পর তুলনীয় কথা দুইটি	৪৯
১৮. মোহাম্মদী ধর্মের অপমৃত্যু	৫০
১৯. মাওলা আলীর একটি ভাষণ	৫২
২০. নবুয়তের প্রচার এবং রেসালত পালনের দায়িত্ব অর্পণ	৫৪

উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী অভিষেক ক্রিয়া সেখানেই সম্পন্ন করা হইলে পর কোরানের শেষ আয়াত নাজেল হইল [যাহা (৫ঃ৩) এর মধ্যখানে বসান হইয়াছে] :

২। আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীন হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে আর ভয় করিও না, ভয় কর আমাকে। আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের পরিপূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের দ্বীন ইসলামের উপর আমি রাজি হইলাম। (১৫ পৃষ্ঠায়) আল্লাহ হইতে অবতীর্ণ এই সর্বশেষ আয়াতটিকে যে আয়াতের মধ্যবর্তী একটি অংশ হিসাবে স্থান দেওয়া হইয়াছে সে আয়াতটির সম্পূর্ণ অনুবাদ নিম্নরূপ (৫ঃ৩) :

তোমাদের জন্য (খাদ্য হিসাবে) হারাম করা হইয়াছে শব এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং যাহা আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গিত হইয়াছে এবং গলা চাপিয়া মারা (জন্তু) এবং প্রহারে মৃত (জন্তু) শৃংগাঘাতে মৃত (জন্তু) এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া (জন্তু), তবে জবেহ দ্বারা যাহা পবিত্র করিয়াছে তাহা ব্যতীত এবং যাহা (মূর্তিপূজার) বেদীর উপর জবাই দেওয়া হয় এবং জুয়ার তীর দ্বারা অংশ নির্ণয়কৃত মাংস। এই সবই ফাসেকী। আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীন হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে আর ভয় করিও না, ভয় কর আমাকে। আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের পরিপূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের দ্বীন ইসলামের উপর আমি রাজি হইলাম।

সুতরাং যে ব্যক্তি, পাপের দিকে ঝুকিয়া নয়, ক্ষুধায় কাতর-তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ (তাহার প্রতি) ক্ষমাশীল রহিম।

কোরানের শেষ অবতীর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ এই অহি বাক্যটি যাহা গাদিরে খুমে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা এমন জায়গায় স্থাপন করা হইয়াছে যাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র খাদ্যের ভাল-মন্দ (এই আয়াতের নির্দেশ মতে) বিচার করিয়া খাইলেই ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই আয়াতটি হইল খাদ্য বাছাই করা বিষয়ে একটি সাধারণ ব্যবস্থা। অথচ মধ্যবর্তী কথাটি ইহাতে স্থাপন করাতে মনে হয় দেখিয়া গুনিয়া খানা খাইলেই দ্বীন কামেল হইয়া যায় অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ হইতে খাদ্য সম্বন্ধে এই বিধান পালনের অভ্যাস আমরা জন্মগতভাবেই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি।

ইহাতে আমাদের দ্বীন ইসলাম আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে কি? অপরপক্ষে নবীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকট আনুগত্যের শপথ অটুট রাখিলেই দ্বীন-এ মোহাম্মদী আমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়া সমাজে উহা বিরাজিত থাকিতে পারে।

“ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ” পুস্তকে তিনটি প্রবন্ধ আছে। প্রথমটি ‘নসখ’ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাহার রাসুল কর্তৃক কোরান ও হাদিসের কোন কোন কথা বাতিল এবং অদল-বদলকরণ। আল্লাহ ও তাহার রাসুল কোন কথা অদল-বদল অথবা বাতিল করিয়াছেন বলিয়া আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। দ্বিতীয় প্রবন্ধ হইল : রাসুল্লাহ আলাইহে সালাতু আসসালামের ইহধাম ত্যাগ করার পর তাহার নিয়োজিত ‘অসি’ বা স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি কিরূপ জীবন কাটাইয়াছিলেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র বা জীবনালেখ্য। তৃতীয় প্রবন্ধ হইল “আশশারে মোবাশ্শারা” কথাটির উপর এবং সবার শেষে রহিয়াছে আমাদের দলীয় ধর্ম বিশ্বাসের মূলনীতিসমূহের একটি তালিকা। ইহাতে বিপরীত এবং প্রচলিত মতবাদ সহকারে ২৩টি দফার উল্লেখ করা হইয়াছে।

যদিও দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নামকরণ করা হইয়াছে “রাসুল্লাহর পর মাওলা আলীর অবস্থা,” আসলে ইহাতে রহিয়াছে রাসুল্লাহর পরলোকগমনের পর বৈষয়িক ক্ষমতার কোন্দলের মধ্যে ইসলাম ধর্মের চরম দুর্গতি এবং অধঃপতনের একটু পরিচয়।

রাসুল্লাহর পরে তাহার প্রচারিত ইসলামের উপরে শাসকগণের অত্যধিক অস্ত্রোপচার এবং রদবদলের ফলে ইসলাম ধর্ম ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্রমে বহুরূপ ধারণ করিয়াছে, যাহার ফলে ইহার সত্য উদ্ধার করা বর্তমান কালে বিষম একটি কঠিন বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে এই কারণেই অত্যধিক ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম-বিজ্ঞানী পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। ধর্মের নামে যেসব বিধান চলিতেছে তাহা আসলে আল্লাহর নামে “রাজকীয় ধর্ম”। মূর্তিপূজা পরিত্যক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু মানুষ স্বাধীন হইতে পারে নাই। মানুষ আল্লাহর দাস না হইয়া অবশেষে আরব সাম্রাজ্যবাদের দাসে পরিণত হইয়াছিল। আরব জাতি রাসুলের আনীত মুক্তির বাণী ব্যর্থ করিয়া দিল। রাজ্য জয়ের মধ্যে ইসলামের জয় ছিল না।

যদিও মোহাম্মদী ইসলামের জন্য মক্কায়, কিন্তু সেখান হইতে লাঞ্চিত-বিতাড়িত হইল। মদিনায় আশ্রিত হইয়া অতিকষ্টে বড় হইল। উমাইয়া

রাজশক্তির কবলে পড়িয়া দামেস্কে উহা পচিয়া গেল এবং আব্বাসী রাজশক্তির কবলে পড়িয়া বাগদাদে উহা মরিয়া গেল।

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম উল্লেখের সঙ্গে তাঁহাদের জন্য যথাযোগ্য সম্মানসূচক কথা নামের সঙ্গে পুনঃপুনঃ লেখা হয় নাই। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহাদের নামের সঙ্গে যথাস্থানে যাহা পাঠনীয় তাহা পড়িয়া লইবেন। যথা : “আলাইহে সালাতু আস্‌সালাম,” “আলাইহে সালাম,” “সালামাল্লাহে আলাইহে,” অথবা “সালামাল্লাহে আলাইহা,” “রাজি আল্লাহ্ আনহু,” “রহমতুল্লাহ আলাইহে,” ‘হযরত’ ইত্যাদি। এইরূপ না পড়া কার্পণ্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেয়াদবীও বটে।

নিবেদক

সদর উদ্দিন আহমদ চিশ্তী

মাওলার অভিষেক

ও

ইসলাম ধর্মে

মতভেদের কারণ

**গাদিরে খুমের ঘটনাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে এমন কিছু পুস্তক
পুস্তকের নাম লেখকের নাম**

১. তফসীরে দুরে মনসুর জালাল উদ্দিন সিউতি
২. তফসীরে আল কাশশাফ ওয়াল বায়ান আবু ইসহাক সায়ালবী
৩. তফসীরে গারায়েবুল কোরান আল্লামা নেশাপুরী
৪. উসুলে কাফি মোহাক্কেক কালীনী
৫. সরহে নাহজুল বালাগা ইবনে আবি আল হাদিদ মোতাজেলী
৬. মসনদ ইমাম আহমদ ইবনে হামল
৭. সওয়ায়েকে মাহরেক হাফেজ ইবনে হাজার মক্কি
৮. আবাকাতুল আনওয়ার আল্লামা সৈয়দ হামিদ
৯. আল গাদির, দানেশ মন্দ মহরম শেখ আবদুল হোসাইন আহমদ আমিনী
১০. তারেখে রাসুল অল মুলুক মোহাম্মদ ইবনে জরির তাবারী
১১. মুরুজ আজজাহাব আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী আল্ মাসয়দী
১২. এসবাত্তে অছিয়ত আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী আল্ মাসয়দী
১৩. সাজারাতাল জাহাব ইবনেল এমাদ
১৪. তারিখ শায়েরী লে সাদরুল ইসলাম আবদাল মাসিহ এনতাকী বেগ
১৫. আল ফেতনাতুল কুবরা ডাক্তার তাহা হোসাইন
১৬. ঈদে গাদির বুলেস সালাসা
১৭. দি স্পিরিট অব ইসলাম সৈয়দ আমীর আলী
১৮. দি শিয়া আইট রিলিজিয়ন ডোরায়েট এম. ডোনাল্ড সেন
১৯. আল গাদির (১৮ খণ্ড) সৈয়দ আল আমিনী

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।

শানে নজুল

রাসূলুল্লাহ (আ) জীবনে একবার মাত্র হজ পালন করিয়াছিলেন। মক্কা শহরকে চির বিদায় জ্ঞাপন করিয়া তিনি জনাস্থান ত্যাগ করিলেন। এইজন্য ইহাকে “বিদায় হজ” বলা হয় এবং তাঁহার দেওয়া এই ভাষণকে “বিদায় ভাষণ” বলা হয়, যেহেতু ইহা ছিল জন্মভূমির প্রতি শেষ ভাষণ।

মক্কায় অবস্থিত সকলকে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া নিজে এহরামের পোশাক না ছাড়িয়াই মদিনার পথে রওয়ানা হইলেন। প্রায় সোয়া লক্ষ লোক তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন।

পথে ১৮ই জিলহজ তারিখে যখন তিনি “গাদিরে খুম” নামক জায়গায় উপস্থিত হইলেন তখন এই আয়াত নাজেল হইল :

হে রাসূল, আপনার রব হইতে যাহা নাজেল করা হইয়াছে তাহা পৌছাইয়া দিন। আর যদি তাহা না করেন তাহা হইলে তাঁহার (আল্লাহর) রেসালত পৌছাইয়া দেওয়া হইল না। আল্লাহ আপনাকে মানবমণ্ডলী হইতে লইয়া আসিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের দলকে হেদায়েত করেন না (৫৪৬৭)। ইহা কোরানের সব শেষের আগের আয়াত।

This verse of the Quran is the last but one according to chronology of time.

শেষ কথাটির প্রকৃত অনুবাদ হইল : আল্লাহ আপনাকে মনুষ্য হইতে (সরাইয়া) তাঁহার সঙ্গে লাগাইয়া লইতেছেন বা লইবেন।

ইহাতে বলা হইল : হে রাসূল, যে কথা আলীর মাওলাইয়াত ঘোষণা করার বিষয়ে নাজেল করা হইয়াছিল তাহা এখন পৌছাইয়া দিন। আর তাহা যদি না করেন তবে আল্লাহর রেসালত মানবমণ্ডলীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হয় না, কারণ শীঘ্রই আল্লাহ আপনাকে জনমণ্ডলী হইতে তাঁহার গভীর সান্নিধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, অর্থাৎ আপনার পার্থিব কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে। এমতাবস্থায় যদি নবুয়তের কার্যাবলীর এন্তেজাম করার যোগ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া জনগণের কাছে তাহাকে তুলিয়া না দেন তাহা হইলে আল্লাহর রেসালত জনগণের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হইল না।

‘রেসালত’ অর্থ প্রতিনিধিত্ব। নবী বিদায় লইতেছেন। নবী আল্লাহর প্রতিনিধি। আলীকে (আ) আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। নবীর পরে রেসালতের কাজে আলীই (আ) হইলেন তাঁহার একমাত্র যোগ্য প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আলীকে (আ) জনমণ্ডলীতে রাসুলের পরে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করার নির্দেশক সংবাদ নাজেল করা হইয়াছিল এর কিছুকাল আগেই। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (আ) তাহা তখন প্রচার করা স্থগিত রাখিয়াছিলেন বিশেষ কোন একটি কারণে। এ নির্দেশক সংবাদ নাজেল হওয়ার সময় উহা প্রকাশ না করিয়া বিরাট জনতার মধ্যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ পরিবেশ এবং উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, তিনি বেশ জানিতেন আলীর (আ) এই মাওলাইয়াত বা প্রতিনিধিত্ব হিংসার বশবর্তী হইয়া লোকেরা অস্বীকার করিবে এবং আলীর (আ) বংশধরের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত এবং যড়যন্ত্র চলিতে থাকিবে যাহার ফলে ধর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

এইজন্য তিনি ঐ পরিস্থিতিতে নাজেল করা সংবাদটি জনগণের নিকট না পৌছাইয়া উহাকে কার্যকরী করার জন্য আদেশ দানের অপেক্ষায় রহিলেন। যাত্রাপথে গাদিরে খুম নামক জায়গায় উহা কার্যকরী করার জন্য আল্লাহতা’লা পুনরায় আদেশ দান করিলেন।

রাসুলের (আ) এই ভাবের উপর আল্লাহর যে নির্দেশ হইয়াছিল তাহার উপর টীকা করিতে যাইয়া তফসীরে কাশশাফ লিখিয়াছেন, “হজসে যব তোম ফারেগ হো তব আলীকো মোকাররার কার দো।”

কাজেই হযরত আলীর (আ) মাওলাইয়াতের নির্দেশক সংবাদ আল্লাহ আগেই দিয়াছিলেন, এখন তাহা কার্যকরী করার জন্য আদেশ দান করিলেন।

পথে অহি লাভের আশা করিয়াই তিনি “এহরাম বস্ত্র” পরিধান করা অবস্থাতেই রওয়ানা হইয়াছিলেন, যাহাতে লোকেরা এই অহির গুরুত্ব অত্যধিক মনে করে। একেতো আল্লাহ হইতে অহি, তাঁহার উপর নবীর এহরাম অবস্থায় এবং বিরাট জনতার মধ্যে উহার আগমন এবং ঘোষণা। লক্ষাধিক লোক মিলিয়া সেই অহিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আফসোস, রাসুলুল্লাহ (আ) যে আশঙ্কা করিয়া ছিলেন পরবর্তীকালে তাহাই ঘটিল। নবীর অন্তর্ধানের পরে এই নির্দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া সমাজ হইতে এই কথাটির প্রকাশ পর্যন্ত আরও পরবর্তীকালে অর্থাৎ খোলাফায়ে

রাশেদীনের পরে একেবারে পাল্টাইয়া দেওয়া হইল যদিও আসল ভাবটি জগত হইতে একেবারে মুছিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। রাসুল (আ) ইহা জানিতেন বলিয়াই অত্যধিক সংখ্যক লোককে ইহার সঙ্গে জড়াইয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহার প্রচারিত দ্বীন পৃথিবী হইতে একেবারে মুছিয়া না যায়।

‘গাদির’ অর্থ জলাশয়। জায়গার নাম খুম। খুমের জলাশয়ের নিকটবর্তী হইলে উক্ত আয়াত এইরূপে নাজেল হইয়াছিল :

“ইয়া আইউহার রাসুল বাল্লেগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বেকা আন্না আলীউন মাওলাল মোমেনীন। অইন লাম্ তাফআল ফামা বাল্লাগতা রেসালাতাহ। আল্লাহ ইয়া, সেমুকা মিনান নাস।”

ইহা হইতে “আন্না আলীউন মাওলাল মোমেনীন” কথাটি কোরান হইতে বাদ দিয়াছে। মুসা নবীর সঙ্গে যেমন হারুনের (আ) নামও কোরানে উল্লেখ আছে, সেইরূপ আলীর (আ) নামও আল কোরানে কয়েকবার ছিল। কিন্তু তাঁহার নামের উল্লেখসমূহ খলিফা ওসমানের (রা) প্রকাশনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।*

এই আয়াত নাজেল হইলে রাসুল পাক সেখানেই থামিয়া গেলেন এবং বাহন হইতে নামিয়া গেলেন। কাফেলার অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদবর্তী সকলকে একত্র করিয়া সেখানেই আলীর (আ) অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

* ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন, আবু সাঈদ খুদরী হইতে উক্ত আয়াত হযরত আলীর শানে নাজেল হইয়াছে। ইবনে মারদুইয়া ইবনে ওমর হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরা উক্ত আয়াত রাসুলের (আ) সম্মুখে এইভাবে পড়িতাম :

أَنزَلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكَ أَنَّ عَلِيًّا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لَمْ تَفْعَلْ

তফসীরে দোররে মনসুর

মোস্তা জালালউদ্দিন শিউরী

২য় খণ্ড, মিশর থেকে প্রকাশিত।

উটের উপরে বসিবার কয়েকটি আসন একের পর এক স্থাপন করিয়া মিম্বার তৈরী করা হইল। উহার উপর উঠিয়া রাসুল (আ) জনতার নিকট অবতীর্ণ বাণী পেশ করিলেন, তারপর নিম্নলিখিত ছোট একটি ভাষণ দান করিলেন : “আলাসতু আওলা বেকুম্ মিন্ আনফুসিকুম?”

‘আওলা’ অর্থ নিজের জীবন হইতে যিনি অধিক প্রিয় এবং সর্ববিষয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তিনি আওলা। যাহার জন্য প্রয়োজন হওয়া মাত্র জীবন উৎসর্গ করা ওয়াজেব।

কালু : “বালা ইয়া রাসুলান্নাহ (আ)” অর্থাৎ আমি কি তোমাদের আপন জীবন হইতে অধিক আওলা নই? উত্তরে লোকেরা বলিল : হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া রাসুলান্নাহ (আ)।

জনগণ হইতে এই স্বীকৃতি স্পষ্টভাবে লাভ করার পর তিনি আলীর (আ) দুই বাহু ধরিয়া জনতার সম্মুখে তাঁহাকে শূন্য তুলিয়া ধরিলেন এবং বলিলেনঃ “মান্ কুনতুম মাওলাহ্ ফাহাজা আলীউন মাওলাহ্ আল্লাহ্মা ওয়ালে মান ওয়ালাহ্, আদা মান আদাহ্, অনসুর মান নাসারা, অখ্জুল মান্ খাজালা, ফাল্ ইয়াস হাদিল্ হাজেরুল খায়েরা।”

অর্থাৎ, “আমি যাহার মাওলা এই আলী তাহার মাওলা। হে আল্লাহ, তুমি তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর যে তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাঁহাকে শত্রুরূপে গ্রহণ কর যে তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করে এবং সাহায্য কর তাঁহাকে যে সাহায্য করে এবং লাঞ্ছনা দাও তাহাকে যে লাঞ্ছনা দেয়।”

জনতার মধ্যে “মারহাবা মারহাবা” ধ্বনি পড়িয়া গেল। রাসুলের (আ) আদেশ অনুসারে নবনিযুক্ত নেতার নিকট আসিয়া সকলেই আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করিল। হযরত ওমর (রা) বায়াত গ্রহণ করিতে যাইয়া যে সুন্দর বাক্যটি মাওলা আলীর (আ) প্রশংসায় উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ হাদিসে রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন : বাখ্ খীন্ বাখ্ খীন্ ইয়া আলী ইবনে আবিভালেব..... ইত্যাদি। অর্থাৎ তুমি ধন্য ধন্য হে আবু তালেবের সন্তান আলী ইত্যাদি।

তাঁহার কথার ভাবধারা এইরূপ ছিল : আজ হইতে তুমি সকাল-সন্ধ্যা প্রত্যেক মোমিন নরনারী কর্তৃক স্মরণীয় এবং প্রশংসিত হইয়া রহিলে। অর্থাৎ আল্লাহর এবাদত করিতে গেলে তাঁহার জন্য যে গুণকীর্তন করিতে হয় তাঁহার সঙ্গে নবীর মাধ্যম ব্যতীত উহা গৃহীত হয় না। আজ হইতে আলী (আ) সেই

স্থানের অধিকারী হইলেন। আল্লাহর গুণকীর্তনের সঙ্গে মাওলার উচ্ছ্বাস এবং মাধ্যম অবলম্বন করিতেই হইবে এবং শাসন ইত্যাদি সর্ববিষয়ে মাওলার সহায়তা করিতেই হইবে, কারণ তিনি হইলেন নবীর স্থলাভিষিক্ত।

এইরূপে যখন বায়াত গ্রহণের অনুষ্ঠানপর্ব শেষ হইল তখন এই আয়াত নাজেল হইল এবং ইহা হইল কোরানের শেষ অবতীর্ণ আয়াত :

আল ইয়াওমা ইয়া এসা আল্লাজিনা কাফারু মিন দ্বীনিকুম ফালা তাখ্শাওহুম্ অখ্শাওনী। আল ইয়াওমা আক্মালতু লাকুম্ দ্বীনাকুম্ অ আতমাম্ তু আলাইকুম্ নেয়ামাতী ওয়া রাজিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা। (৫৪৩)।

অর্থ : আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীন হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে আর ভয় করিও না, ভয় কর আমাকে। আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের পরিপূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের দ্বীন ইসলামের উপর আমি রাজি হইলাম। (অর্থাৎ তোমাদের আত্মসমর্পণজনিত ধর্মের উপর বা নীতির উপর আমি সন্তুষ্ট হইলাম)।

উম্মতে মোহাম্মদীর দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার ঘোষণা এবং তাহাদের উপর আল্লাহর নেয়ামত দান করা বিষয়টি সম্পূর্ণ হইয়া গেল। তাই রাসুল পাক (আ) আল্লাহর নিকট কর্তব্য সম্পাদনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন নিম্নে উল্লেখিত বাক্য উচ্চারণ করিয়া :

আল্লাহ্ আকবার। আল্ হামদো লিল্লাহ্ আলা আকমালে দ্বীনা ওয়া এতমামেন্ নেয়ামাতিন ওয়া রেজায়ে রাবি আলা রেসালাতী ওয়া বেলায়াতে আলী ইবনে আবি তালেব।

অর্থ : আল্লাহ মহানতর। দ্বীনকে কামেল করিয়া দেওয়ার উপর এবং নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়ার উপর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এবং আমার রেসালাতের (কর্তব্য পালনের) উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আবু তালেব নন্দন আলীর (আ) বেলায়েতের জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহর।

ভাষণদানকালে মধ্যে উঠিয়া যখন আলীকে (আ) দুই হাতে তুলিয়া ধরিলেন তখন রাসুলের (আ) শুভ বগল দেখা যাওয়ার উল্লেখও হাদিসে দেখিতে পাওয়া যায়। এহরামের পোশাক পরিহিত থাকার কারণেই সে অবস্থায় পবিত্র বগল দেখা গিয়াছিল। আলীর (আ) দুই বাহু ধরিয়া তাঁহাকে

তুলিয়া ধরার দৃশ্যটি এমন হইয়াছিল যেন তিনি ছোট একটি শিশুকে ধরিয়া জনগণের দিকে তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া দুই হাত উর্ধ্বে উঠাইয়া ধরিলেন।

একটি হাদিস

মেশকাত হাদিস গ্রন্থে গাদিরে খুমে'র হাদিসটি এইরূপ বর্ণিত আছে :

বারায়া ইবনে আজেব এবং জায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণনা করিয়াছেন : যখন রাসুলুল্লাহ (আ) গাদিরে খুমে আসিয়া অবতরণ করিলেন, আলীর (আ) হাত ধরিলেন এবং বলিলেন : তোমরা কি জান না যে, আমি মোমেনদিগের নিজদিগ হইতে অধিক আওলা? লোকেরা বলিল : হ্যাঁ। তিনি বলিলেন : তোমরা কি জান না যে, আমি প্রত্যেক মোমিনের নিজের প্রাণ হইতে অধিক আওলা? লোকেরা বলিল : হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন : হে আল্লাহ, আমি যাহার মাওলা আলীও তাহার মাওলা। হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি তাঁহাকে বন্ধু বানায় তুমিও তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও এবং যে তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করে তুমিও তাহার সঙ্গে শত্রুতা কর। অতএব ইহার পর (অর্থাৎ রাসুলের ভাষণ শেষ হওয়ার পর) ওমর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার অভিনন্দনে তাঁহাকে বলিলেন : হে আবু তালেব সন্তান, প্রত্যেক মোমিন নরনারীর মাওলা হিসাবে অভিনন্দিত হইয়া তুমি সকাল করিবে এবং সন্ধ্যা করিবে। (আহম্মদ)

আল হাদিস (মেশকাত) ৪র্থ খণ্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠা, ফজলুল করিম। উক্ত হাদিসের উপর একটি মন্তব্য :

আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুল হইলেন বিশ্বাসীগণের মাওলা। আল্লাহর রাসুল বিদায় নিতেছেন, তাই আল্লাহতা'লা তাঁহার স্থলে আলীকে (আ) বিশ্বাসীগণের মাওলা নিযুক্ত করিলেন। 'মাওলা' অর্থ আল্লাহর নিয়োজিত প্রভু। ইহা আল্লাহর দেওয়া প্রভুত্ব যাহাকে ইংরেজীতে 'Overlord' বলা হয়। ইহা হইল vested lordship.

যিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মাওলা নিযুক্ত হন তিনিই আওলা হইয়া থাকেন। মাওলা আলীকে (আ) মাওলা এবং আওলারূপে অভিনন্দন জানাইয়া হযরত ওমরও (রা) তাঁহার নিকট বায়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাসুলের (আ) এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে এই বায়াত ভঙ্গ

করিয়া ইহার বিরুদ্ধে বনি সাকিফায় ক্ষুদ্র একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় আবু বকর (রা) খলিফা হইলেন।

মাওলাইয়াতের বিরোধীতা করার জন্যই খেলাফত সৃষ্টি করা হইল। যে 'মানবতন্ত্র' হইতে উদ্ধারের জন্য নবী ও রাসুলগণ আসিয়া থাকেন এবং যাহা হইতে উদ্ধারের জন্য রাসুলুল্লাহ (আ) আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সবেমাত্র সফলতা অর্জন করিয়াছেন, সেই মানবতন্ত্রই আবার রাসুলের এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে আরববাসীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল।

রাসুলুল্লাহ (আ) গাদিরে খুমে মানুষের জন্য এই মুক্তির সনদ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন যে, মানুষ আল্লাহ ছাড়া কাহারও দাস নয়। খেলাফত আবার মানুষকে মানুষেরই দাস বানাইয়া দেওয়ার পথ খুলিয়া দিল। কায়েম হইল এক প্রকার 'জমহুরিয়াত' অর্থাৎ গণতন্ত্র, অর্থাৎ মানুষের রচিত তন্ত্র। সেই গণতন্ত্রও খেলাফতে রক্ষিত থাকে নাই।

মাত্র আড়াই বছর পরেই গণতন্ত্রমূলক নির্বাচন ত্যাগ করিয়া হযরত ওমরকে (রা) পরবর্তী খলিফা মনোনীত করা হইল। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেরাই তাহাদের রচিত গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিলেন। এখানেই স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং পরবর্তী রাজতন্ত্রের বীজ বপন করা হইল। এইরূপে দেখা গেল "মোহাম্মদী ইসলামী রাষ্ট্র" গণতন্ত্রে অবতরণ করিয়া আর কখনও তাহা হইতে উত্তরণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। মাওলা আলীর (আ) প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিল। তাঁহার শাসনের পর আর কখনও উহা উত্তরণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। চেষ্টা চলিয়াছিল কয়েকবার কিন্তু তাহা এত ক্ষীণ ছিল যে, সমর্থনের অভাবে তাহাদের অকাল মৃত্যু ঘটিল।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, খেলাফত 'মাওলাইয়াত'-এর জাহেরী অধিকার ছিনাইয়া লইয়াছিল এবং জনগণকে আল্লাহর প্রতিনিধির অধীনতা হইতে ছুটাইয়া নিয়া আবার মানবগোষ্ঠীর অধীনতায় লইয়া আসিল। অবশ্য মাওলাইয়াতের আধ্যাত্মিক অংশে খেলাফত কোন প্রকার হস্তক্ষেপ তখনও করে নাই। সুতরাং মাওলা আলী (আ) তাঁহার আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা স্বাধীনভাবে খেলাফতকালে প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। খেলাফত উহার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। উহার প্রতিদানে মাওলাও খেলাফতের পার্থিব ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। ফলতঃ

দেখা গেল খলিফাগণের সঙ্গে মাওলার মতভেদ ছিল অনেক, কিন্তু ক্ষমতা অধিকারের বিরোধ ছিল না। সেইহেতু খেলাফতকালের শাসকগণকে “খোলাফায়ে রাশেদীন” বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ “সুপথে চালিত খলিফাগণ।” অবশ্য ইহা সংখ্যাধিক দলের মতব্য। সর্বদলীয় স্বীকৃত মতব্য নহে।

খেলাফত ছিল এক প্রকার দ্বীন ও দুনিয়ার সম্মিলিত রাজত্ব। দুনিয়াদারগণ দুনিয়ার রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দ্বীনদার আলী (আ) দ্বীনের সম্রাটরূপে আধ্যাত্মিক রাজ্যে, মানুষের মনোরাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দুনিয়াদার খলিফাগণ দুনিয়াদারী ব্যাপারে খুব দক্ষতার সহিত রাজ্য বিস্তার এবং ক্ষমতার বিভব প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন মানুষের প্রতিনিধি ‘খলিফা’ রূপে।

অবশ্য প্রশ্ন আসে তাঁহারা কাহার খলিফা? আল্লাহরও নয়, রাসুলেরও (আ) নয়। তাঁহারা জনগণের দ্বারা জনগণের খলিফা। তাহাও আবার কেহ নির্বাচিত, কেহ মনোনীত, কেহ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অন্য এক প্রকারে মনোনীত।

প্রারম্ভেই যদি উহার বিরুদ্ধে আলী (আ) অস্ত্রধারণ করিতেন তাহা হইলে রাষ্ট্র গঠন হইত না। মোহাম্মদী ইসলামের আদর্শ প্রসারের সকল সম্ভাবনা সেখানেই শেষ হইয়া যাইত। এইজন্য মাওলা আলী (আ) খামোস ছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আলীর (আ) কার্যক্রমের উপর রাষ্ট্র কোন প্রকার বাধা না দিলেও রাষ্ট্র মোহাম্মদী ইসলামের মধ্যে অনেক প্রকার নববিধান প্রণয়ন করিয়া উহার গতিধারাকে ভিন্নমুখী করিয়া তুলিতেছিল অতি ধীরে ধীরে। খলিফা ওমর (রা) রাসুলের নীতি ত্যাগ করিয়া অনেকগুলি রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় নব-বিধান জারি করিলেন। সেইগুলি মোহাম্মদী ধারা হইতে ব্যতিক্রম ছিল।

হযরত ওমরের সেই সব ‘বেদাত’ অর্থাৎ নববিধানকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করিবার জন্যই আব্বাসীয় যুগে উহার সমর্থনে হাদিস রচনা করা হইল। তাহা এতদূর পর্যন্ত গড়াইল যে, খলিফা ওমর নবী হওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু যেহেতু নবুয়ত খতম হইয়া গিয়াছে তাই আল্লাহ তাঁহাকে নবী বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। এই রকম মিথ্যা বহু হাদিস রচনা করিতে দ্বিধা করে নাই। মূর্তিপূজারীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং নিজেও মূর্তিপূজায় লিপ্ত

হওয়ার পর আত্মগুপ্তির সাহায্যে নবীর পর্যায়ভুক্ত হওয়া যায় না। নবীগণ মাসুম হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন।

এইরূপে বহুবিধ কথা রচনা করিয়া এক প্রকার “সরকারী ইসলাম” রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রচারের সাহায্যে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিল। ‘মসজিদগুলি’ রাষ্ট্রের বেতনভোগী কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে মিথ্যার প্রচারকার্য সহজেই হইতে পারিয়াছিল। এ সবই অনেক পরবর্তী কথা।

খেলাফতের পরে ঘটনাচক্রে মাওলা আলীকে ক্ষমতায় বসান হইল। মাওলা আলীর শাসনকালে তিনি বিদ্রোহ দমন করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে গুপ্তঘাতকের হাতে আক্রান্ত হইয়া শাহাদাত বরণ করিলেন। এর ফলে আমির মাবিয়া আরও ক্ষমতাসালী হইয়া উঠিল এবং সরাসরি এমন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল যাহার নীতির সঙ্গে মোহাম্মদী ধর্মের কোন মিল আর রহিল না। এরপর বিশ্বাসঘাতক আমির মাবিয়া ইমাম হাসানের (আ) সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করিয়া এজিদকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়া গেল এবং হোসাইন (আ) হইতে বায়াত গ্রহণের জন্য কেমন করিয়া কৌশলের সহিত চাপ সৃষ্টি করিবে, এ সমস্ত এজিদকে শিখাইয়া গেল। মাওলাইয়াতকে এখন সরাসরিভাবে রাজতন্ত্রের আনুগত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। ইমাম হোসাইনের (আ) আশ্রয় আর রহিল না। কারবালাতে আত্মাহুতি দিয়া অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে মহানতম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় আর রহিল না।

মাওলা জীবন দিলেন কিন্তু মিথ্যার নিকট আনুগত্য গ্রহণ করিলেন না। এখন হইতে মোহাম্মদী ধর্মের বিশ্বাসী মোমিনগণ সরাসরিভাবে রাষ্ট্রের দুষমনরূপে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন। মাওলাইয়াতের জাহের এবং বাতেন উভয় ক্ষমতার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক অস্বীকৃত হইল। তাই ইমাম হোসাইনের (আ) পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ) রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপার হইতে সরিয়া গেলেন। জনমনে মাওলাইয়াতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কাজে অধিক মনোযোগ দিলেন।

ইতিহাস ব্যক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তাই অতি সংক্ষেপে দু-চারটি কথা পেশ করিলাম মাত্র। এখন আমরা আবার মূল কথায় ফিরিয়া যাই। মাওলাইয়াতের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় চলতি পথে কাঁটাবনে। নবী কেন এইরূপ করিলেন? জনগণকে আল্লাহর বাণীটি শুনাইয়া দিয়া মদিনায়

পৌছাইয়া জাঁকজমকের সহিত শান্ত এবং আনন্দের পরিবেশের মধ্যে এই অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিতেন। সেইরূপ করেন নাই কেন? মানুষ চলতি পথের পথিক, মুসাফির। বিশ্বাসীর জীবন একটা কাঁটাবন। কাঁটাবনের সদৃশ এই পার্থিব জীবনেই আল্লাহতা'লা কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া এখানেই তাহাকে জীবনের আধ্যাত্মিক ফুল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কাঁটা দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। যাত্রাপথে বিশ্রাম কালের স্বল্পতার কথা চিন্তা করিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। আত্মবিশ্বাস রক্ষা করিয়াই সংসার কাঁটাবনে ক্ষণিককালের মধ্যেই তাহাকে তাহার মনোবনে কাঁটার মধ্যে ফুল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এবং সেখানেই আল্লাহ কর্তৃক অভিষিক্ত এবং গৃহীত হইতে হইবে। প্রাসাদের পার্থিব অভিষেক ক্ষণস্থায়ী। কাঁটাবনের আধ্যাত্মিক অভিষেক চিরস্থায়ী। কাঁটার খোঁচায় দেহ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে কিন্তু দুঃখের মধ্যে রচিত মানব মনের আধ্যাত্মিক ফুলকে বিনষ্ট করে কাহার সাধ্য? কে বুঝিবে নবীর দৃষ্টিভঙ্গি? প্রাসাদবাসী রাজতন্ত্র কাঁটাবনের মাওলাইয়াতের কি মর্যাদা দিতে পারিবে?

মোসলেম ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু মাওলাইয়াত

বস্তুবাদী মানুষ নবুয়তকে কোন কালেই ব্যাপকভাবে এবং সামাজিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। শেষ নবীর ক্ষেত্রে এই সত্যটি অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল। রাষ্ট্রীয় বিধান হিসাবে লোকেরা রাসুলের (আ) দেওয়া মাওলাইয়াত গ্রহণ না করিয়া সেইস্থলে মানুষের রচিত খেলাফতকেই অধিক পছন্দ করিল। কারণ, মাওলাইয়াতের সংযম অপেক্ষা খেলাফতের স্বেচ্ছাচারিতা অধিক জনপ্রিয় এবং আপাত মধুর।

মুসলমানদের ধর্মীয় ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু (Pivot point) হইল মাওলাইয়াত, যাহার উপরে মুসলমানগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। শাসন পদ্ধতির দুইটি ধারাঃ বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মিক। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করিয়া এখান হইতে মুসলমানগণ দুইটি বিরোধী তাঁবুতে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় খলিফা নিহত হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে যদিও মাওলাইয়াত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এবং সুযোগ আসিয়াছিল কিন্তু দীর্ঘ চব্বিশ বছরের ব্যতিক্রম অভ্যাসের কারণে পরিণামে জনসমর্থন কমিয়া গেল। মাওলাইয়াত সিফফিনে

পরাজিত না হইয়াও পরাজিতই হইল এবং কারবালায় সমাধিস্থ হইল। মাওলাইয়াত পরিচালনা করার জন্য নেতার অস্তিত্ব বাকি রহিল বটে, কিন্তু জনসমর্থনের অভাবে অবশেষে আনুমানিক ২৭৩ হিজরী সনে শেষ নেতা গায়েব হইয়া গেলেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য। মানবতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবার মত সকল সম্ভাবনা শেষ হইল। স্বেচ্ছাতন্ত্র মোহাম্মদী ধর্মের ভিত্তি হইতে রক্ষা পাইল। ধর্মের নামে বস্তুবাদী শাসন আরও জোরদার হইল। অবশ্য ধর্মকে হাতিয়াররূপে ব্যবহারের জন্য শাসকগোষ্ঠীকে একেবারে ধর্মদ্রোহী হইলে চলে না। তাহাদিগকে ধর্ম মানিয়াই চলিতে হইবে যদিও উহা হইবে তাহাদের মনমত রচিত ধর্ম। এই কারণেই জনগণকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বুদ্ধিমান মেধাবী পণ্ডিতগণের সাহায্যে ধর্মকে তাহার মূল ভিত্তি হইতে সরাইয়া দিতে হইয়াছিল এবং অনুষ্ঠানের তুচ্ছরূপের মধ্যে উহাকে বন্দী করিয়া রাখিতেই হইয়াছিল মোহাম্মদী সীলমোহরের মধ্যে। শুরু হইল মিথ্যা অনুষ্ঠানের উপর ফতোয়াবাজি।

মাওলাইয়াতকে মৌখিক সমর্থন দিতে ইচ্ছা হয় সবার, কিন্তু কার্যতঃ উহা গ্রহণ করিতে ভাল লাগে না। এইজন্য মুসলিম সমাজ আজও আলীকে (আ) ভালবাসে, কারবালার ঘটনাকে ব্যথিত অন্তরে স্মরণ করে কিন্তু 'মাওলাইয়াত'-এর চর্চা ত্যাগ করিয়াছে। ফলতঃ গাদিরে খুম কথাটির উল্লেখ পর্যন্ত সমাজে অধিক গুনিতে পাওয়া যায় না। কারণ, ইহা আলেম সমাজের নিকট অবাধিগত ঘটনা। সেইসব যুগে এই দল সরকার পক্ষের সমর্থক ছিল। এখন তাহারা সংখ্যাধিক দলের সমর্থক। মনুষ্য স্বভাবের এই দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রাসুলুল্লাহ (আ) আলীর মাওলাইয়াত প্রকাশ করিতে যাইয়া এত সাবধানতার সহিত উহার প্রস্তুতি নিয়াছিলেন তথাপি তাহার শিষ্যগণের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় সংখ্যাধিক শিষ্যেরা তাহার নির্দেশের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াও উহা মাথা পাতিয়া লইতে পারে নাই। এবং আজও মোসলেম জাহান নিজেদের এই ভুল স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না।

খেলাফতের ক্ষমতা

আমিরুল মোমেনীন-সামরিক শাসক -Military Administrator

খালিফাতুল মোসলেমীন-দেওয়ানী শাসক -Civil Administrator

যেহেতু রাসুলুল্লাহ (আ) বিচার-আচারও করিতেন এবং জেহাদও করিতেন, সেইহেতু তিনি এই দুই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। খেলাফত

রহিল। জনমনে মাওলাইয়াতের প্রাণহানী হইয়া গেল। তাই আজও মোসলেম জনমনে খেলাফতি শাসন, আদর্শ শাসনরূপে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। কাঁটাবনের মাওলাইয়াত মাঠেই মারা গিয়াছে। সমাজে আসিয়াও ঠাঁই পায় নাই।

আব্বাসী যুগে হাদিসের নামে মিথ্যা দলিল রচিত হইল অত্যধিক এবং তাহা দ্বারা লিখিতভাবে দ্বীন ইসলামের মূলনীতি হইতে ইমামত, জেহাদ, খুমস ইত্যাদি বাদ দেওয়া হইল। নবুয়তকে দয়া করিয়া রাখা হইল কিন্তু তাহাকেও অর্ধমৃত অবস্থায় রাখা হইল। মোহাম্মদী দ্বীনের তথাকথিত পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে নবুয়তকে রাখা হইল না। দ্বীনে মোহাম্মদীর এগারটি ভিত্তিকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া পাঁচ ভিত্তির “দ্বীন ইসলাম” প্রচার করা হইল। (“দ্বীনে মোহাম্মদ”-এর ১১টি ভিত্তির উপরে লিখিত একটি ছোট প্রবন্ধ “কেবলা ও সালাত” নামক পুস্তকে প্রকাশ করা হইয়াছে)।

মাওলাইয়াতের প্রতি খেলাফত

মাওলাইয়াত ধ্বংস করার জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা হইল খেলাফত প্রতিষ্ঠা। ইসলামের ইতিহাস রক্তের ইতিহাস। খেলাফত মাওলাইয়াতকে ধ্বংস করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই ইসলামের ইতিহাসকে রক্তের ইতিহাসে পরিণত করিয়াছিল।

উমাইয়া এবং আব্বাসী রাজতন্ত্রের যুগে কোরান তফসীরের যে সকল পরিবর্তন ঘটয়াছে তাহার সংশোধন করিয়া লওয়া তেমন কঠিন কাজ নয়। স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ মন লইয়া জ্ঞানী ওয়াকিবহাল ব্যক্তিগণ হইতে প্রকৃত তফসীরের উদ্ধার করিলেই এই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু মাওলাইয়াতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে পার্শ্ব খেলাফত কোরান প্রকাশের উপর যে সকল অপকীর্তি করিয়াছে তাহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কোরান হইতে ইহার দুইটি মাত্র প্রমাণ বা নমুনা পেশ করিতে চাই।

মাওলাইয়াত বিরোধী উক্তি (২ : ২৪৬-২৫২)

অনুবাদ : ২৪৬। মুসার (আ) পরবর্তীকালে বনি ইসরাইলের একদল প্রধান ব্যক্তিগণের প্রতি আপনি কি দৃষ্টি দিয়াছিলেন না? যখন তাহারা তাহাদের নবীকে বলিল যে, “আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করিয়া দিন, আমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিব।” তিনি বলিলেন, “এইরূপ হইবে না তো যে, যুদ্ধ তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইল আর তোমরা যুদ্ধ করিলে না?” তাহারা বলিল, “আমাদের হইল কি যে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিব না? বস্তুতঃ আমরা আমাদের গৃহ হইতে এবং সন্তানগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি।” পরে যখন সংগ্রাম তাহাদের প্রতি লিখিত হইল তখন তাহাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পশ্চাদপদ হইল এবং আল্লাহ জালেমদের সম্বন্ধে অবগত আছেন।

অনুবাদ : ২৪৭। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন।” তাহারা বলিল, “আমাদের উপর তাঁহার রাজত্ব কিরূপে হইবে? রাজত্বের হক তাহা অপেক্ষা আমাদের অধিক এবং তিনি প্রচুর মালদারও নহেন।” তিনি (নবী) বলিলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকেই তোমাদের উপর মনোনীত করিয়া দিয়াছেন, জ্ঞান এবং শরীর বিষয়ে তাহাকে অধিক বিস্তৃতি দান করিয়াছেন। আল্লাহ তাঁহার রাজত্ব যাহাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ প্রশস্ততা দানকারী মহাজ্ঞানী।”

অনুবাদ : ২৪৮। তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, “নিশ্চয় তাহার রাজত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের নিকট সিঁদুকটি আসিয়া পড়িবে। তাহাতে রহিয়াছে তোমাদের রবের দেওয়া শান্তিপত্র এবং মুসা ও হারুনের বংশধরগণের পরিত্যক্ত অবশিষ্ট বস্তুজাত আছে, ফেরেশতাগণ উহা বহন করিবে। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে নিশ্চয় উহাতে একটি নিদর্শন আছে।”

অনুবাদ : ২৪৯। পরে যখন তালুত সসৈন্যে যাত্রা করিলেন তখন তিনি (সৈন্যগণকে) বলিলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে একটি নহর দ্বারা পরীক্ষা করিবেন; যে ব্যক্তি তাহা হইতে পান করিবে সে আমার (দলের) নয়; এবং যে ব্যক্তি তাহা হইতে পান করিবে না তবে নিশ্চয় সে আমার। স্বহস্তে এক গণ্ডুস পান করা ক্ষমা করা হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যকার অল্প লোক ব্যতীত সবাই তাহা হইতে পান করিল। অতএব যখন তাহারা উহা অতিক্রম করিল তখন রহিলেন তিনি এবং তাহার সঙ্গে রহিল বিশ্বাসীগণ।” তাহারা

বলিল, আজকের দিনে জালুত এবং তাহার সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলার ক্ষমতা আমাদের নাই। আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাতের ধারণা যাহাদের বদ্ধমূল ছিল তাহারা বলিল, “এমন অনেকবার হইয়াছে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় ক্ষুদ্র বাহিনী বৃহৎ বাহিনীর উপর জয়লাভ করিয়াছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন।”

অনুবাদ : ২৫০। এবং যখন তাহারা জালুত ও তাহার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হইল, তাহারা প্রার্থনা করিল, “হে আমাদের রব, আমাদের উপর ধৈর্যদান করুন, আমাদের পা দৃঢ় করুন এবং কাফেরগণের উপর আমাদের সাহায্য দান করুন।”

অনুবাদ : ২৫১। আল্লাহর ইচ্ছায় তাহারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিল এবং দাউদ জালুতকে বধ করিল। এবং আল্লাহ তাহাকে রাজ্য দিলেন এবং হেমকত দিলেন এবং যাহা কিছু তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা শিক্ষা দিলেন। যদি আল্লাহ একদল মানুষের দ্বারা অন্য দলকে দমন না করিতেন পৃথিবী ফায়াসাদে ভরিয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ সমগ্র জগতবাসীর উপর কল্যাণদানের অধিকারী।

অনুবাদ : ২৫২। এইসব আল্লাহর পরিচয়, যাহা আমরা আপনার নিকট সঠিক তেলাওয়াত করিতেছি এবং আপনি নিশ্চয় রাসুলগণের অন্তর্গত।

আয়াত সাতটির উপর সমালোচনা ও মন্তব্য

খেলাফত তাহার অন্যায় অধিকারকে ন্যায়সঙ্গত অধিকাররূপে প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল মিথ্যার অবতারণা কোরানে করিয়াছে উহাদের মধ্যে একটি হইল দাউদকে (আ) রাজা মনোনীত করার এই ঘটনা। দাউদ নবীর অল্প আগের কথা, ইহুদীগণের দেশ দখল করিয়াছে রাজা জালুত। ইতিহাসে তাহার নাম গোলিয়াত। ইহুদীগণ রাজধানী জেরুসালেম হইতে বিতাড়িত হইয়া বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পরাধীন জীবন যাপন করিতেছিল। তাহারা তাহাদের নবী স্যামুয়েলকে (আ) বলিয়াছিল আল্লাহতা'লা যেন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজা নিযুক্ত করিয়া দেন যাহার নেতৃত্বে তাহারা আবার একটি স্বাধীন ধর্মরাত্রি প্রতিষ্ঠা করিয়া আল্লাহর পথে জেহাদ করিবার সুযোগ পাইতে পারে। এবং সবার জন্য ধর্ম-জীবন যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে।

তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। আল্লাহতা'লা জেহাদের হুকুম দিয়া জয়ের প্রতিশ্রুতি দান করিলেন এবং তালুতকে (আ) তাহাদের রাজা মনোনীত করিয়া দিলেন এবং নিশ্চয় তালুত (আ) অচিরেই যে রাজা হইবেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ নবী যাহা যাহা উল্লেখ করিলেন তাহাও সঠিক সংঘটিত হইল।

আল্লাহর মনোনীত রাজা তালুত (আ) আল্লাহ এবং তাহার নবীর নির্দেশ অনুযায়ী তাহার বিশ্বাসী মোজাহেদ বাহিনী লইয়া রাজা জালুতের বিরুদ্ধে জেহাদে অগ্রসর হইলেন। পথে আল্লাহর নির্দেশে স্বল্প ইমানদারগণকে বাহিনী হইতে ছাটাই করিয়া দিলেন। প্রকৃত মোমিনগণকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাহার সেনাবাহিনীর মধ্যে দাউদ নামে একজন খাঁটি মোজাহেদ ছিলেন। দাউদ জালুতকে হত্যা করিলেন। অতএব আল্লাহ দাউদকেই রাজা বানাইয়া দিলেন। তারপর দাউদকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করিয়া তাহাকে তাহার নবুয়ত প্রকাশ করিবার নির্দেশ দান করিলেন। এখন দাউদ (আ) হইলেন নবী এবং দেশের রাজা।

ইহাতে দেখা যায় আল্লাহতা'লা তাহার পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং ওয়াদা অল্পদিনের মধ্যেই বদলাইয়া ফেলিলেন। অথচ আল্লাহ তাহা কখনও করেন না, একথা কোরানে বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন। আল্লাহর পক্ষে মিথ্যা বলারতো কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এইজন্য মাওলাইয়াতের বিরোধী পন্থী আলেমগণ আল্লাহকে সিদ্ধান্ত বদলকারী ব্যক্তিত্বরূপে অঙ্কিত করিয়া থাকে। এইজন্য “মনসুখ করা” অর্থাৎ “বাতিল করা” কথাটি ঐ দলের লোকের মুখে শোনা যায়।

তাহাদের মতে : খোদায়ী জ্ঞানে এবং শৌর্যে-বীর্যে হযরত তালুতকে যোগ্যতম জানিয়া আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এই কথা সত্য, কিন্তু আল্লাহ যাহাকে যখন খুশী জ্ঞান দান করিতে পারেন। তাই তিনি “মিথ্যা বলিয়া নয়,” “সিদ্ধান্ত বদল করিয়া” দাউদকেই (আ) রাজা বানাইয়া দিলেন। ইহা তাহার মর্জি। ঠিক তেমনইভাবে খোদায়ী জ্ঞানে জ্ঞানী এবং শৌর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আলীকে (আ) আল্লাহ গাদিরে খুমে নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, একথা সত্য কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তিন মাসের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত বদল করিয়া আবু বকরকেই (রা) খলিফা নিযুক্ত করিলেন। ইহাও তাহারই মর্জি। আল্লাহর পরিচয় বা নিদর্শন এইরূপই হইয়া থাকে। (২ঃ২৫২)।

তাহাদের মতে : নবী আমাদের মতই মানুষ। কাজেই তাহাদের মত অনুযায়ী এইরূপ চিন্তা করিলেই বা কি দোষ হইবে যে, এই উভয় নবীর ক্ষেত্রে নবীই হয়তো আল্লাহর অহি ঠিকমত গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন অথবা ভুল করিয়াছিলেন।

নবীগণকে এইরূপ ভুলের অধীন মনে করিলে আল্লাহর ধর্ম বলিয়া জগতে কোন ধর্মই গ্রহণযোগ্য থাকে না। নবীগণকে নির্ভুল হইতেই হইবে। নবীগণ হইলেন আল্লাহর নফসের অভিব্যক্তি।* নবীগণের ভুল হইলে উহা আল্লাহরই ভুল। কাজেই ইহা অসম্ভব।

এই আয়াত কয়টি যেইরূপে লিখিত আছে সেইরূপে ইহা কোরানের কথা হইতে পারে না। এখানে আল্লাহর প্রকাশিত আয়াতগুলির মধ্যে শব্দের অথবা নামের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া এই মিথ্যা রূপটি অঙ্কিত করা হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পার্থিব এবং অপার্থিব শাসন পদ্ধতি উভয়ই অভিন্ন—এই কথা প্রমাণের জন্যই কোরান বোর্ড এইরূপ করিয়াছে।

অন্য লোক সম্বন্ধে আর যাহাই বলা হোক, উলুল আজম অর্থাৎ উচ্চমানের নবীগণ নবী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা আজীবন মাসুম এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াই আসেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, ঈসার (আ) উদাহরণ। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই বলিতেছেন যে, তিনি নবী এবং কেতাব প্রাপ্ত মহাজ্ঞানী। তাঁহারা বড় হইয়া নবুয়ত প্রাপ্ত হন না, বরং নবুয়ত প্রকাশ করেন।

একটি মন্তব্য :

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তালুতকে (আ) আল্লাহতা'লা রাজা নিয়োগ করার পরও তাঁহাকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রধানগণের আপত্তি ছিল। তাই আল্লাহতা'লাও দাউদের (আ) যোগ্যতা দর্শন করিয়া উহার উচ্ছ্রায় জনগণের মনোরঞ্জন জন্য আপন সিদ্ধান্ত এবং পূর্ববর্তী ঘোষণা বাতিল করিয়া দাউদকেই রাজা নিয়োগ করিয়া আল্লাহর রাজত্ব চালাইবার যোগ্যতা দানের উদ্দেশে তাঁহাকে হেকমত ও নবুয়ত দান করিলেন।

ইহাতে দেখা যায় প্রাচীন যুগে আল্লাহ যেমন জনমনের ইচ্ছার সঙ্গে মিল রাখিয়া তাঁহার আপন সিদ্ধান্ত বদল করিয়া আসিতেন আজও তিনি আলীকে

* বিশিষ্ট নবীগণ “আল্লাহর নফস” হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : (৩ : ২৮, ৩০) এই দুইটি উক্তি শেষ নবী সম্বন্ধে এবং (২০:১৩, ৪১) এই দুইটি উক্তি মুসা নবী প্রসঙ্গে।

(আ) গাদিরে খুমে মাওলা নিযুক্ত করিয়াও পরে জনমতের পরিবর্তনের জন্য আপন মত বদলাইয়া আবু বকরকে (রা) খলিফা নিযুক্ত করিলেন। এখানে শুধু নেতা বদলাইলেন না, নীতিও বদলাইলেন। মাওলাইয়াত ত্যাগ করিয়া খেলাফত দান করিলেন। এখন কথা হইল আল্লাহর চরিত্র যদি এই রকম স্বল্পজ্ঞান মানুষের মতই হইয়া থাকে, যাহার ফলে তিনি পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে তাহা হইলে আল্লাহর ব্যক্তিত্বকে চরম ব্যক্তিত্বরূপে গ্রহণ করাই যায় না এবং সেইক্ষেত্রে “আল্লাহর নফস” নবীও তদ্রূপই প্রমাণিত হইবেন। ইহা অধর্ম এবং অবাস্তব।

আল্লাহ কোরানে বার বার বলিয়াছেন, “সুন্নাতাল্লাহে লা তাবদীলা।” আল্লাহর সুন্নাতের অর্থাৎ কাজ ও কথার কোন বদল হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন, “অলান্ তাজিদালে সুন্নাতিল্লাহে তাবদীলা।” অর্থ—“তোমরা আল্লাহর সুন্নাতের বদল দেখিতে পাইবে না” ইত্যাদি এই জাতীয় কোরানের বহু উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া কোরান নিজেই বাতিল প্রমাণিত হইতেছে।

আমাদের বিশ্বাস আত্মবিরোধী কথা কোরানে একটিও থাকিতে পারে না। অতএব কোরানের কোন একটি আয়াতও অন্য আয়াতের দ্বারা মনসুখ হইতে পারে না। এসবই রাজকীয় অপকীর্তির জের, যাহা আমরা টানিয়া চলিতেছি।

ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু খেলাফতের কোরানে যেইভাবে ইহাকে পেশ করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। তালুত (আ) নিজেই রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার মেয়ের জামাতা দাউদ (আ) রাজা হইয়াছিলেন।

এই ঘটনাটি তফসীরে ফায়দা হইতে। উক্ত তফসীরের টীকার মধ্যে এইরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে : সমুদয় লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তালুতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তালুত নির্ধারণ করিয়াছিলেন যে, যাহারা নির্ভীক যুবক তাহারাই আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে যাইতে পারিবে। সেইরূপ অশীতি সহস্র লোক যাত্রা করিল।

তালুত পথে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। একদিন জল পাওয়া গেল না, পরে এক জল প্রণালীর নিকটে তিনি সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন যে, এই প্রণালী হইতে যে ব্যক্তি এক গণ্ডুসের আধক জল পান করিবে সে আমার দলস্থ লোক নহে, সে আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না।

তিনশত তের জন লোক মাত্র পান করিল না, অন্য সকলেই স্বেচ্ছানুসারে জল পান করিয়া দলচ্যুত হইল।

তিনশত তের জন সেনার মধ্যে মহাপুরুষ দাউদ ও তাঁহার পিতা এবং তাঁহার ছয় ভ্রাতা ছিলেন। দাউদ তিন খণ্ড প্রস্তর পথ হইতে কুড়াইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উভয় দলের সমনসজ্জা হইলে জালুত স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বলিল, “তোমাদের সকলের জন্য একাকী আমি উপস্থিত, আমার সম্মুখীন হইতে থাক।” তখন পয়গাম্বর দাউদের পিতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, “তুমি স্বীয় পুত্রগণকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।” দাউদের পিতা দাউদকে প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার ছয় ভ্রাতাকে আনিয়া দেখাইলেন। দাউদের ভ্রাতৃগণ দৃঢ়চরিত বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। দাউদ পশুপাল চরাইতেন, তাঁহার কলেবর বীর পুরুষোচিত ছিল না। তথাপি প্রেরিত পুরুষ দাউদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জালুতকে পরাস্ত করিতে পারিবে?” তিনি বলিলেন, “হ্যাঁ পারিব।” অতঃপর দাউদ জালুতের সম্মুখে যাইয়া সেই তিন প্রস্তর দ্বারা কৌশলপূর্বক তাকে এইরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর তালুত দাউদকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তালুতের মৃত্যুর পর দাউদ রাজা হন। অজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকে যে, যুদ্ধ পয়গাম্বরদিগের কার্য নহে। এই ইতিহাস দ্বারা জানা যায় যে, ধর্মযুদ্ধ পূর্বেও প্রচলিত ছিল, ধর্মযুদ্ধ না থাকিলে অত্যাচারী লোকেরা দেশ ছারখার করিত। (ত, ফা)

তফসীরে ফায়দা : ইহা ভারতবর্ষে প্রকাশিত সর্বপ্রথম তফসীর। ইহা উর্দু ভাষায় ইংরেজ আমলে দিল্লী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই তফসীরের টীকা হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন তাঁহার লিখিত তফসীর পুস্তকে যে টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই হুবহু তোলা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রথম কোরানের অনুবাদক।

২৫৯ নং আয়াতটিতে দেখা যায় হযরত তালুত (আ) আল্লাহ হইতে বাণী লাভ করিতেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশে পথিমধ্যে তাঁহার সেনাবাহিনীর ধৈর্যের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং প্রকৃত মোমিন ব্যতীত বাকি সবাইকে বাহিনী হইতে ছাঁটাই করিয়া লইলেন। কথিত আছে, বাহিনীতে মোট ৮০ হাজার লোক ছিল। পরীক্ষা গ্রহণের পর বাকি রহিয়াছিল মাত্র ৩১৩ জন। কে কতটুকু পানি পান করিল এবং কে না করিল, ইহা ৮০ হাজার লোকের ভিড়ের

মধ্যে বাহাই করিয়া লওয়া কি সাধারণ সেনাপতির পক্ষে সম্ভবপর? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষের পক্ষেই কেবল তাহা সম্ভব।

স্যামুয়েল নবীর পাশে তালুতের (আ) কথা তুলনা করিলে আমরা মহানবীর পাশে তাঁহার যোগ্যতম প্রতিনিধি মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলীকে (আ) দেখিতে পাই। তাঁহাকেও বহু লোক সমর্থন দিয়াছিল এবং সকলকে তিনি তাঁহার অনুসৃত নীতির সমর্থন দেওয়ার সুযোগও দিয়াছিলেন। কিন্তু তালহা, জোবাইয়েরের মত নেতৃস্থানীয় লোকেরা পর্যন্ত বিভ্রান্ত এবং কাফের প্রমাণিত হইয়া গেল। তাই তাহারা সত্যের সমর্থনই শুধু ত্যাগ করে নাই, বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়াছিল।

তাহাদের কুফরীকে চাপা দেওয়ার জন্য “আশ্শারে মোবাস্শারা” নামক কথাটি তৈরি করিয়া পরবর্তীকালে এর উপর বহু মিথ্যা হাদিস রচনা করা হইল। মাওলাইয়াতের বিরুদ্ধে খেলাফতকে জায়েজ প্রমাণ করার জন্য, আয়েশাকে মোমিন প্রমাণ করার জন্য এবং আলীর (আ) বিরুদ্ধে যুদ্ধকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য। তাই দেখা যায় মোসলেম রাজত্বের কোন যুগেই লেখক, সাধক, এবং কামেল মহাপুরুষগণ খেলাফতের বিরুদ্ধে কিছু বলার অধিকারপ্রাপ্ত ছিলেন না। বরং তাহাদিগকে সরকার কর্তৃক বাধ্য হইয়া উহার উপর অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা সমর্থন দিতে হইয়াছিল।

রাসুলের (আ) এন্তেকালের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই মোহাম্মদী দ্বীন তাহার নিরাপত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ অনেক আছে। যেমন : হাদিসে কেরতাস।

(৫ : ৬৭)-এর উপর একটি মন্তব্য

অনুবাদে সাধারণত লেখা হয় “আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করিবেন।” কথাটি কিন্তু তাহা নয়। আল্লাহ আপনাকে তাঁহার সঙ্গে লাগাইয়া লইবেন।

সৃষ্টিতে সাকার রূপ গ্রহণ করিয়া, নফসবিশিষ্ট মানবরূপ লইয়া প্রকাশিত হওয়াতে আল্লাহ হইতে সামান্য যতটুকু আলাগা হইয়া অর্থাৎ বিচ্ছেদের ব্যবধান লইয়া থাকিতে হইতেছে তাহাও আর রাখা হইবে না। একেবারে পুরোপুরিভাবে মানব প্রকৃতির সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি আপনাকে তাঁহার সঙ্গে লাগাইয়া লইবেন অর্থাৎ পূর্ণ সান্নিধ্যে লইয়া যাইবেন, অর্থাৎ

আপনার মৃত্যু ঘটিবে। অনুবাদে সাধারণত লেখা হয়, “আল্লাহ আপনাকে মনুষ্য হইতে রক্ষা করিবেন।”

“রক্ষা করিবেন” কথাটি মোটেই যে এখানে অর্থবহ নয় তাহা লক্ষ্য করুন। অহি নাজেলের তেইশ বছর জীবনের শেষদিন, আল্লাহ তাঁহাকে মনুষ্য হইতে বাঁচাইবার আশ্বাসবাণী কেন শুনাইবেন? জীবনের শেষে কর্মবিরতির সময় বাঁচাইবার কথা আসে কেমন করিয়া? নবুয়ত প্রকাশের প্রথম জীবনে প্রাণহানি হওয়ার মত বিরোধীতার কঠিন যুগে এইরূপ হইলে অর্থবহ হইত। তাহাছাড়া শব্দটি হইল ‘এস্মাত’ শব্দ হইতে উদ্ভূত। এইরূপ ভুল অনুবাদের দ্বারা পাঠক ঠিক ভাবটি কিছুই বুঝিবে না।”

‘এস্মাত’ অর্থ লাগিয়া থাকা, সতীত্ব, এক এর সঙ্গে এক হইয়া লাগিয়া থাকা। এই মূল শব্দ হইতে ‘ইয়াসিমুকা’ অর্থ আপনাকে লাগাইয়া লইবেন বা আপনাকে একেবারে নিকটে টানিয়া লইবেন।

জীবনের সকল বিপদ হইতে তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রচার কার্যকে বাঁচাইয়া আনিবার পর শেষ দিনে কেমন করিয়া পুনরায় মানুষের বিপদ হইতে বাঁচাইবার আশ্বাসবাণী উল্লেখিত হইতে পারে? সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য ইহা উদ্দেশ্যমূলক রাজকীয় অপপ্রচার।

রাসুলুল্লাহ (আ) তাঁহার রেসালতের কর্তব্য ঠিকমতই পালন করিতেছেন, তাহার সাক্ষ্য আল্লাহ নিজেই দিতেছেন (৪ঃ৭৯, ১৬৬ দ্রষ্টব্য)। তবে কেমন করিয়া শেষ দিনের নাজেল করা কথায় এমন অভিযোগ আনা যাইতে পারে “আপনার কাছে যাহা নাজেল হইয়াছে তাহা পৌছাইয়া না দিলে আপনি কিছুই পৌছাইয়া দিলেন না।” পৌছাইয়া দিবার কাজে আলস্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে (যাহা নবী জীবনে অসম্ভব) উহা নবুয়ত প্রকাশের প্রথম দিকে হইলে এই অপবাদ এক প্রকার চলাইয়া দিতে পারিত। এইরূপ ব্যাখ্যায় শিয়া সুন্নী উভয় দল কম বেশি ভুল করিয়া থাকে।

এই শব্দটি অন্যত্র ব্যবহার করা হইয়াছে এইরূপে “অয়াতাসিমু বে হাবলিল্লাহে জামিয়া অলা তাফাররাকু” অর্থ করা হয় “দলবদ্ধভাবে আল্লাহর রশি শক্ত করিয়া ধর এবং পরস্পর ভিন্ন হইও না।” এখানে এই শব্দটির অর্থ করা হয় ‘ধর’ আর “আল্লাহর রশি” অর্থ করা হয় “আল্লাহর হুকুম আহকাম” তথা ‘কোরান’।

যেহেতু রাসুলুল্লাহর (আ) আল এবং আহলে বাইতগণকে “আল্লাহর রশি” বলা হইয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গে দেহে মনে অবিচ্ছেদ্যভাবে লাগিয়া

থাকিবার আদেশ কোরানে দেওয়া হইয়াছে সেইজন্য শব্দটির অর্থ ইচ্ছামত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন তাহাদের অত্যধিক। লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া “আল্লাহর দড়ি” অর্থাৎ আল্লাহর এবং তাঁহার রাসুলের মনোনীত নবীর বংশধর ইমামগণকে ভালবাসিয়া অবিচ্ছেদ্যভাবে মনকে তাঁহাদের সঙ্গী করিয়া লউক ইহা রাষ্ট্রবিরোধী কথা। মাওলাইয়াতের বিরোধীতা করার জন্যই অর্থের এইসব ব্যতিক্রম করা হইয়াছে।

ইমাম জাফর সাদেক (আ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : উক্ত আয়াত আমাদের আহলে বায়েতের শানে নাজেল হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য : ‘সাওয়ায়েকে মহরেকা’
তফসীরে সায়ালবী।

কোরান হইতে দ্বিতীয় উদ্ধৃতি (৪ : ৯২-৯৩) এবং (৪৯-৮)

(৪ঃ৯২) : ভুল হওয়া ব্যতীত কোন মোমিন ব্যক্তির জন্য এইরূপ হইতে পারে না যে, অন্য একজন মোমিনকে সে হত্যা করে। যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ একজন মোমিনকে হত্যা করে তবে তাহাকে একজন মোমিন দাস (অথবা দাসী) মুক্ত করিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরিবারদিগকে রক্ত বিনিময় (হত্যার মূল্য) দিতে হইবে, যদি তাহারা (তাহাদের এই প্রাপ্য অর্থ হত্যাকারীর প্রতি) সদকা করিয়া না দেয়। আর যদি সেই (নিহত) ব্যক্তি তোমাদের শত্রু দলের হয়, অথচ সে মোমিন, তাহা হইলে একজন মোমিনকে দাসত্ব মুক্ত করিয়া দাও। আর যদি সে ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে সন্ধির চুক্তিবদ্ধ দলের লোক হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পরিজনকে রক্ত বিনিময় দান কর এবং একজন মোমিনের দাসত্ব মুক্ত করিয়া দাও। তবে যে ব্যক্তি তাহা (অর্থাৎ ঐ পরিমাণ অর্থ) প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সে একাদিক্রমে দুইমাস রোজা রাখিবে; আল্লাহ হইতে ইহাই (তাহার জন্য) তৌবার ব্যবস্থা। আল্লাহ বিজ্ঞানময় জ্ঞানী।

(৪ঃ৯৩) : এবং যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে মোমিনকে হত্যা করে তবে তাহার পুরস্কার জাহান্নাম: উহাতে সে স্থায়ী হইয়া থাকিবে এবং তাহার উপরে আল্লাহর গজব ও লানত, এবং তাহার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।

মোহাম্মদী শরীয়তের ভিত্তিমূলক উল্লেখিত দুইটি উক্তিকে খণ্ডন করার জন্য যাহা উল্লেখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য :

(৪৯৪৮) : যদি মোমিনগণের দুইদল পরস্পর যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও। তাহাদের একদল যদি অন্য দলের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠে তবে যে দল বিদ্রোহ করিয়াছে সেই দলের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত তাহারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরিয়া না আসে। অতএব যদি ফিরিয়া আসে (আল্লাহর আদেশের দিকে) তাহা হইলে উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুসারে মীমাংসা (বা সন্ধি) করিয়া দাও এবং ন্যায়বিচার করিও। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকগণকে ভালবাসেন।

মন্তব্য-১ :

দুনিয়া আর্থিক বৃদ্ধি এবং বিচক্ষণতা পছন্দ করে। এই দুইটি খেলাফতের নিকট ছিল বলিয়া ইহাকে দুনিয়াদার মানুষ মাওলাইয়াত হইতে অধিক পছন্দ করিয়াছে। বিচক্ষণ খেলাফত বেশ জানিত যে, মাওলাইয়াতের বিরুদ্ধে পরিণামে তাহাদের মতের সংঘর্ষ হইবেই। সেইজন্য মাওলাইয়াতের বিরুদ্ধে যে কোন রকম বিরোধিতা এবং যুদ্ধ করা জায়েজ প্রমাণ করিয়া রাখিতে হইবে কোরানের বাণীর মাধ্যমে। এই কারণেই আজ আমাদের ভাগ্যে এমন সুন্দর ব্যবস্থাপনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যে স্থলে মোমিনের সঙ্গে অন্য মোমিনের সজ্ঞানে কোন যুদ্ধই হইতে পারে না, যেহেতু মোমিনের বিরুদ্ধে কাফের এবং মোনাফেক ব্যতীত অন্য কেহই যুদ্ধ করিবে না, সে স্থলে তাহারা মোমিনের সঙ্গে মোমিনের সজ্ঞানে যুদ্ধ ঘটয়া গেলে উহা ফয়সালা করার ব্যবস্থাও দান করিয়াছেন। অপরাধী বিদ্রোহী দলকে কাফের বা মোনাফেক ঘোষণা না করিয়াই ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করার উদারতা প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ কোরানে মিথ্যা আত্মবিরোধী কথা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে মোসলেম জাহান দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার 'ন্যায়সঙ্গত' পথ খুঁজিয়া পাইল। সফফিন ও কারবালার দুঃখজনক পথ খোলা হইয়া গেল।

দ্বীনে মোহাম্মদীর মৌলিক ভাবের আত্মবিরোধী এই তথাকথিত আয়াত কেন আবিষ্কার করা হইল? প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) ক্ষমতায় আসিয়া “জাকাত যুদ্ধ” নামে তথাকথিত ন্যায়সঙ্গত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে বহুশত মোমিন হত্যা করা হইয়াছিল, শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের জন্য এবং তাহাদিগকে অন্যায়ভাবে কর দানে বাধ্য করার জন্য। মর্মান্তিক এইসব

ইতিহাস লেখা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হইল কেন মোমিনের বিরুদ্ধে মোমিনের যুদ্ধ করা এবং তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

মোহাম্মদী দ্বীনের মূল একটি ভিত্তি হইল জেহাদ। ইহাকে ত্যাগ করা হইল এবং সেক্ষেত্রে “জোর যার মুল্লুক তার” এই নীতি গ্রহণ করা হইল। দূর্বদর্শী বিচক্ষণ খেলাফত কর্তৃক জনমতকে তাহাদের ধারায় দীক্ষিত করিয়া লওয়াই ছিল এইরূপ কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য। এই উক্তি দ্বারা জেহাদের পায়ে কুঠারাঘাত করা হইল। সকল যুদ্ধই জেহাদে পরিণত হইয়া গেল। সবাই নিজ নিজ দলের নিহত লোকদিগকে শহীদ বলিবার সুযোগ লাভ করিল। অথচ কোরান মতে তথা দ্বীনে মোহাম্মদীর শরীয়তে অর্থাৎ আইন অনুযায়ী কোন যুদ্ধকেই জেহাদ বলা যাইবে না, যদি তাহা নবী এবং তাঁহার বংশীয় ইমামগণের দ্বারা অথবা তাহাদের আদেশক্রমে প্রেরিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত না হয়।

মন্তব্য-২ :

দুই দল মোমিনের মধ্যে যুদ্ধ হইতেই পারে না। কোন মোমিন ব্যক্তি অথবা দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেই প্রমাণিত হয় যে, সে বা তাহারা মোটেই মোমিন নয়, কাফের। মোমিন নয় প্রমাণ হওয়ার পরে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ন্যায়নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতে হইবে। যদি তাহারা পরাজিত হইয়া ন্যায়বিচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় তবে মীমাংসা করিয়া দিতে আদেশ করিতেছেন। বিজয়ী মোমিনগণ মীমাংসা করিতে অক্ষম। আর যদি তাহারাই জয়ী হইয়া যায় তবে কি তাহাদের মিথ্যার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে? না শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে হইবে? তাহার কোন উল্লেখ নাই।

এখানে উল্লেখিত এই কথা কোরান হইয়া থাকিলে পূর্বের উল্লেখিত কথাটি কোরান নয়। এখন আমরা কোনটি গ্রহণ করিব? প্রথম কথাটি সংশোধন করিয়া পরবর্তী কথাটি আসিয়াছে মানিয়া লইলে আল্লাহকেও সংশোধনবাদী বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। একবারে ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অক্ষম আল্লাহকে আমরা কেমন করিয়া আল্লাহরূপে গ্রহণ করিতে পারি?

প্রকৃত কথা হইল : এই উক্তিটি কোরান নয়, ইহা খেলাফতী লীলা। ন্যায় এবং অন্যায় যুদ্ধকে একাকার প্রমাণ করিয়া মাওলাইয়াতকে খেলাফতের সঙ্গে

এক পর্যায়ে ভুক্ত করিয়া দেখাইয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই উক্তিটি দ্বারা হযরতে হযরতে লড়াই শরীয়তসিদ্ধ করা হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই আলীকে (আ) মোমিন জানিয়াও হযরত মাবিয়া জেহাদ করিতেছেন এবং হযরত আলীও (আ) অনুরূপভাবেই বিদ্রোহী মোমিন গভর্নরের বিরুদ্ধে পাঁচ জেহাদ করিতেছেন। উভয় পক্ষের কাহারও ইমানের ক্ষতি হইতেছে না।

গাদিরে খুমের ঘটনাকে চাপা দিয়া রাখার ফলে এবং মাওলাইয়াতকে অস্বীকার করার ফলে আমাদের “ইসলাম ধর্মে” অর্থাৎ দ্বীনে মোহাম্মদীতে যত রকমের কোন্দল এবং অপপ্রচার হইয়াছে দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মের উপর তেমন হয় নাই।

কোরানে বলিতেছেন : “কুনতুম খায়রা উম্মাতিন” অর্থ “তোমরা অতি মহান একটি গোষ্ঠী।”

আবু জাফর হইতে বর্ণিত হইয়াছে : “খায়রা উম্মাতিন” বলিতে রাসুলুল্লাহর (আ) আহলে বাইতকে বুঝান হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য : তফসীরে সিউতী

২য় খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা (মিশরীয়)

রাসুলের (আ) আহলে বাইত সকল যুগেই সশরীরে বিদ্যমান আছেন। তাহারাই মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম গোষ্ঠী। অধিকাংশ তফসীরে সরকারি ব্যাখ্যা অনুসারে বলা হয় রাসুলুল্লাহর (আ) ‘উম্মত’ হইলেই অর্থাৎ তাহাদের মতে মুসলমানের দলভুক্ত হইলেই অন্য যে কোন পূর্ববর্তী নবীর উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই এখানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। আসলে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আলী (আ) এবং তাহার বংশধরগণের বিশেষ ব্যক্তিগণ হইতে অর্থাৎ ইমামগণ হইতে ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া এমন একদল উচ্চতম পর্যায়ের উম্মত তৈরি হইয়া থাকে যাহারা সারা সৃষ্টিকে হেদায়েত দিতে সক্ষম।

সুন্নীগণ এই আয়াতের অর্থকে ‘ডালভাত’ বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহা দ্বারা অন্য জাতির উপর নিজেদের আত্ম-অহংকার প্রতিষ্ঠার খেয়ালে রহিয়াছে। আর শিয়াগণ বার ইমামের মধ্যে আহলে বাইতকে সীমাবদ্ধ করিয়া মানুষকে হতাশায় ফেলিয়া দিয়াছে। “আহলে বাইত”-এর নূরের স্রোত চির বিদ্যমান না থাকিলে মনুষ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা শেষ হইয়া যাইত। ইমামগণ হইলেন আহলে বাইতগণের মধ্যে মোহাম্মদী নূরের মৌলিক উৎসমুখ।

মাওলাইয়াত বনাম খেলাফত

মোহাম্মদী ইসলাম এত উচ্চাঙ্গের একটি জীবন দর্শন যে, ইহা সাধারণের ধর্ম নয়। অথচ আমরা ইহাকে সাধারণের আওতাভুক্ত করিয়া সংখ্যাধিক্যের (মেজোরিটি) আওয়াজ তুলিয়াছি। ফলতঃ সংখ্যাগুরু হাতে পড়িয়া ইহা নাজেহাল হইয়া গিয়াছে। যাহারা ইহার প্রকৃত সংরক্ষক এবং জিম্মাদার তাহাদিগকে বলপূর্বক হটাইয়া দিয়া ইসলামের জয় ডংকা বাজাইতেছি। অতএব ইহার স্বাভাবিক পরিণতির দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। এইজন্য বর্তমান যুগে ধর্মীয় মুসলিম রাষ্ট্র অপেক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রকৃত ইসলামপন্থীগণের নিকট অধিক কাম্য। তাহারা মাওলাইয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য মাওলার আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

শুধু ধর্মবিজ্ঞান জগতেই নয়, বস্তুবিজ্ঞান জগতেও একথা সত্য। যাহারা বস্তুবিজ্ঞান ক্ষেত্রে চরম জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকেন একমাত্র তাহারাই নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়া মানুষের বৈজ্ঞানিক সমাজ গঠন করিয়া দিতেছেন। অবশিষ্ট সকলে মিলিয়া তাহাদের দেওয়া নিয়মসমূহ গ্রহণ করিয়া পার্থিব উন্নতি সাধন বিষয়ে উহাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতেছে এবং তদ্বারা উপকৃত হইতেছে।

ধর্মবিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়ে আমরা তাহার বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি। যাহারা এ বিষয়ে প্রকৃত নিয়ন্তা তাহাদের নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করিয়া সে বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর অবুঝ লোকদিগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ ধর্ম বিষয়ে সমাজের অধঃগতি হওয়া অতি স্বাভাবিক।

মানবীয় প্রচেষ্টার সাহায্যে বস্তুবিজ্ঞানী তৈরি করা যায়। কিন্তু ধর্মবিজ্ঞানের জ্ঞানাদার নবী এবং ইমাম তৈরি করা যায় না। এই জ্ঞান দান করা আল্লাহর নিজ হাতে রাখা হইয়াছে।

গণতন্ত্রের ভোটে নবুয়ত এবং ইমামত সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মোসলেম রাষ্ট্র তাহাও করিয়া দেখাইয়াছে। নবুয়ত খতম ঘোষণা করা হইয়াছে বিধায় নবী তৈরি করে নাই বটে, কিন্তু সরকার ইমাম তৈরি করিতে কসুর করে নাই।

যেহেতু ইমামত খতম হওয়ার জন্য আসে নাই। নবুয়তের পরে একাধারে ইমামত চলিতে থাকিবার জন্যই গাদিরে খুমে উহার ভিত্তি স্থাপন করা

হইয়াছিল, সেইহেতু আমরা দেখিতে পাই : রাজধানীর ইমাম, মফস্বলের ইমাম, রাজদরবারের ইমাম, ফেকা লেখক মজহাবের ইমাম, হাদীস সংকলক মোহাদ্দেস ইমাম, নামি লেখক হিসাবে লেখম ইমাম, পেশ ইমাম, মসজিদের ইমাম, নামাজের জামাতের ইমাম, ইত্যাদি কত বিচিত্র রকম ইমামের ছড়াছড়ি। উদার রাজদরবার হইতে দানের ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া মর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য ইমামত যথাযোগ্য স্থানে সুবিন্যস্ত হইয়া যথাযোগ্য ধর্মীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে এবং উহার আশীর্বাদে সমাজের সকল দিকের সমস্যার সমাধান একপ্রকার গণতান্ত্রিক উপায়ে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে।

গাদিরে খুমে রাসুল্লাহর (আ) ঘোষিত মাওলাইয়াত তথা ইমামতকে খতম করিয়া থামিয়া গেলেই বা কেন চলিবে, নবুয়তের অহি বাক্য আগমন শেষ হইয়া যাওয়ার পর নবীর প্রয়োজনও আর থাকে না। আল্লাহর কেতাবই তখন যথেষ্ট। আজ মাশাআল্লাহ আমাদের প্রতি ঘরে আল্লাহর কেতাব আসিয়া স্থান পাইয়াছে। শুধু কেতাবই নয়, লক্ষ লক্ষ অন্তরেও আল্লাহর কেতাব হেফাজতপ্রাপ্ত হইয়া হাফেজ তৈরি করিয়া ধর্মকে আমাদের সহজ নাগালে লইয়া আসিয়াছে। ধর্মের অভাব পুরোপুরি মিটিয়া গিয়াছে। ধন্য! ধন্য আমরা!

জামাতে নামাজ পড়িতে গেলেই ইমামের সন্ধান পাওয়া যায়। জামাত যত ছোটই হোক “এক্কেদাতু বে হাজাল ইমাম” বলিয়া নামাজ না পড়িলে সরকারি ফতোয়া অনুযায়ী নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। জীবনের কত শত গুনাহগার ইমামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ওয়াদা করিয়া আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া কত নামাজ পড়িয়াছি। সখি গো কমনে কহি এ কথা সকলই গরল ভেল।

কারবালার ঘটনা কি ইসলামের আদর্শের উপর ঘটিয়াছিল? না শুধু ইমাম হোসাইনের (আ) উপর ঘটিয়াছিল? যদি আদর্শের উপর ঘটিয়া থাকে তবে প্রত্যেক মুসলমান দলের জন্য আদর্শের সিদ্ধান্ত এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি-না? উম্মতে মোহাম্মদীকে হযরত হোসাইন (আ) কার্যতঃ ইহার উত্তর দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন :

আমি হোসাইন কেন,
সমগ্র ঘরবাড়ি উজাড় করিয়া দিতে পারি,
যদি ভাগ্যে জোটে মোহাম্মদ (আ)।

“রাসুল্লাহর (আ) অনুমোদনক্রমে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই খেলাফত গঠিত হইয়াছে” ইহা প্রমাণ করিয়া তুলিবার জন্য বহু হাদিস রাসুলের নামে রচনা করা হইয়াছে। ধর্মীয় সাহিত্য হিসাবে হাদিস বিশেষ করিয়া বোখারী এবং মোসলেমের বর্ণিত হাদিসসমূহ এমন সব আত্মবিরোধী কথার সমষ্টি এবং কথার অসামঞ্জস্যতা তাহাতে এত বেশী যে, তাহাদের দুইজনের গ্রন্থকে সরকারি দালাল ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যমূলক রচনা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। অতি দক্ষতার সহিত তাহারা এই কাজ সম্পন্ন করিয়াছে।

নেতা নিযুক্ত করার বিষয়ে নবী যদি বিপরীত উক্তি করেন এবং পরস্পর বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি নবী হইতে পারেন কেমন করিয়া? পার্থিব বিষয়ের নেতা হওয়ার যোগ্যতাও রাখেন না। আধ্যাত্মিক বিষয় তো দূরের কথা।

মাওলাইয়াতের বিরোধিতা করার জন্য নবীকেও তাঁহার নবুয়তের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হইতে নামাইয়া লইয়া সাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাধারণ মানুষরূপে তাঁহার চরিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছে। উদ্দেশ্য হইল প্রধান নেতাকে খাট করিয়া দেখাইতে পারিলে তাঁহার মহান বংশধরগণের মাহাত্ম্য লোকচক্ষে আপনা আপনি ম্লান হইয়া আসিবে। তাহাদের রচিত হাদিসের দ্বারা জনমনে এ কথাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজাদের ধর্মীয় শাসন প্রকৃতপক্ষে রাসুলের (আ) প্রবর্তিত ধর্মীয় শাসনের মতই ছিল। ইমামগণ শাসনকর্তা নিয়োজিত হইলে তাহারাও সেই একইরূপ শাসন প্রচলন করিতেন। ইহাতে ব্যক্তির এবং বংশের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র, ইসলামের নীতির পরিবর্তন হয় নাই। ইহা প্রমাণ করাই ছিল তাহাদের অপকীর্তির প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব গাদিরে খুমের ঘটনা এমন একটি ঘটনা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া মোহাম্মদী ধর্ম তছনছ হইয়া গিয়াছে এবং সেস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম। দ্বীনে মোহাম্মদীর স্থান দখল করিয়াছে দ্বীনে ইসলাম। খেলাফত, হিজরী সাল প্রবর্তন কেন করিয়াছিল? ইহা ইসলামের ঐতিহ্য বহন করে না। মূর্তিপূজা এবং কুফরীর ঐতিহ্যই বহন করে। বলেছেন লিবিয়ার শাসনকর্তা কর্নেল গাদ্দাফী। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর সংবাদ নামক কাগজে উক্ত খবর পরিবেশিত হইয়াছিল। তাহার বক্তৃতায় তিনি তাহার আপন

মতও জানাইয়াছিলেন। তাহার প্রস্তাব মতে এই সালকে এগার বছর পিছাইয়া দিয়া রাসুলের (আ) এন্তেকাল দিবস হইতে গণনা করা হউক।

এত যুগ পরে আমাদের একজন সুন্নি মুসলমান শাসনকর্তার মুখে স্পষ্টভাবে এ কথা খবরের কাগজে প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া খুশি হইলাম।

হিজরী সন প্রবর্তনের ইতিবৃত্ত

সেইদিন ছিল মক্কাবাসীর বিজয় উৎসব দিবস। তাহাদের ধর্মের প্রধান শত্রুদল এবং মক্কার প্রধান শাসক আবু তালেবের বংশধরগণ নির্যাতিত হইয়া পরাজয় বরণ করিয়া পালাইয়া গিয়াছে। সেইদিন ঘরে ঘরে আনন্দের রোল পড়িয়া গিয়াছিল। মদ্যপান ও নাচ-গানের আসরের ধুম চলিয়াছিল। দেব-দেবীগণের নিকট যাইয়া জোরেশোরে তাহাদের প্রতি ভক্তি ও পূজা-অর্চনা দেওয়া হইয়াছিল, যেহেতু তাহাদের দূশমন মোহাম্মদ (আ) তাহার দলবল লইয়া পালাইয়া গিয়াছেন।

তাহার চাচা আবু তালেবের (আ) এন্তেকালের পর হইতে রাসুল জীবনের বিষাদময় এবং ঘোর বিপদময় দুইটি বছর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার দুর্দশার যে চরম পরিণতি মক্কায় ঘটয়াছিল তাহারই বিষাদময় স্মৃতি দিবস ‘হিজরত’ হইল আনন্দে উৎফুল্ল মক্কানগরী।

খলিফা হযরত ওমর যখন পারস্য ও মিশর জয় করিয়াছেন এবং শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তখন তিনি বলিলেন : “বিশ্বের সকল বৃহৎ জাতিসমূহের নিজস্ব একটি সাল এবং বর্ষপঞ্জিকা থাকে আমাদেরও সেইরূপ একটি সাল থাকা প্রয়োজন।”

কখন হইতে কোন্ ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া এই সাল আরম্ভ হওয়া উচিত তাহার উপর আলোচনা হইল। যে কয়টি বিশেষ ঘটনার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইল :

- ১। রাসুলান্নাহর (আ) এন্তেকাল দিবস। যেমন-ঈসার (আ) এন্তেকাল দিবস হইতে খ্রিষ্টাব্দ গণনা আরম্ভ করা হইয়াছে।
- ২। রাসুলান্নাহর (আ) জন্মদিবস।
- ৩। প্রকাশ্যে সমাজের নিকট প্রথম নবুয়ত প্রকাশ দিবস। যাহাকে “এলানে নবুয়ত” বলা হয়।

- ৪। ইসলামের / দ্বীনে মোহাম্মদীর প্রথম বিজয় বদর যুদ্ধের বিজয়।
 - ৫। রাসুলান্নাহর (আ) মক্কা বিজয় দিবস। যেহেতু মক্কা ছিল বৃহত্তম শত্রুদেশ এবং বৃহত্তম বাধা। ইহার পতনে দ্বীনে মোহাম্মদীর চরম বিজয়ের সূচনা করিয়া দিল।
 - ৬। রাসুলান্নাহকে (আ) মারিয়া ফেলিতে না পারিলেও তিনি মক্কাতে ধর্মপ্রচারের পরাজয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ লইয়া কোনমতে ভাগিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যাহার ফলে মক্কায় জোরেশোরে দেবীর জয় এবং তাহাদের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই বিজয় উৎসবের হিজরত দিবস।
- এই ছয়টি প্রস্তাবের মধ্য হইতে হিজরত দিবসই স্মরণীয় করিয়া রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন খলিফা ওমর (রা)।

হিজরী সাল গ্রহণের পেছনে তাহাদের অন্তরে কি যুক্তি ছিল? রাসুলান্নাহ (আ) মক্কা জয় করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীগণ বাধ্য হইয়া অবস্থার চাপে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বিজয়ী দলের নিকট। আসল ধর্ম তাহারা গ্রহণ করে নাই বলিলেই চলে। প্রকাশ্য মূর্তিপূজা বাদ দিয়াছিল মাত্র। তাহারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। রাসুলের (আ) এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ গ্রহণ করা হইল। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজয়ী দলকে বিজিত করা হইল। তাহাদের মতে রাসুলান্নাহ (আ) ধর্মের নামে আসলে তাহার বংশধরের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিয়াছিল খেলাফত। সেইজন্য এই বিজয় দিবস ‘হিজরত’।

মক্কা বিজয় দিবসকে স্মরণীয় দিবস হিসাবে মোটেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। উহা গ্রহণ করিলে শুধু রাসুলের (আ) জয় নহে, মক্কার উপর মদিনার জয়ও সূচিত হয়। কোরেশদের উপর আনসারগণের বিজয় স্মৃতি? সে তো কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

খেলাফতের বিরুদ্ধে বিশ্বের মুসলমান এই জাতীয় হক কথা কোনকালেই বরদাস্ত করিতে রাজি থাকে নাই। এইজন্য সমগ্র মোসলেম শাসন আমলে, তাহার সকল যুগেই অসংখ্য অন্যায় এবং অত্যাচার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগের মোসলেম দেশগুলি কতকটা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন মতবাদ এখনও অটুট রহিয়াছে।

এই তো সেদিনের কথা : মিশরের প্রধান বিচারক (Chief Justice) ডক্টর আলী আব্দুর রাজ্জাক একখানা বই লিখিয়াছিলেন, তার নাম “আল ইসলাম ওয়া অসুলুল হাকাম।”

অর্থাৎ, “ইসলাম এবং হুকুমতের মূল ভিত্তি।” তাহার এই পুস্তকে তিনি এই কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইসলাম ধর্মের মূলনীতি যাহা রাসুলুল্লাহ (আ) নির্দেশ দান করিয়া গিয়াছেন আর যে সকল শাসনমূলক মূলনীতি যুগে যুগে তথাকথিত মোসলেম রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া আসিতেছে তাহা মোটেই এক নয়। অর্থাৎ রাসুলের (আ) প্রকাশিত ব্যবস্থার সঙ্গে কোন শাসন ব্যবস্থার মূলনীতির কোনই মিল ছিল না। খেলাফত হইতে এই ব্যতিক্রম আরম্ভ হইয়াছিল।

এই সত্য কথা প্রকাশের ফলে তাহার বইখানা বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হয়। রাষ্ট্র বর্তমান যুগে ধর্মনিরপেক্ষ, তাই প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

A saying of a saintly person is quoted below as a mark of his remarks on Islamic Calender "The Hizra", One of his important sayings regarding the Islamic Lunar Calendar runs as follows :

Very very important achievements of Rasul were neglected, baffled at cold assassination, the idol worshipers of Mecca took the flight of the Prophet to Medina as a mark of their victory and burst out into joyous festivities in the form of wine, women and worship of idols in kaba. At a later period, when these idol worshipers for the sake of their life and property embraced Islam, and came to power during the Second 'Caliphate' they merrily adopted Hizra Calendar as a mark of their victory, and flight of the helpless Prophet from Mecca.

লোক পরম্পরায় কথিত দুইটি কথা

১। গাদিরে খুম হইতে মদিনা প্রত্যাবর্তনের পথে হারেস ইবনে নোমান ফাহরী নামে এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর (আ) নিকটে আসিয়া বলিল, “হে

মোহাম্মদ, সালাত, সওম ইত্যাদির জন্য যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মানিয়া লইয়াছিলাম! আজ অবশেষে তুমি যে স্বগোষ্ঠীয় আলীকে বিশ্বাসীগণের মাওলা ঘোষণা করিয়াছ, ইহা কি নিজের ইচ্ছায় করিয়াছ, না আল্লাহর আদেশে করিয়াছ?” রাসুলুল্লাহ (আ) বলিলেন, আল্লাহর আদেশেই ঘোষণা করিয়াছি। ইহা শুনিয়া প্রশ্নকারী বলিল : “আল্লাহর নির্দেশেই যদি ঘোষণা করিয়া থাক তবে (তাহার প্রমাণ স্বরূপ) আমার উপর বজ্রপাত হউক।”

ইহা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঘোড়া হঠাৎ ভরকাইয়া ছুট দিল এবং সহসা বজ্রাঘাতে লোকটির মৃত্যু ঘটিল।

লোকটির বক্তব্য এইরূপেও শ্রুত হইয়া থাকে : “আল্লাহুমা ইন কানা হাজা হুয়াল হাক্ ফামতির আলাইয়া হেজারাতাম মিনাস্ সামা।” অর্থ : হে আল্লাহ যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার উপরে আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষিত হউক।

তাহার প্রার্থনা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ তাহাই ঘটিল।

ঘটনাটি লোকের মুখে মুখে কথিত হইয়া আসিতেছে এবং ঘটনার অনেক পরবর্তীকালে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে।

২। হযরত ওমর (রা) মদিনায় যাইয়া রাসুলুল্লাহকে (আ) বলিলেন, আমি যখন আলীকে (আ) মোবারকবাদ দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলাম, একজন সুপুরুষ যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, যাহাকে আমি আর কখনো দেখি নাই : “তুমিও কি আলীকে মোবারকবাদ দিয়াছিলে?” উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম : “আমি কেন দিব না?” সে বলিল : “তুমি যে মোবারকবাদ দিয়াছ তাহা কখনও ভুলিও না।” এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। আর কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া আমাকে কেন বলিল?

উত্তরে রাসুলুল্লাহ (আ) বলিলেন : “তোমা হইতে কোন খতরা হইতে পারে সেইজন্যই বলিয়াছিল।”

উলিল আমর এবং আল্লাহর খেলাফত

“উলিল আমর” অর্থ সমাজে আল্লাহর আদেশ নির্দেশ পরিচালনার অধিকারী শাসক ব্যক্তি। কেবলমাত্র আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিগণই আল্লাহর মনোনীত শাসন পরিচালনা করিতে সক্ষম। ধরার বুকে কেবল তাঁহাদের

দ্বারাই আল্লাহ তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উহার উপযুক্ত যোগ্যতা দান করিয়া তাহার প্রতিনিধি স্থানীয় যোগ্য ব্যক্তিত্ব তৈরি করিয়া থাকেন। তাঁহার আপন ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোকে এই পরিচালনা জ্ঞান পাইতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ হইতে অহি অথবা এলহামের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিবে সে ব্যক্তি কখনও উলিল আমার হইতে পারে না।

যিনি আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকারী তিনি নবী হউন বা ইমাম হউন তিনি আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। অতএব নবীর নিজ ইচ্ছায় খেলাফত সৃষ্টি করিবার অধিকার নাই, আল্লাহর ইচ্ছার সমন্বয় তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে থাকিতেই হইবে।

জনগণের মনোনীত প্রথম তিন খলিফার সপক্ষে ধর্মীয় সমর্থনের প্রমাণ সৃষ্টি করার জন্য তাহাদের খেলাফতের সপক্ষে যে সকল মিথ্যা হাদিস অনেক পরবর্তীকালে রচনা করা হইয়াছে সেইগুলি শুধুমাত্র রাসুলের নামেই রচনা করিতে পারিয়াছে, যাহার ফলে কোরানের কোন বাণীর সমর্থন তৈরি করিয়া রাখিতে পারে নাই।

অপরপক্ষে, আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব লাভ করা বিষয়ে আলীর (আ) উপর যে সকল প্রত্যক্ষ আয়াত কোরানে উল্লেখিত ছিল তাহা খেলাফতকালে কোরান হইতে ফেলিয়া দিবার পরও পরোক্ষ আয়াতগুলি আজও উহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আলী (আ) সংক্রান্ত এইরূপ পরোক্ষ আয়াতের সংখ্যাও মোটেই কম নহে।

তাহাদের প্রয়োজনবোধে নবীকে (আ) তাহারা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী বানাইয়া লয় আবার তাহারাই নবীকে (আ) তাহাদের প্রয়োজনের তাগিদে ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদের মত সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রকাশ করিতে যত্নবান হইয়া থাকে।

হাদিসে কেরতাস

হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে : যখন রাসুলুল্লাহর (আ) নিকট হাজির হইয়াছিল (মৃত্যু), গৃহে সমবেত লোকজনের মধ্যে ওমর ইবনে খাত্তাবও ছিলেন। নবী বলিলেন : আস, তোমাদের জন্য লিখিত লেখা রাখিয়া যাই যেন তোমরা ইহার পরে বিভ্রান্ত না হও। ইহাতে ওমর বলিলেন : নিশ্চয়

যন্ত্রণা তাঁহার উপর গালের হহয়াছে (অর্থাৎ যন্ত্রণা তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে) এবং তোমাদের নিকট রহিয়াছে কোরান। আমাদের জন্য আল্লাহর কেতাবই যথেষ্ট। ইহাতে আহলে বায়েতগণ বিরূপ মত পোষণ করিয়া বিবাদে লিপ্ত হইলেন।

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন : সামনে আনিয়া ধর (কাগজ) রাসুলুল্লাহ (আ) তোমাদের জন্য লিখিয়া দিবেন এবং কিছু লোক ওমরের বক্তব্য সমর্থন করিল। যখন তর্কাতর্কি বৃদ্ধি পাইয়া বিবাদের সূচনা হইল, তখন রাসুলুল্লাহ (আ) বলিলেন : আমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাও। ওবায়দুল্লাহ বলিয়াছেন যে, ইবনে আব্বাস বলিতেছিলেন : আল্লাহর রাসুল এবং তাঁহার লিখিতব্য ফরমান লইয়া যাহা ঘটিতেছিল সেই মহাদুর্ঘটনা তাহাদের মতানৈক্য এবং বচসার দরুন ঘটিয়াছিল।

সুলাইমান ইবনে আব্বাস* মুসলিমুল আহওয়ালের উক্তি অনুসারে : ইবনে আব্বাস বলিতেন : বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার কি? বলিয়া তিনি এত কাঁদিতেন যে, পাথর ভিজিয়া যাইত। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : হে ইবনে আব্বাস, বৃহস্পতিবারে কি হইয়াছিল? তিনি বলিয়াছেন : রাসুলুল্লাহর (আ) ব্যথা তীব্রতর হইয়াছিল তাই তিনি বলিয়াছেন : আমার নিকট কণ্ঠের একটি হাড় লইয়া আস, আমি একটি লিপি (তাহাতে) তোমাদের জন্য লিখিয়া যাই, যাহার পরে আর তোমরা বিভ্রান্ত হইবে না। অতঃপর তাহারা পরস্পর ঝগড়া করিতে লাগিল এবং নবীর সম্মুখে ঝগড়া করা উচিত নয়। তাহারা প্রশ্ন করিল : তাহা হইলে তিনি উহা ত্যাগ করিলেন কেন? তাহারা আবার উহাতেই (অর্থাৎ সেই বিবাদে) ফিরিয়া গেল। তিনি (অর্থাৎ রাসুল) বলিলেন : ছাড় আমাকে, আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও ইত্যাদি।

(বোখারী ও মোসলেম) মেশকাত হইতে গৃহীত হাদিস।

ব্যখ্যা : রাসুলুল্লাহ (আ) তাঁহার নবুয়তের দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অবর্তমানে আলীর (আ) অভিষেক অমান্য করিয়া তাঁহার উম্মতগণ বিপথগামী হওয়ার পথ গ্রহণ করিবে। ফলতঃ তাঁহার প্রচারিত এবং প্রবর্তিত সকল ব্যবস্থা ক্রমশ পরিবর্তন করিয়া তাহাদের স্বৈচ্ছাচারী ধর্মীয় ব্যবস্থা কায়েম করিবে।

* “বাপের পোলা” এর অর্থ অন্য মায়ের ছেলে অর্থাৎ সংভাই।

এইজন্য তিনি মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া উপাখ্যাত ও মৃতগণকে বলিলেন : তোমরা কাগজ লইয়া আস আমি অসিয়ত লিখিয়া দিয়া যাই, যাহা অনুসরণ করিলে তোমরা কখনও বিভ্রান্ত হইবে না। হযরত ওমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাহার সমর্থক কিছু লোকও সেখানে উপস্থিত ছিল। হযরত ওমর বলিলেন : “মৃত্যু যন্ত্রণা” তাঁহাকে বিকল করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় নহেন। এমতাবস্থায় তাঁহার কথা গ্রহণযোগ্য হইবে না। তিনি হয়তো প্রলাপই বকিতেছেন।*

হে জনগণ, “তোমাদের প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশের জন্য সব ব্যবস্থাই কোরানে রহিয়াছে। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহর কেতাবই যথেষ্ট। নবীর লিখিবার প্রয়োজন নাই।”

অপরপক্ষে রাসুলের (আ) আহ্লে বাইতগণ সবাই রাসুলুল্লাহর (আ) শেষ নির্দেশ লাভের জন্য লিখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরোধীগণ এমন প্রবল বাধার সৃষ্টি করিল যে, সেখানে রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রাসুলুল্লাহ (আ) তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিস্কার করিয়া দিলেন। তারপর অসিয়তনামা লিখাইয়া লইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করা হইলে আবার প্রবল হটগোল এবং বাধার সৃষ্টি করা হইল। রাসুলুল্লাহ (আ) এবারও তাহাদিগকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। রাসুলুল্লাহর (আ) নির্দেশনামা লেখা হইল না। তিনি এই ভাবিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন : “সকল বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গাইয়া অতিকষ্টে দ্বীনে মোহাম্মদীর যে জয়যাত্রা কামিয়াবী হাসিল করিয়াছে তাহা আজ অভ্যন্তরীণ বিরোধীতার কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল। ধর্ম তাঁহার নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। অন্তর বিরোধের চেয়ে মারাত্মক আর কি হইতে পারে?” রাসুলুল্লাহ (আ) ভগ্ন হৃদয়ে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

মেশকাতে উল্লেখিত বোখারী ও মোসলেম কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটির পরবর্তী অংশ হইল এই ঘটনার উপর উল্লেখিত অন্যরূপ একটি হাদিস।

ইহাতে বলা হইয়াছে : হযরত ইবনে আব্বাস প্রায়ই দুর্ঘটনাময় বৃহস্পতিবারের এই দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া পরবর্তীকালে অনেক কাঁদিতেন।

* নবীর মুখ হইতে কোন অবস্থাতেই প্রলাপ বাক্য বাহির হইতে পারে না, কারণ তিনি হইলেন “আল্লাহর নফস”। তিনি ব্যক্তি জীবনের সকল অবস্থায় নবীই থাকেন। জীবনের কিছু অংশ নবুয়তের জীবন এবং অবশিষ্ট কিছু অংশ আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবন হইয়া যাওয়া নবীর (আ) জন্য অবাস্তব।

“হায় বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! উম্মতের কপাল খাওয়া বৃহস্পতিবার।” এই বলিয়া তিনি মদিনার অলিতে গলিতে প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া আফসোসের কান্না কাঁদিতেন। বৃহস্পতিবারের এই দুর্ঘটনাটি মোসলেম রাষ্ট্রে যেইভাবে খেলাফতকালে কার্যকরী হইতে থাকিল তাহার ভবিষ্যৎ কুফলের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহাকে এইরূপে কাঁদাইত। মোহাম্মদী দ্বীন যেইরূপভাবে ব্যতিক্রমের পথে অগ্রসর হইতেছিল উহাই ছিল তাঁহার আফসোসের কারণ।

একটি মন্তব্য : এই ঘটনাটিকে মূলধন করিয়া শিয়াগণ বলিয়া থাকে যে, গাদিরে খুমে মাওলার অভিষেক বিষয়টি বানচাল করার ঘটনা হিসাবে ইহাই সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আসলে বিষয়টির গুরুত্ব উহাতে সীমাবদ্ধ নয়। হযরত ওমরের “হাসবুনা কেতাবুল্লাহ” কথাটি নবীর নবুয়তকেই অস্বীকার করিতেছে। আল্লাহর বাণীই যথেষ্ট, নবীর আদর্শের কোন প্রয়োজনই ইহাতে থাকে না। নবী আল্লাহর বাণীর একজন বাহক মাত্র। বাণী আসা শেষ হইয়াছে, এখন বাহকের আর কোন প্রয়োজন নাই।

আল্লাহর কেতাবই যথেষ্ট হইয়া থাকিলে কেতাবের সঙ্গে শিক্ষকের প্রয়োজন থাকে না। আল্লাহর কাজের জন্য নবীর প্রয়োজন অস্বীকার করা হইয়াছে। কাজেই ইহা দ্বারা শুধু ‘মাওলাইয়াত’ বাতিল প্রমাণ হয় না, নবুয়তও অকেজো প্রমাণ হয়! নবী, ইমাম এবং আহ্লে বাইতগণের চরিত্রের মধ্যেই শুধু আল্লাহর কেতাব অভিযুক্ত হইয়া থাকে। এই মহাসত্য ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া পড়ে।

“কোরান তথা আল্লাহর কেতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট” এই নীতির উদ্ভাবন এবং ইহার সমর্থনের দ্বারা নবীকে আমাদের মত সাধারণ মানুষে পরিণত করার প্রথম ভিত্তিরূপে স্থাপিত হইল। পরবর্তীকালে এই ভাবধারা মুসলমানদের মধ্যে বহু বাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বহু দলে বিভক্ত করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ফলতঃ ইমামত সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হইয়াছে, নবুয়ত অর্ধমৃত অবস্থায় দুর্বল হইয়া গিয়াছে।

একটি দ্রষ্টব্য : হাদিসটির গুরুত্ব লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য ইহার শেষ অংশে অপ্রাসঙ্গিক বাজে কথা সংযোগ করা হইয়াছে বিধায় তাহা উল্লেখ করিলাম না।

ইয়াওমাল খামিস

“ইয়াওমাল খামিস” অর্থ বৃহস্পতিবার। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। রাসুল (আ) অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি বলিলেন : কাগজ কলম আন আমি অসিয়ত লিখিয়া দিয়া যাই যাহা অনুসরণ করিলে তোমরা আর কখনও বিভ্রান্ত হইবে না।

তাহার “আহলে বাইত” অর্থাৎ ঘরের লোকেরা ঐ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিয়া ঘরেই রহিলেন (অর্থাৎ সন্ধ্যায় রহিলেন) এবং নবুয়তের ঘরের শান এবং উহার দান সামলাইয়া লইলেন তাহাদের মধ্যে। আর বাহিরের লোকেরা উহা হইতে বাহির হইয়া গেল এবং বাহিরের মোর্চা সংগঠনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গঠন করিল বাহিরের শক্তির বিরাট দুর্গ।

এইরূপে বিজয়ী নবীর দানের বাহ্যিক অংশ লইয়া একদল শক্তিমদে মত্ত হইয়া উঠিল। অপর দল (অর্থাৎ আহলে বাইতগণ) নবীকে তাহাদের মধ্যে রাখিয়া তাহার দাফন কাফনে শরীক হইয়া নবীর নবুয়তের শানকে তাহাদের আওতার মধ্যে সমাহিত করিয়া আধ্যাত্মিক বিজয়ের রওজা মোনাওয়ারা তৈরি করিয়া তুলিলেন। নবী ঠোট নাড়িয়া রাব্বি হাবলি *উম্মতি, রাব্বি হাবলী উম্মতি, বলিতে বলিতে পরপারে (আলোর দেশে) চলিয়া গেলেন।

“হে আমার রব আমার উম্মত আমাকে দাও, আমার উম্মত আমাকে দাও।” এইভাবে তিনি তাহার উম্মতের সঙ্গী হইয়াই রহিলেন। শেষ নিঃশ্বাসে যে যাহা চায় সে তাহাই পায়, বিশেষ করিয়া ইহা হইল নবীর চাহিদা। ‘উম্মতি’ বলিতে সবাইকে মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। দলের বেশির ভাগ লোক হইতে হতাশাগ্রস্ত নবী গুটিকতক আপনজনকে স্বভাবতই আঁকড়াইয়া ধরিবার আকুল আবেদন প্রকাশ করিয়া উঠিলেন “হাবলী উম্মতি” বলিয়া।

যাহারা “আমার উম্মত” এই দলে রহিলেন তাহারা ই অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার অংশ পাইলেন। তাহারা আহলে বাইত দলের সমর্থক হইয়া রহিলেন। যাহারা বাহিরে রহিল, শক্তি সঞ্চয় করিল, তাহারা সংখ্যাধিক্য অর্জন করিল, প্রাচুর্য আনয়ন করিল।

“ফাতহাম্ মোবিন”-এর অধিকারী অর্থাৎ জাহেরে বাতেনে স্পষ্ট বিজয়ী, সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহেদ, বিজয় সম্রাট রাসুলের (আ) রাব্বিল আলামীন আপন গৃহে

* ‘হাবলী’ অর্থ আমাকে দান করুন।

পরদার অন্তরালে যাত্রা করিতেছেন। বাহিরের লীলা সংবরণ করিয়া এককভাবে মোমিনের অন্তরে লীলায়িত হইয়া উঠার জন্য আলোরূপে আহলে বাইতের অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যাহারা তাহাকেই চাহিল, তাহারা অন্তরে নবীর আদর্শের বুনিয়াদ শক্ত করিল। বাহিরের হুমকি অগ্রাহ্য করিল। বাহিরের বিজয়কে যাহারা গ্রহণ করিল তাহারা তাহার বিজিত রাজ্যসুখ ভোগের দিকে ছুটিল।

উপস্থিত প্রেমিকগণ তাহাদের সংসার ভুলিলেন। দেহে থাকিয়াও বিদেহী নবীর সঙ্গে তাহারাও যেন বিদেহী হইয়া গেলেন। স্তব্ধ এবং হতভম্ব হইয়া আত্মবিস্মৃত অবস্থায় তাহারাও যেন কোন অজানা কল্পলোকে যাত্রা করিলেন তাহা তাহারা নিজেরাই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, ইহা তাহাদের কি হইল? প্রেমের অভিনয় যাহারা করিতে পারে তাহারা অভিনয় করিল। মরমে যাহারা মরিতে জানে তাহারা জীবন্যুত হইল। কাহার সাধ্য তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় বাহিরের লাভ-লোকসান? ভাবুক ভাবিতে পারে না, কথক কহিতে পারে না, কি সেই রূপ? কোথা তার গতি? আহলে বাইতগণ তাহাদের দেহের গৃহে নাই। কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে।

যাহারা ওজন করিয়া প্রেম করে তাহাদের কথা আলাদা। প্রেমাস্পদের বিয়োগান্তেও তাহারা বুদ্ধি করিয়া সবকিছু বিবেচনা করিয়া অনেক কথাই ভাবিতে পারে।

এখান হইতে সাহাবীগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ার সূত্রপাত হইয়া গেল। একভাগ উম্মতে মোহাম্মদী সাহাবী, অপরভাগ কলেমা পাঠকারী সাহাবী! পরবর্তীকালে উদ্ভূত এই দুইটি দলের পরস্পর বিরোধ এবং আদর্শগত এই পার্থক্য সর্বপ্রথম নির্ণয় করিয়া দিল হাদিসে কেরতাসে উল্লেখিত এই বিশিষ্ট ঘটনা। অর্থাৎ “বেরিয়ে যাও” ঘটনা।

পরস্পর তুলনীয় কথা দুইটি

দুইটি কথা তুলনামূলকভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আলমে সিজ্জিনে অবস্থিত বান্দাগণ হইতে আল্লাহতা’লা অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছেন এই বলিয়া ‘আলাসতু বে রাব্বিকুম’? অর্থাৎ আমি কি তোমাদের রব নই? উহার জবাবে সবাই ‘বাল্লা’ অর্থাৎ হ্যাঁ বলিয়া আসিয়াছে (৭৪১৭২)। অনুরূপভাবে

রাসুলুল্লাহ (আ) তাঁহার উম্মত হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন গাদিরে খুম নামক স্থানে নিম্নরূপ কথায়, “আলাসতু আওলা বেকুম? কালু বালা, বালা ইয়া রাসুলুল্লাহ (আ)।” অর্থাৎ আমি কি তোমাদের অগ্রাধিকারী নই? উত্তরে সবাই বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া রাসুলুল্লাহ (আ)।

শুধু আল্লাহতা'লাকেই একমাত্র রবরূপে গ্রহণ করার অঙ্গীকার ভুলিয়া যাইয়া দুনিয়ায় আসিয়া অধিকাংশ মানুষ যেমনভাবে আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করিয়া রবের অনুসরণের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতা অনুসরণ করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপেই মোহাম্মদের (আ) উম্মতগণের অধিকাংশই গাদিরে খুমের অঙ্গীকার মদিনায় আসিয়াই ভুলিবার অভ্যাস করিতে লাগিল এবং নবীর নির্দেশ অমান্য করিয়া মোহাম্মদী দ্বীনের উপর স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করিয়া দিল।

মোহাম্মদী ধর্মের অপমৃত্যু

একটি মাত্র রেফারেন্স দেওয়া হইল ‘সূরা শুরা’ হইতে। (৪২ঃ১৩-১৪)।

৪২ঃ১৩। আন আক্কীমুদদ্বীনা ওয়ালা তাতাফাররাকু ফিহে কাবুরা আলাল মোশরেকীনা মা তাদউহুম ইলাইহে। আল্লাহ ইয়াজ তাবি ইলাইহে মাইয়াশাউ ওয়া ইয়াহাদি ইলাইহে মাইউনিবু।

৪২ঃ১৪। অমা তাফাররাকু ইল্লা মিম বায়াদে মা যায়া হুমুল এলমু বাগইয়াম বাইনাহুম।

ব্যাখ্যা :

১৩। ধর্ম প্রবর্তকগণের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসরণে সমধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হইলেন নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা আলাইহিমুস সালাম এবং শেষ নবী। ইহাদের প্রত্যেকের নামের উল্লেখ করিয়া অহি মারফতে আল্লাহ ঘোষণা করিতেছেন, “আমি এদের প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়েছি ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আদর্শগত একতা রক্ষা করতে।” ধর্মের মধ্যে ভাঙ্গন না লাগাইয়া একতার সহিত উহা প্রতিষ্ঠিত রাখাই এইরূপ আদেশ দানের উদ্দেশ্য। কোরান আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, মোশরেকগণের নিকট নবীদের নির্দেশিত তৌহিদের এই আদর্শ রক্ষা করা বিষয়টি বড়ই কঠিন গুরুভার মনে হইয়া থাকে। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বাছাই করিয়া নিজের দিকে টানিয়া লন এবং তিনি হেদায়েত দান করেন সেই

ব্যক্তিকে যে শেরেক বর্জনের প্রচেষ্টা দ্বারা আল্লাহর দিকে ফিরিবার জন্য রুজু হয়।

১৪। কিন্তু ধর্ম প্রবর্তকগণের চরম ত্যাগের বিনিময়ে যাহারা পরম সত্যের প্রকাশনাকে মোহগ্রস্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে কিয়ৎকালের মধ্যেই ধর্মীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বার্থকেন্দ্রিক আদর্শের দিকে ধাবিত হইতে দেখা গিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয়, সত্যের আবির্ভাবের পূর্বেও ইহাদের মধ্যে স্বার্থকেন্দ্রিক একতা বিরাজমান ছিল এবং সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়ার পরেও ইহাদিগের মধ্যে সাবেক একতা প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে। তবে বৃহত্তর সমষ্টিগত একতার ভিতরেও স্বার্থকেন্দ্রিক দলীয় প্রতিযোগিতা এদের কর্মকাণ্ডে প্রেরণা যোগাইত। এই কারণেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজ্য বিভিন্ন বিগ্রহ ও মূর্তি একই মন্দিরে সমাবেশিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ধর্মীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুতির পর ইহাদের মধ্যে পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের দিকে ইহাদের বিভিন্ন দল একই তালে আগাইয়া গিয়াছে। ধর্মের বিরোধীতা বিষয়টি অব্যাহতই রহিল। শুধুমাত্র পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিল। স্থূল মূর্তিপূজা পরিবর্তিত হইয়া বস্তুপূজা এবং স্বেচ্ছাচারিতার পূজায় নবরূপ পরিগ্রহ করিল এবং তাহা পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হইল মাত্র।

সত্য ধর্ম গ্রহণের আগেও যেমন সংঘবদ্ধ ছিল, মুসলমান হইবার পরও নতুনরূপে ধর্মের বিরুদ্ধে তাহাদের নীতিগত বস্তুবাদী ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই করিল। ইহাই ছিল তথাকথিত মুসলিম শাসন।

উমাইয়া এবং আব্বাসী শাসকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সকল শাসকগণ প্রকাশ্যভাবেই মোহাম্মদী ধর্মের বিরোধিতার ব্যাপারে তাহাদের মধ্যকার পারস্পরিক স্বার্থকেন্দ্রিক বস্তুবাদী ঐক্য নীতিগতভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। প্রকাশ্য মূর্তিপূজার রূপান্তর ঘটাইয়া আল্লাহর প্রভুত্বের পরিবর্তে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব ব্যাপক আকারে প্রতিষ্ঠিত করা হইতে লাগিল। মানুষ হইল মানুষের গড়া নীতির অধীন। ধর্মকে শুধুমাত্র আচারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। মার্জিতরূপে পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ধর্মের নামে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহাই হইল আমাদের তথাকথিত “ইসলামের ইতিহাস।”

এই প্রসঙ্গে মাওলা আলী (আ) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁহার একটি খোৎবার একাংশ দৃষ্টব্য হিসাবে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন যে, রাসুলে করিমের আগের সামাজিক অবস্থা এবং মানুষের মনোভাব তিন খলিফার রাজত্বের পরেও (আর্থিক উন্নতি ছাড়া) কোনরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার একাংশ লেখা হইল :

মাওলা আলীর (আ) একটি ভাষণ

“যখন পৃথিবীতে দীর্ঘকাল কোন পথ-প্রদর্শক বা নবী ছিলেন না, তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহ ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য আমাদের রাসুলে করিমকে পাঠিয়েছিলেন। যখন জাতিসমূহ আল্লাহ ও মানুষের প্রতি মানুষের কি কর্তব্য সে উপলব্ধিই হারিয়ে বসেছিল, যখন বিরোধ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিয়েছিল, যখন দীর্ঘ যুদ্ধ মানব সমাজকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল আর যখন পৃথিবীর দিন কাটছিল অন্ধকার আর সার্বিক হতাশায়, তখনই প্রেরিত হয়েছিলেন রাসুলে করিম। যখন মানুষের অতীত ছিল দুঃখময়, বর্তমান অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, সব শক্তি, সাহস হারিয়ে ভবিষ্যৎও ছিল হতাশাব্যঞ্জক, তখন আল্লাহ মানবজাতির কাছে আমাদের রাসুলকে পাঠিয়েছিলেন। তখন অতীত নবীদের সব শিক্ষাই মানুষ ভুলে গিয়েছিল। সর্বত্রই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল ধ্বংস আর বিনাশ। মানবতার পক্ষে তখন পৃথিবী হয়ে পড়েছিল এক অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক স্থান, চারদিকে বিরাজ করছিল ধ্বংস আর মৃত্যু, ভয় আর আতঙ্ক, যুদ্ধ আর বিশৃঙ্খলা।

হে আমার জাতি! মানুষের ইতিহাস থেকে পাঠ গ্রহণ করো। তোমাদের পিতা পিতামহ আর ভাইদের জীবনের পরিণতি দেখে সাবধান হও, পাছে তোমরাও না আবার ওদের অনুসারী হয়ে পড়-জীবনের হিসাব ওদের দিতেই হবে একদিন।

আমার জীবনের শপথ, তাদের আর তোমাদের মাঝখানে খুব যে দীর্ঘকালের ব্যবধান ঘটেছে তা নয়, কাজেই এত শীঘ্র তোমরা তাহাদের জীবনের কথা ভুলে যাবে এ আশা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের জীবন

তোমাদের কিছুই শেখায়নি, কোন বদল ঘটায়নি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আর তোমাদের মনের সাধন করেনি কোন রকম উন্নতিও। রাসুলে করিমের সময় তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে রকম ব্যবহার করেছিল, তোমরাও এখন অবিকল সে রকম ব্যবহারই করছ।

আল্লাহর শপথ রাসুলে করিম তোমাদের বাপ-দাদাকে যে সব বিষয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন, আমিও অবিকল সে সবই তোমাদের শেখাচ্ছি আর তোমাদের প্রতিক্রিয়াও অবিকল রাসুলের চারপাশের লোকদের প্রতিক্রিয়ার মতই। কেউ কেউ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল কিন্তু অধিকাংশই হয় সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে ছিল, না হয় সর্বান্তঃকরণে করেছিল তার বিরোধিতা। তোমাদের মনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তোমরা অতীত থেকে কোন পাঠই গ্রহণ করেনি।

মনে রেখো, তোমাদের বাপ-দাদাকে যা বলা হয়নি, আমি তোমাদের তেমন কিছুই বলছি না। আর এমন কোন মতামতই তোমাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে না, যা তাদেরও বলা হয়নি—যে দুঃখ-কষ্ট তোমরা ভোগ করছো, তেমন দুঃখ-কষ্ট তাদেরকেও পোহাতে হয়েছিল। তাদের জীবন হোক তোমাদের পাঠশালা।

আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, ধূর্ত, প্রবঞ্চক ও পরস্বার্থ হরণকারী শয়তান লোকেরা যে সব ধনসম্পদ, ক্ষমতা, আরাম-আয়েশ আর পাপ দুষ্কর্ম নিজেদের চারিদিকে জমা করে নিয়েছে, তা যেন তোমাদের মুঞ্চ আর প্রলুব্ধ না করে।

কারণ, “জীবন হচ্ছে পৃথিবীর বুকে ছায়ার মতো, চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আগে তা ক্ষণিকের জন্য দীর্ঘ হতে পারে কিন্তু শেষকালে তা’ মুছে যাবেই।”

মাওলা আলী (আ) তাঁহার আর একটি খোৎবার এক জায়গায় লিখিয়াছেনঃ “দেশে ক্ষুদ্র একদল লোক আছে যারা সংখ্যায় খুব কম, তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহকে ভয় করে চলে। আল্লাহর শক্তি আর মাহাত্ম্যের সত্যিকার উপলব্ধি তাদের নিষ্ঠুর দুষ্কর্ম আর উগ্র আচরণ থেকে দূরে রাখে। বিচার দিনের ভয়ে তারা নিজের জীবনকে অসার ও তুচ্ছ কাজে কাটিয়ে দেয় না। এখনকার চারদিকে পরিবেশ অত্যন্ত দুঃখ ও হতাশাজনক। তারা সমাজ থেকে হয় বিতাড়িত। প্রায়ই তাদের করা হয় অপমানিত, নির্যাতিত আর আতঙ্কগ্রস্ত। এদের কেউ কেউ নীরব কর্মী, অত্যন্ত সরল ও আন্তরিকতার

সাথে তারা মানুষকে আল্লাহ ও ধর্মের পথে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে-অন্যরা এটুকু করার ও সুযোগ পায় না, হীনতা আর দারিদ্র্য পরিবেষ্টিত হয়ে নির্জনে তারা জীবন কাটিয়ে দেয় আর অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে নিজের সংকল্পে থাকে অটল। তাদের অবস্থা হাত, পা আর মুখ বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত মানুষের মতো-সে সাঁতার কেটে কূলেও উঠতে পারে না, আবার সাহায্যের জন্যও পারে না চিৎকার করতে।

তারা মানুষ ও আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করেছে-আত্মা চেষ্টা করেছে মানুষকে সত্য আর ধর্মের পথে আনতে। কিন্তু এমন নিষ্ঠুরতার সাথে তাদের দমন করা হয়েছে যে, হয় তারা সামাজিক সব মান-মর্যাদা হারিয়ে বসেছে, নতুবা তাদেরকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে যে, এখন তাদের অতি অল্প সংখ্যকই শুধু বেঁচে আছে।

তোমাদের জানা উচিত পাপ জীবন আর পাপের পথে অর্জিত বিলাস আড়ম্বরের কোন মূল্য নেই, এভাবে অর্জিত পার্থিব সম্পদকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করো। যারা এ সংসার প্রেমে উন্মত্ত, সংসার সব সময় তাদের করেছে পরিত্যাগ। তোমাদের নিজের জীবন অন্যদের পাঠ গ্রহণের জন্য ইতিহাসের পাতায় পরিণত হওয়ার আগে, তুমি অন্যের জীবন থেকে গ্রহণ করো সাবধানতার পাঠ।”

ইহা মাওলা আলী (আ) কর্তৃক লিখিত “নাহজুল বালাগা” নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি। অধ্যাপক আবুল ফজল কর্তৃক প্রকাশিত “হজরত আলী” নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

নবুয়তের প্রচার ও

রেসালত পালনের দায়িত্ব অর্পণ

গাদিরে খুমে মাওলা আলীর (আ) উপর নবুয়তের দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করিয়া রাসুলুল্লাহ (আ) পরদা গ্রহণ করিলেন। বেলায়েত দান করার ক্ষমতা এবং অধিকার দান করিয়া গেলেন মাওলা আলীকে (আ)। উলিল আমার ব্যতীত অন্য কেহ নবীকে পরিচিত করাইতে অক্ষম।

“আলীউন অলি আল্লাহ” অর্থাৎ “আলী আল্লাহর বন্ধু”। ইহা দ্বারা আলী (আ) হইতে মোহাম্মদী বেলায়েতের উৎস-মুখ রচনা করিয়া গেলেন রাসুলুল্লাহ। পরবর্তীকালের সকল অলিগণের ফয়েজ প্রাপ্তি এখান হইতেই

হইয়াছিল। আল্লাহর বন্ধু আলী (আ) হইতে এই বন্ধুত্বের ধারা প্রলম্বিত হইয়া চলিতে থাকিবে যাহা দ্বারা মোমিনদিগের মধ্যেও বিশেষ ব্যক্তিগণকে আল্লাহর বন্ধুত্বের পরশ দান করা হইতে থাকিবে তিনি এবং তাহার বংশধর হইতে মনোনীত ইমামগণের নেক নজরের দ্বারা। জামানার ইমামের অনুমোদন ব্যতীত ফয়েজ দান করিবার অধিকার কাহারও নাই।

হাদিসে রাসুলে উক্ত আছে : “মান মাতা অলাম ইয়া রেফু ইমামে জামানা ফাকাদ মাতা মাওতাল জাহেলিয়াত।” অনুবাদ : যে মরিয়্যা গেল এবং জামানার ইমামের পরিচয় লাভ করিল না, তবে নিশ্চয় সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করিল।

মাওলা আলী যে “অলি আল্লাহ” এবং “অসিয়ে রাসুলুল্লাহ” হিসাবে মোমিনদের মাওলা নিযুক্ত হইয়াছেন, একথা তখনও লোকেরা একেবারে ভুলিয়া যায় নাই, তথাপি মাওলার ভাষণে আমরা দেখিতে পাই লোকেরা মোহাম্মদী আদর্শ মাওলার জীবদ্দশাতেই ত্যাগ করিয়া চলিয়াছিল। আলী (আ) হইলেন শ্রেষ্ঠ একজন ইমামুন নাস। রাসুলের (আ) সময়ে মনোনীত “ইমামুন নাস” আলীর প্রতি জনসমর্থনের যেইরূপ দূরবস্থা দেখা যাইতে লাগিল তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাজশক্তি পরবর্তীকালে জনগণের ধর্ম এবং নৈতিকতাকে আরো কত বেশী পরিমাণে ব্যতিক্রমের দিকে লইয়া গিয়াছিল। পরবর্তীকালের পরিবর্তিত ধর্ম-ব্যবস্থায় এবং সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহর প্রজা না হইয়া রাজাদের প্রজা হইয়া গেল এবং আল্লাহর ধর্ম ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজাদের মনোনীত ধর্ম বিধানের অনুসারী হইয়া গেল। মোহাম্মদী ধর্ম মোটেই তার স্বরূপে আর থাকিতে পারিল না, যদিও তাহা আপাতদৃষ্টিতে মোহাম্মদী ধর্ম বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

একটি মন্তব্য

শিয়া ধর্মের মৌলিক ভিত্তিগুলি অধিক শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও তাহারা অতিরঞ্জন এবং স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন কোন বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি করিয়াছে যে, সুন্নিদের বিভ্রান্তি হইতেও তাহারা অতিমাত্রায় আগাইয়া গিয়াছে।

শিয়া মোস্তাহিদগণ পরবর্তীকালে অনেক কথাই ইমামগণের নাম করিয়া চালাইয়া দিয়াছে তার যথেষ্ট প্রমাণ তাহাদের লেখা পুস্তকাদি হইতেই পাওয়া যায়।

মাওলাইয়াত দিবস

পালন উপলক্ষে

(ইয়াওমাল গাদীর)

Declaration of "Mawlaiyat" i. e. -Overlordship.

বিশ্বাসীর জন্য “এলানে নুবয়ত” যেমন একটি স্মরণীয় এবং পালনীয় দিবস তেমনই “এলানে মাওলাইয়াত” একটি বিশেষ পালনীয় দিবস। বিশ্বাসীর উদ্ধারের জন্য জ্ঞানের এই দরজার ভিক্ষা বা বক্শিশ পাইতেই হইবে, নতুবা জাহান্নাম হইতে উত্তোরণ উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য সম্ভবপর নয়।

‘মাওলাইয়াত’-এর জাহের

রাসুলে খোদার জাহেরী অবর্তমানে তাঁহারই জায়গায় সকল কাজের জাহেরী এন্তেজাম দেওয়ার জন্য আলীকে (আ) ‘মাওলা’ অর্থাৎ নেতৃত্ব দান করিবার জন্য অধিস্বামী বা প্রতিনিধি বানাইয়া গেলেন।

স্বভাবে জড়বাদের দিকে যাহাদের প্রবণতা বেশি তাহাদের জন্য রাসুলের (আ) দৈহিক অবর্তমানে রাসুলাল্লাহর (আ) স্থলে বিশ্বাসীগণের নেতৃত্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশে আল্লাহতা’লার নির্দেশে রাসুল পাক (আ) ১৮ই জিলহজ তারিখে খুম নামক স্থানে জলাশয়ের (গাদির) সন্নিহিতে সাহাবীগণের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন আলী শেরে খোদার ‘মাওলাইয়াত’ বা রাসুলের (আ) স্থলাভিষিক্ত নেতৃত্ব। ইহাই হইল সাধারণভাবে সর্বসাধারণের জন্য গাদিরে খুমের ঘটনা।

‘মাওলাইয়াত’-এর বাতেন

জাহেরী বিষয় হইতে ‘মাওলাইয়াত’-এর আধ্যাত্মিক বিষয়টি অধিকতর ব্যাপক এবং সুগভীর অর্থবহ। রাসুল (আ) সারা সৃষ্টির রহমতরূপে সর্বকালে অবস্থান করেন এবং তাঁহার প্রতিনিধি ‘মাওলা’ বিরাজ করেন তাঁহারই মনোনীত অধিস্বামী রূপে (Overlord)। সকল দেশে সকল যুগে মানবগোষ্ঠীর

হেদায়েতের জন্য মাওলার মনোনীত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বেলায়েতের মহারাজা মাওলা আলী (আ) যে মহান কর্তব্য বেনামীতে পালন করিয়া আসিতেছেন তাহা মুশকিল কুশা মাওলা আলীরই (আ) কৃতিত্ব।

আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন

রাসুলুন রাহমাতুল্লিল আলামীন

আলীউন্ মাওলাউল আলামীন

আধ্যাত্মিকতার শিখরে আরোহণ করিয়া মানবাত্মা যখন জ্যোতির্ময়তার সীমাহীন প্রসার দর্শন করে তখন জ্যোতির্বলয়ের ছটায় ছটায় আল্লাহতা’লার রবুবীয়ত, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রেসালাত এবং হযরত আলী শেরে খোদার মাওলাইয়াত অপরূপ রূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। দর্শন বিমুগ্ধ মানবাত্মাকে বিশ্বজনীন মাওলাইয়াত সর্বকালীন রেসালত পর্যন্ত পৌছাইয়া দিলে রেসালতের মহিমায় মানবাত্মা চির আরাধ্য আল্লাহতা’লার রবুবীয়ত পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। ইহা উর্ধ্বতন ব্যক্তিগণের জন্য ‘মাওলাইয়াত’-এর স্বরূপ।

এইরূপে আমরা কোরানে দেখিতে পাইঃ মানবাত্মা শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া জান্নাতের উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হইলে যেইভাবে বিশ্বস্রষ্টাকে রব্বরূপে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে ডাকিয়া থাকে তাহা হইল আলহামদুলিল্লাহে রাক্বুল আলামীন (দ্রষ্টব্য ১০ঃ৫-১০)।

খোদার খোদায়ি যতদূর (বিস্তৃত)

রাসুলের রেসালত ততদূর

মাওলার মাওলাইয়াত ততদূর

প্রার্থনা : “আলীর (আ) মাওলাইয়াত”-এর প্রতি নূতন শপথ গ্রহণের মধ্যে আজকের এই দিনে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচনের সহিত আমাদের সুপ্রভাত হউক। ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা। মাওলাইয়াত দিবস পালন উপলক্ষে আজকে আমাদের এই ছোট্ট একটি প্রার্থনা।

মাওলাইয়াত হইল পারত্রিক কল্যাণ অর্থাৎ আখেরাত তৈরির ব্যবস্থা। অপরপক্ষে মানুষের ভোটের খেলাফত হইল দুনিয়ামুখী ব্যবস্থা। দুনিয়ার খেলাফত খোদাই বিধান নয়, অর্থাৎ কোরানের অনুসারী নয়।

‘মাওলাইয়াত’-এর লক্ষ্য হইল মুসলমান জনগণের উপর কোরানী বিধান বলপূর্বক স্থাপন করা। কিন্তু যেহেতু মাওলাইয়াত মানুষের ব্যবহারিক জীবনে নিয়মানুবর্তিতা এবং সংখ্যমের বাধন আরোপ করে সেইহেতু ইহা অধিক জনসমর্থন লাভ করে নাই।

যদি উম্মতগণ মাওলাইয়াতের অধীনতা মানিয়া লইতে রাজি থাকিত তাহা হইলে এমন একদল সুদক্ষ এবং আত্মত্যাগী সমর্পিত-প্রাণ ইসলাম প্রচারক দলের সৃষ্টি হইত যে, তাহাদের প্রচার কার্যের কারণে খেলাফত এত স্বল্পস্থায়ী হইতে পারিত না। সামান্য পরিমাণ যেটুকু ইসলাম খেলাফতে রক্ষিত হইতেছিল তাহারও চরমভাবে পতন ঘটিল।

ইহার একমাত্র কারণ মাওলাইয়াত তাহারা ভালবাসে নাই। তাই আলীকেও (আ) তাহারা খেলাফতের পর্যায়ে নামাইয়া লইতে ভালবাসে, যাহাতে পরবর্তী উমাইয়া এবং আব্বাসী রাজত্বগুলিকে ধর্মীয় রাজত্ব বলিয়া গ্রহণ করার মত আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। এইরূপে ঐ সকল রাজাদের ইতিহাস আজও ইসলামের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে, যদিও মোহাম্মদী ইসলামের কিছুই তাহাদের ছিল না। খেলাফতের পাশাপাশি মাওলাইয়াতকে রক্ষা করিয়া চলিলে কারবালায় ইসলামের সমাধি রচনা হইত না।

অতএব, আলীকে (আ) “চতুর্থ খলিফা” বলা অধর্ম। আশ্চর্য কথা এই যে সুন্নি মুসলমানদের কেতাব ভরা মাওলাইয়াতের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তাহারা কেমন করিয়া আলীকে (আ) চতুর্থ খলিফা বলিয়া থাকে?

Mawlaiyat is spiritual and khilafat as established by people's vote is worldly. Worldly khilafat is not faithful to divine constitution, that is the Quran. Mawlaiyat aims at enforcing the Quranic constitution on Musalmans at large. But because Mawlaiyat entails discipline and restrictions on human behaviours it did not gather much support. Had the Ummat agreed to live in subjugation to Mawlaiyat it would have resulted in the production of the most efficient and dedicated group of Islamic missionaries whose presence could have checked the downfall of a short lived khilafat.

The culmination of the effect of the denial of Mawlaiyat resulted in the brutal killing of Imam Hossain (A) with all his supporters at Karbala. The killing of Hossain (A) was not killing of Hossain (A) alone, but it was a killing of the Lord himself by the Kafirs.

ঈদে গাদির

মুসলমানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ “ঈদ দিবস” অর্থাৎ “আনন্দ দিবস” হইল গাদিরের অভিষেক দিবস। রাসুল (আ) তাহার আধ্যাত্মিক শক্তির বুনিয়াদ উম্মতগণকে দান করিয়া গেলেন। আল্লাহর সমগ্র জ্ঞানের অধিকারী রাসুলুল্লাহ (আ) তাহার জ্ঞানের দ্বার খোলা রাখিয়া গেলেন। মৃত্যুর পরশ লাগিয়া উহা অন্তর্ধান হইল না। যাহাতে সাধারণ মানুষও সেই দ্বার হইতে জীবন দর্শন এবং জ্ঞান আহরণ করিতে পারে সেই ব্যবস্থাই তিনি করিয়া গেলেন যোগ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া।

ইরানে ইহাকে ‘নওরোজ’ বলা হয়, কারণ নবী অন্তরালে চলিয়া গেলেও জ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচনের সকল এস্তেজাম মওজুদ রহিল। ইহা রাসুলুল্লাহর (আ) জ্ঞানরাজ্যের “প্রবেশ দ্বার”-এর উদ্ঘাটন দিবস। অতএব, ইহা পরবর্তী সমগ্র মানবজাতির জন্য নবুয়তের জ্ঞান লাভের পথ দ্বার উদ্ঘাটন দিবস। স্বর্গীয় জ্ঞান আহরণ ইচ্ছুক প্রতিটি মানবের জন্য ইহা একটি আশীর্বাদ।

রাসুলুল্লাহ (আ) আল্লাহর সমগ্র জ্ঞানের অধিকারী। সমগ্র জ্ঞানের কোন একদিকেও যদি তিনি অসম্পূর্ণ থাকেন তাহা হইলে সেই বিষয়ে কোন প্রশ্ন যদি কেহ করে এবং নবী যদি উত্তরে বলেন : “আমি ইহা জানি না” তাহা হইলে তিনি আল্লাহর রাসুল হইতে পারেন না। এইজন্য দেখিতে পাই নবীর (আ) জ্ঞানের যিনি দ্বার তিনিও বলিয়াছেন, “যাহা কিছু জানিতে চাও আমি বাঁচিয়া থাকিতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে পার” (হাদিস)। এদিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় মানুষের নিকট জ্ঞানের ভাণ্ডার আগমনের মহান আনন্দ দিবস হিসাবে ঈদে গাদির হইল অতুলনীয়।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّمَ) يَوْمَ غَيْرِ خَمِ أَفْضَلَ أَعْيَابِ
 آمَنِي - وَقَوِ الْيَوْمَ الْكُذْرَ أَمْرِي اللَّهُ تَعَالَى زَكْرَةً
 بِتَضَيِّبِ أَخِي عَلَى بَيْتِ أَبِي مَا لَيْبَ عَلَمًا لَا مَتِي يَهْتَرُونَ
 بِهِ مِنْ بَعْدِي - وَقَوِ الْيَوْمَ الْكُذْرَ أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَيْدَ
 وَأَتَمَّ عَلَى آمَنِي فِيهِ لِنَعْمَةٍ وَرَضَى تَعْمَ إِلَّا سَلَّمَ رَيبًا

হাদিসটির অনুবাদ

রাসুলুল্লাহ (আ) বলিয়াছেন : গাদিরে খুম দিবস আমার উম্মতের সকল ঈদ দিবস হইতে উত্তম। এবং উহা সেইদিন যেদিন আল্লাহ তা'লা আমাকে তাঁহার (সঙ্গে) সংযোগের নির্দেশ দিলেন আমার ভাই আলী ইবনে আবু তালেবের বংশধরের সহিত-যাহাতে (তাঁহারা) আমার পরে জ্ঞান দান করিতে পারেন আমার উম্মতের হেদায়েত লাভের জন্য। এবং উহা সেদিন যেদিন আল্লাহ আদদীনকে পরিপূর্ণ করিলেন। এবং আমার উম্মতের উপর নেয়ামত (দান করা) পরিপূর্ণ করিলেন। এবং তাহাদের (অর্থাৎ উপস্থিত উম্মতদের) আত্মসমর্পণের দ্বীনের উপর আল্লাহ রাজি হইলেন।

“সৈয়দ ইবনে হাসান নজফী”-এর লিখিত “গাদিরে খুম”
 নামক উর্দু পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত। ইহা ফারাত ইবনে
 ইব্রাহিম কুফির তফসীর হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন
 বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ (আ) ঘোষণা করিতেছেন যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য যত রকমের আনন্দ দিবস রহিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বোত্তম আনন্দ দিবস হইল খুম দিবস। ইহার কারণ খুম দিবস এমন একটি দিবস, যেদিন আল্লাহ তা'লা রাসুলকে (আ) নির্দেশ দিলেন যেন রাসুলুল্লাহ (আ) তাঁহার ভাই আলীর (আ) বংশধরের সঙ্গে আল্লাহর সংযোগ লাগাইয়া দেন। নবী বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তাই নবীর অবর্তমানে উম্মতগণের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'লা তাঁহার নবীকে নূর-মোহাম্মদীর ধারক এবং বাহক প্রতিনিধি তৈরি করিয়া জাহেরে বাতেনে তাঁহাদিগকে সেই নূরের অধিকারী

করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতেছেন এবং তাহা দ্বারা তাঁহাদিগকে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতে বলিতেছেন।

নবী বর্তমান থাকতে উম্মতকে জ্ঞানদান করিবার অধিকার কাহারও নাই। তাই তাঁহার জাহেরী অবর্তমানে তাঁহার যোগ্য প্রতিনিধি তৈরি করিয়া উম্মতগণকে জ্ঞানদান করিবার অধিকার আলী (আ) ও তাঁহার বংশধরকে আনুষ্ঠানিকভাবে (এই দিনে) অর্পণ করা হইল। কেহ হয়তো বলিবেন আলীর (আ) সঙ্গে তাঁহার বংশধরের কাহারও অভিষেক সেইদিন হয় নাই। তাহা হইলে এই হাদিসে বংশধরের কথা উল্লেখিত হয় কেমন করিয়া? এই অভিষেক দ্বারা আলীর (আ) বংশ হইতে একের পর একজন করিয়া নবীর নায়েব নিয়োগ করিবার অধিকার দেওয়া হইল। আল্লাহর দড়ি (হাবলুল্লাহ) প্রলম্বিত করিয়া দেওয়া হইল একের পর একজন করিয়া নায়েবে নবী নিয়োগ করিবার অধিকার দানের মাধ্যমে। এইসব নিয়োগ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুলের (আ) ইচ্ছাক্রমেই একের পর এক হইতে থাকিল। নবী তাঁহার প্রতিনিধির মাধ্যমে জাহেরীভাবে বিদ্যমান থাকিলেন। কিন্তু বার জনের পর আল্লাহর এই দড়ি মানুষের অবাধ্যতার জন্য ছিন্ন হইয়া গেল।

খুম দিবসে উম্মতে মোহাম্মদীর দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করিল, কারণ মোহাম্মদী দ্বীনের আলোর দ্বার তথা জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। নবীর এশেকালের দ্বারা উহার সমাপ্তি ঘটিল না। ফলতঃ রাসুলের (আ) উম্মতের উপর আল্লাহর দেয়া নেয়ামত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ তা'লা খুমে উপস্থিত ব্যক্তিগণের দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হইলেন-যাহারা সত্যিকার আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। অর্থাৎ আত্মসমর্পণের দ্বীনকে যাহারা খুম দিবসে আনুগত্যের দ্বারা গ্রহণ করিল তাহাদের উপর আল্লাহ রাজি হইলেন।

ইহাকে নওরোজ কেন বলা যাইতে পারে

সেই তারিখ ছিল একুশে মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ, মোতাবেক ১৮ই জিলহজ ১০ হিজরী, জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়।

ইহা কোন মাসেরও প্রথম নয়, বৎসরেরও প্রথম নয়; তবে কেমন করিয়া আমরা একুশে মার্চকে নওরোজ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি?

শেষ নবী অন্তরালে চলিয়া গেলেন। নবুয়তের জামানা শেষ হইল। মাওলাইয়াত বা ইমামতের জামানা আরম্ভ হইল এবং ইহা হইল তাহার প্রথম দিন। এই হিসাবে ইহা “নূতন দিন”।

ইহাকে বেলায়েতের দ্বার উদ্ঘাটন বলা হইয়া থাকে। রাসুল করিমের (আ) যে সকল নিকটবর্তীজনের জন্য ‘মোয়াদ্দাত’ বা ভালবাসা দান করিবার জন্য আল্লাহ তা’লা উম্মতগণকে আদেশ দিয়াছেন তাহাদের মধ্যকার প্রধান এবং মূল যে ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে জনগণের নিকট রাসুলুল্লাহ (আ) পেশ করিয়া গেলেন, এ অভিষেকের দ্বারা। তিনি বলিয়া গেলেন আলীকে (আ) ভালবাসিলে এবং তাঁহার নীতির সাহায্য করিলেই আল্লাহর পথ পাওয়া যাইবে। যাহারা মাওলা আলীর (আ) পথ ধরিবে না তাহারা আল্লাহর দূশমনরূপে গণ্য হইবে।

এই অভিষেক নবযুগের সূচনা করিল। মক্কার কোরাইশগণের বিরোধীতা করিবার শক্তি চূর্ণ করা হইল। সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। উম্মতগণের জীবনযাত্রা আল্লাহর অনুমোদনের মধ্যে আসিবার সুব্যবস্থা করা হইল। এখান হইতে নূতন আর এক যুগ আরম্ভ হইবে। আল্লাহর শাসন ধরার বৃকে মাওলাগণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কিন্তু হায় সকলই গরল ভেল! ধরার বৃকে স্বর্গরাজ্য স্থাপন হইতেই দেওয়া হইল না। ঈদ বিষাদে পরিণত হইল।

এখন হইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মোহাম্মদী দ্বীনের প্রয়োগ বিধি বহির্জগতের সকল জাতির নিকট পেশ করা হইবে। জগত দেখিবে মোহাম্মদী নবুয়তের শাসনব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার একটি নূতন রূপ। কিন্তু হায়, ইহাকে মোটেই অগ্রসর হইতে দেওয়া হইল না। জগত মোহাম্মদী শাসন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইল না।

হিজরী সাল গণনা আরম্ভ করা হয় হযরত ওমরের রাজত্বকালে। এর পূর্ব পর্যন্ত খ্রিষ্ট সালের হিসাব অনুযায়ী সময়ের হিসাব চলিয়া আসিতেছিল। যেহেতু রাসুলুল্লাহ (আ) খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী সালের হিসাব করিতেন সেইহেতু ইরান সরকার আজও ২১শে মার্চ তারিখে এ দিনটি স্মরণ করিয়া আসিতেছে। যদিও মাওলা আলীর (আ) অভিষেক দিবস অপেক্ষা সূর্যের বাৎসরিক ভ্রমণ পথে প্রথম রাশি মেঘ রাশির মধ্যে প্রবেশ দিবস হিসাবেই ইহার অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়া আসিতেছে, তথাপি ঈদে গাদির সেখানে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

খুম দিবসের আনুষ্ঠানিক একটি আমল

“নাহজুল বালাগাতে” মাওলা নির্দেশ করেছেন যে, আমাকে যারা ভালবাসে তারা যেন এই দিনে এই সাতটি সূরা তেলাওয়াত করে : ১। সূরা বনি ইসরাইল ২। সূরা নূর ৩। সূরা হাদিদ ৪। সূরা হাসর ৫। সূরা সাফ ৬। সূরা মারিজ ৭। সূরা আলা।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ব্যবস্থা হইল : গোছল করিয়া চাশতের ওয়াস্তে উক্ত সূরা কয়টি পাঠ করা।

সকাল বেলা ৩৬০ বার ইয়া জালজালালে অল একরাম পাঠ করা অথবা ইহা ১০৯৮ বার পাঠ করা। সেদিনকার দরুদ পাঠ এইরূপ হওয়া ভাল :

সাল্লাল্লাহু আলা রাহমাতুললিল আলামীন

সাল্লাল্লাহু আলা মাওলাল আলামীন!

তিনি যে রুহানী নেতৃত্ব দান করিয়া গেলেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার সেই ফয়েজ লাভের আশায় এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত কাটান উচিত।

মুসলমানদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ দিবস হইল “ঈদে গাদির” দিবস। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদিগকে উহার বিষয় এমনভাবে ভুলাইয়া দিয়াছে যে, উহা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোকের সংখ্যাও সমাজে খুব কম। আরও আশ্চর্যের বিষয় হইল : শিয়াগণ ঐ দিবসটি উদ্‌যাপন করিয়া উহার স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের নিকটও ঈদ হিসাবে উহার স্থান বা মর্যাদা সংখ্যাধিক দল কর্তৃক পালিত বৎসরের দুইটি ঈদের চেয়ে গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শিয়াগণ সংখ্যাধিক দলের চাপে পড়িয়াই বোধহয় ঐ দিবসটিকে নিছক স্মৃতি দিবস হিসাবেই পালন করে। অন্য দুইটি ঈদের চেয়ে অধিক আনন্দের উৎসব হিসাবে উদ্‌দীপনার সহিত তাহাদিগকে পালন করিতে দেখা যায় না। ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। হাজার বছরের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বোধহয় ইহার মূল কারণ। “আকমালে দ্বীন এবং আতমামে নেয়ামত”-এর জন্য গুরুত্ব করা ওয়াজেব। এই তারিখে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া সেজদায় যাইয়া “আল হামদুলিল্লাহ আশুকরো লিল্লাহ” ১০০ বার পড়া আবার সেজদায় যাইয়া ইহা ১০০ বার পড়ার বিধান দিয়াছেন জ্ঞানী লোকেরা। শিয়াদের একদল এই তারিখে রোজা

রাখে এবং অপর আর এক দল এই তারিখে ফজরের ওয়াক্তে গোছল করে। আনন্দের দিনে রোজা রাখা বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

বর্তমান ইরানের নওরোজ

নওরোজ সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় লিখিত শিয়া মোস্তাহিদগণের “তোহফাতুল আওয়াম” নামক পুস্তকে যাহা বর্ণিত আছে তাহা হইতে কিছু অংশ বাংলায় প্রকাশ করা হইল : “নওরোজ” সেই দিন, যেদিন সূর্য মেঘরাশিতে প্রবেশ করে। সৌর হিসাবে সেইদিন ২১ শে মার্চ। এই দিনের বহু উপকারিতা রহিয়াছে। ইমাম জাফর সাদেকের (আ) প্রখ্যাত সাহাবী মোয়াল্লা বিন খানিস বর্ণনা করেন : একবার নওরোজ দিবসে আমি ইমাম সাহেবের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইমাম সাহেব বলিলেন : অদ্যকার তারিখে আল্লাহতা'লা বান্দাগণের আত্মাসমূহ হইতে এই অঙ্গীকার আদায় করিয়াছিলেন যে, তাহারা আল্লাহর তৌহিদে ঈমান রাখিবে এবং এবাদতে আল্লাহর সঙ্গে কাহারও শরীক করিবে না। এই তারিখে সর্বপ্রথম সূর্যের কিরণ পৃথিবীর মাটিকে স্পর্শ করিয়াছিল। এই তারিখেই মহা প্লাবনের পর নূহ পয়গাম্বরের নৌযান (Mount Judas) যুদি পাহাড়ে থামিয়াছিল। প্লেগের ভয়ে কয়েক হাজার লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। সে কারণে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে একত্রে মৃত্যু দিলেন। দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গেল, তাহাদের কঙ্কালের কিছু অবশিষ্ট ছিল যাহা দেখিয়া খেরকিল পয়গাম্বর বলিয়াছিলেন : মাবুদ, মৃত্যুর পরে তুমি কেমন করিয়া আবার জীবন দান করিবে? উত্তরে আল্লাহতা'লা পয়গাম্বরকে শুষ্ক হাড়ের উপর পানি ছিটাইবার আদেশ করিলেন। পানি ছিটাইবার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কঙ্কালগুলিতে জীবনের সূচনা হইয়া ঐগুলি জীবন্ত মানুষে পরিণত হইল। এই কারণেই নওরোজের এই তারিখে মোমিনগণের উচিত পরস্পরের প্রতি পানি ছিটান, কিংবা প্রত্যেকের গোসল করিয়া নেওয়া উচিত। এই তারিখেই হযরত আলী (আ) হযরত মোহাম্মদের (আ) কাঁধে উঠিয়া কাবাঘরের মূর্তি ভাঙ্গিয়াছিলেন। এই তারিখেই ঈদে গাদির হইয়াছিল। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের হত্যাকাণ্ডের পর এই তারিখেই হযরত আলী (আ) খেলাফতের জাহেরী গদিতে সমাসীন হইয়াছিলেন এবং এই তারিখেই খারিজীদের বিরুদ্ধে নেহের ওয়ানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই তারিখেই ইমাম মেহেদী (আ) জাহির হইবেন।

অতঃপর ইমাম জাফর সাদেক (আ) তাহার সাহাবী মোয়াল্লা বিন খানিসকে বলিলেন : “আজিকার দিন আমার এবং আমার শিয়াগণের দিন। এই দিনে তোমরা স্নান করিবে; ভাল পোশাক পরিবে, সুগন্ধি ব্যবহার করিবে; জোহরাইনের নামাজ পড়িবে।”

ইহা ছাড়া আরও কয়েক প্রকার দোয়া পাঠের ব্যবস্থা উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে এবং বালা মসিবত হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য তদবীর রহিয়াছে। শিয়াগণ এই দিন সুগন্ধযুক্ত এবং জাফরান মিশ্রিত পানি একে অন্যের অঙ্গে ছিটাইয়া আনন্দ উৎসব পালন করে।

ইরান অগ্নিপূজার দেশ ছিল। সূর্য অগ্নির প্রতীক। সূর্য তার বারটি রাশিচক্রের পথে যাত্রা শুরু করে তাহাদের মতে ২১শে মার্চ তারিখে। এই হিসাবে ইরানের জাতীয় প্রাচীন কৃষ্টিকে নূতন ছাচে ঢালিয়া ইহাকে একটি জাতীয় নববর্ষ দিবসরূপে গ্রহণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রাচীন কোন একটি ইরানী ভাবধারাকে হয়তো তাহারা নূতন রূপ দিয়াছে। ইরানীগণ যে নওরোজ পালন করিয়া থাকে তাহার সঙ্গে ইসলামের বা ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাদের নিজেদের রচিত অনেক কথাই তাহাদের দলীয় চিন্তাধারার মধ্যে ঢালাইয়া দিয়াছে মহান ইমাম সাহেবগণের নামের উপর। ভূগোলের হিসাব মতে ২৩শে মার্চ তারিখে দিন এবং রাত সমান হইয়া থাকে।

আমার সালাম পৌছাইয়া দিও

এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। গাদিরে খুমের ভাষণ এবং ইহার এক সপ্তাহে আগে আরাফাতের বিদায় হজের ভাষণ—এই উভয় ভাষণে তিনি এরশাদ করিয়াছিলেন বিশেষ একটি ছোট কথা, তাহা ছিল এইরূপ : “তোমাদের নিজ নিজ এলাকার লোকদের মধ্যে যাহারা এখানে উপস্থিত নয় তাহাদিগকে আমার সালাম পৌছাইয়া দিও।”

সাধারণ অর্থ : সাধারণ অর্থে রাসুলের (আ) “শুভেচ্ছা ও সম্ভাব” এবং সংবাদ পৌছাইয়া দেওয়া বুঝায়। আমরা সাধারণভাবে ইহাই বুঝিয়া থাকি যে, রাসুলের (আ) কল্যাণকর শুভেচ্ছার বাণী সবার নিকট পৌছাইয়া দিতে হইবে। অতএব, আমরা মনে করি এই কর্তব্য পালন করা এখন আর আমাদের উপর নয়। ইহা ছিল তখনকার উপস্থিত শ্রোতাদের উপর। আসলে এইরূপ সাধারণ অর্থে এই কথাটি বলেন নাই। আল্লাহ এবং তাহার

রাসুলগণের কথা কখনও শুধু সাময়িক অর্থ বহন করে না, বরং তাহা চিরন্তন অর্থবহ হইয়া থাকে।

প্রকৃত বা গভীর অর্থ : সংসারে সকল মানুষ অশান্তি এবং নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করিয়া থাকে। নিরাপত্তার আশ্রয়দাতা হইলেন আল্লাহতা'লা এবং এই আশ্রয় আল্লাহর রাসুল (আ) হইতে প্রাপ্তব্য। নবী (আ) তাঁহা হইতে সালামত ও নিরাপত্তা পৌছাইয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন। ইহা পৌছাইয়া দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। দুনিয়ার বিপদ হইতে আশ্রয় পাইতে চাহিলে আল্লাহ রাসুলের নিকট আত্মসমর্পণ অবশ্যই করিতে হইবে নতুবা দুনিয়ার গ্রাস হইতে কাহারও নিস্তার নাই। আল্লাহর দ্বীনের যে মূল বাণী যাহা রাসুলগণের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে তাহা শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশী জনকে শিখাইয়া উহাতে দীক্ষিত করিয়া তোলার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। দ্বীনে মোহাম্মদীর তবলীগের এই কর্তব্য পালনের আদেশ অতি গুরুতর একটি দায়িত্ব। ইহা এমন কোন সাধারণ একটি বিষয় নয় যে, রাসুলের (আ) ভাষণটি নিজ নিজ এলাকার অনুপস্থিত মানুষকে জানাইয়া দিলেই রাসুলের (আ) এই নির্দেশ পালনের কর্তব্য পালিত হইয়া যাইবে। এ আদেশ নবীর নবুয়তের মিশনকে তাঁহার জাহেরী অনুপস্থিতির অবস্থায়ও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়া রাখার নির্দেশ ব্যতীত ইহা অন্য কোন প্রকার সাধারণ নির্দেশ বা কাজ নয়। এ কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করিতে চাহিলে সর্বপ্রথম নিজেকে “উম্মতে মোহাম্মদী” রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। নতুবা ইহা কাহারও পক্ষে ঠিকভাবে পালন করা সম্ভবপর নয়। সূরা জুমার তৃতীয় আয়াতে এইরূপ একটি কথা আছে : “অয়া আখেীরীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম” অর্থাৎ “তাহাদের পরবর্তী লোকগণ যাহারা এখনও তাহাদের দলে (অর্থাৎ “উম্মতে মোহাম্মদী” এই দলে) যোগদান করে নাই।” এইরূপ আপাত অনুপস্থিত লোকদিগকেও পবিত্র করিবার জন্য, কেতাব জ্ঞান দান করিবার জন্য এবং হেকমত জ্ঞান দান করিবার জন্য আল্লাহতা'লা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন (৬৪৩)। অর্থাৎ রাসুলের এই শিক্ষা জগতের বুকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্যই তাঁহাকে পাঠান হইয়াছে। অন্তরালে থাকিয়াও তিনিই তাহা শিক্ষা দিয়া থাকিবেন। নবুয়ত ক্ষণস্থায়ী নয়। জনের আগেও তিনি নবী, অন্তরালে গিয়াও তিনি নবীই থাকিতেছেন, অন্যরূপে। এইরূপে নবীগণ হইলেন তাঁহাদের নিজ নিজ উম্মতগণের শাফায়াতকারী এবং নিরাপত্তার আশ্রয়দাতা। কিন্তু মানুষ নবুয়তকে গ্রহণ না করিলে জনসমাজে নবীর নবুয়ত ব্যর্থ হইয়া যায়।

খেলাফতের বিরুদ্ধে মাওলা আলী (আ)

অস্ত্র ধারণ করেন নাই কেন

ধর্ম জোর-জবরদস্তির বিষয় নয়। ইহা মনের ব্যাপার। আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুল ইচ্ছা করিলেই সকল লোকদিগকে ধর্মবিশ্বাসী বানাইতে পারেন না। মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করিবার পর আল্লাহ ইচ্ছা করিলেই কোন লোককে হেদায়েত দান করিতে পারেন না, যদি সে উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হয়। বিশ্বাস করিয়া নবীর নির্দেশিত পথে চলিতে চাহিলে মানুষকে হেদায়েত দান করা আল্লাহ এবং রাসুলের কাজ।

নবীদের অমান্য করা মানুষের সাধারণ স্বভাব। নবী (আ) ইচ্ছা করিলে অবশ্য পাথরের জবাব পাথরের দ্বারা দিতে পারিতেন। যেমন-বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি নানারূপে নৈসর্গিক বিপর্যয় আনিয়াও মানুষকে শান্তি দিতে পারিতেন এবং আল্লাহতা'লা যুগে যুগে তাহা দিয়াও আসিয়াছেন। উহা দ্বারা পাপীর শাস্তি হইতে পারে কিন্তু হেদায়েত হয় না।

আলী (আ) নবীর (আ) প্রকৃত অনুসারী। তাই তিনিও নবীর (আ) মতই অন্যায় অবিচার এবং ধর্ম বিরোধীতা বরদাস্ত করিয়া গেলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থে কাহারও উপর হাত উঠাইলেন না। তাঁহার গলায় দড়ি দিয়া তাঁহাকে খলিফার নিকট আনা হইয়াছিল। ইহার প্রতিবাদে তিনি ইসলামকে রক্ষা করার খাতিরেই জুলফিকার চালনা করেন নাই। জনগণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে সত্য ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকিলেন। ইহার ফলে বহু লোক পরবর্তীকালে তাঁহার আদর্শের সমর্থক হইলেন বটে কিন্তু বিরাট জনতার তুলনায় তাহাও ছিল নগণ্য। অন্যায়ের সমর্থকগণই বিপুল পরিমাণে সংখ্যাধিক রহিয়াই গেল। এইজন্য সত্য আর কখনও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জয়ী হইয়া উঠিতে পারিল না। মাওলা আততায়ীর হাতে শাহাদত বরণ করিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ কারবালায় প্রায় শেষ হইয়া গেলেন। কারবালায় সত্যের সমাধি রচিত হইল। হোসাইন (আ) কারবালায় শিক্ষামূলক যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন তাহার সঠিক মর্যাদা মুসলমানগণ কোনকালেই আর দিতে পারে নাই।

ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ

‘নস্খ’ উচ্ছেদ

(রহিতকরণ)

‘নস্খ’ অর্থ উচ্ছেদ, বাতিল, রহিতকরণ, Abrogation, cancellation, obsolete, ommission, supersession and suppression etc. অর্থাৎ কোন একটি আইন বা নিয়ম প্রচলন করার আদেশ দানের পর উহা বাতিল অথবা পরিবর্তন করা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ইসলামের ধর্মীয় সাহিত্যে ‘নস্খ’ বলে।

আয়াত

১। আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুলের পরিচয়কে ‘আয়াত’ বলে। ‘আয়াত’ শব্দটি কোরানে শতাধিকবার উল্লেখিত আছে, কিন্তু ইহাদের অর্থ একবারও কোরানের একটি বাক্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বাক্য অর্থ বুঝাইতে চাহিলে কোরানে উহাকে কালাম বলা হইত। আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থে এক একটি বাক্যকে এক একটি ‘আয়াত’ বলিয়া থাকি এইজন্য যে, এইগুলি আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের পরিচয় দানকারী বাক্য বিশেষ; কিন্তু কোরানে এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার এক জায়গায়ও করেন নাই।

কোরানে বলিতেছেন : সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহর আয়াত। অর্থাৎ সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টার পরিচয় বা নিদর্শন বা চিহ্ন। যে কোন সৃষ্টির নিজস্ব কোন সেফাত (অর্থাৎ গুণাবলী) নাই। উহার সকল সেফাত স্রষ্টা হইতে সাময়িকভাবে আগত বা প্রাপ্ত। সুতরাং, সৃষ্টির সেফাতগুলি স্রষ্টার সেফাতের পরিচয় শুধু দান করে। এইরূপে সারা সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার পরিচয়ই শুধু বিকশিত হইতেছে। সারা সৃষ্টিই আল্লাহর আয়াত। কোরানের কোন বাক্যকে “আল্লাহর আয়াত” অর্থে কোরানে কখনও বলেন নাই।

২। সৃষ্টি স্রষ্টার পরিচয় বহন করে। এই হিসাবে সৃষ্টিকে যেমন আল্লাহর আয়াত বলা হইয়াছে তেমনইভাবে নবীগণ এবং মহামানব-মানবীগণ হইলেন মানুষের জন্য সবচেয়ে উন্নতমানের এবং প্রথম শ্রেণীর ‘আয়াতাল্লাহ’। ইহার কারণ আল্লাহর পরিচয়-দাতা হিসাবে তাঁহারা হইলেন যে কোন প্রকার সৃষ্টি হইতে শ্রেষ্ঠ। “আমরা দল” ইহার সদস্যগণ হইলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত।

৩। আয়াত বলিতে আল্লাহর পরিচয়-দাতা ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বুঝাইয়া থাকে। পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেহেতু আল্লাহর পরিচয় দান করিয়া থাকে

সেইহেতু অনুষ্ঠানকেও আল্লাহর পারিচয় বা নিদর্শন বা চিহ্ন বলা যাইতে পারে। এবং সেইরূপ বলাও হইয়াছে।

৪। কোরান ও সুন্নার মধ্যে কোথাও এমন একটি উক্তিও থাকিতে পারে না যাহা দ্বারা কোরান অথবা সুন্নার কোন একটি উক্তিকেও বাতিল করা যাইতে পারে। এইরূপ করিলে আল্লাহতা’লা চঞ্চলমতি, সংশোধনবাদী, অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া প্রমাণিত হন। শুধু তাহাই নহে, কোরানে অনেকগুলি বাক্যও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, যেমন : “সুন্নাতাল্লাহে লা তাবদিল” অর্থাৎ আল্লাহর কোন কথা ও কাজের পরিবর্তন হয় না। কোন ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ একটি কথা বলিয়া সেই ধর্মগ্রন্থেই পরে উহাকে বাতিল, বদল বা অযোগ্য কথা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না। ঠিক তেমনইভাবে আল্লাহর রাসুলও জীবনের কোন একটি কথা ভুল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারেন না যাহা তাঁহার নিজের অন্য একটি কথার সঙ্গে অথবা কোরানের কোন একটি কথার সঙ্গে আত্মবিরোধী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। আত্মবিরোধী কোন কথা মহানবীর মুখ হইতে বহির্গত হইলে তিনি মহানবী বলিয়া আখ্যায়িত হইতেই পারেন না।

আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের মনোনীত তাঁহার বংশীয় বারোজন প্রতিনিধিকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আনিয়া খেলাফত এবং খেলাফতের পরবর্তী রাজতন্ত্রকে ন্যায়সঙ্গত শাসন ব্যবস্থারূপে সমর্থন দান করিবার জন্য যে সকল অন্যান্য-মিথ্যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল “নসখ ও মনসুখ” তাহাদের মধ্যে অন্যতম একটি ব্যবস্থা। রাসুলকে খাটো করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—যদিও ইহাতে আল্লাহকে, অনিচ্ছাকৃতভাবে খাটো করিতে হইয়াছে।

মধ্যযুগীয় মোসলেম সাহিত্যের সকল ধর্মীয় লেখকগণ “নসখ ও মনসুখ” কথাটির উপর যে ধর্মনীতি রচনা করিয়াছেন তাহার পরিমাণ এত বেশি যে, ইহাকে হিমালয়ের মত বিরাট একটি মিথ্যার বোঝা মোসলেম জাতির মাথায় উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না। ইহার বিস্তারিত একটি পরিচয় দিতে গেলে দুই-তিন শত পৃষ্ঠার একটি পুস্তক রচনা করিবার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। অতদূরে না যাইয়া তাহাদের রচিত হাদিস তফসীর এবং ফেকাশাস্ত্রের মধ্যে “নসখ ও মনসুখ” বিষয়ে ভূরি ভূরি যতসব আলোচনা ও সমালোচনা রহিয়াছে উহাদের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত মূলত নিম্নরূপ :

যেমন— নসখ ও মনসুখ তিন প্রকার :

১। নসখ আল হুকুম ওয়া আল তিলওয়া :

The suppression of both wording and ruling. আদেশ এবং পাঠ উভয়ই বাতিল।

২। নসখ আল হুকুম দুনা তিলওয়া :

The suppression of the ruling but not the wordings. পাঠ রহিয়াছে কিন্তু উহার আদেশ রহিত করা হইল। অর্থাৎ কোরানে উহার কথা পঠনীয় থাকিবে কিন্তু কথাটি পালনীয় থাকিবে না, তথা আমলে আনা যাইবে না।

৩। নসখ আল তিলওয়া দুনা হুকুম :

The suppression of the wording but not the ruling. পঠন থাকিবে না কিন্তু নিয়ম পালনীয় থাকিবে। অর্থাৎ কোরান হইতে কথাটি রহিত করা হইল, কিন্তু উহার আদেশ-নির্দেশ পালিত হইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা : ১। নসখ আল হুকুম ওয়া আল তিলওয়া : এই শ্রেণীর বাক্যগুলি কোরানের অংশ হিসাবে আল্লাহতা’লা রাসুলের নিকট নাজেল করিয়াছিলেন রাসুলের উম্মতের জন্য পালনীয় ও পঠনীয় আদেশরূপে। কিছুকাল পরে ঐগুলি অপ্রযোজ্য মনে করিয়া হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক আল্লাহতা’লা নিজেই বাতিল বা রহিত করিয়া দিলেন। বাণীগুলি রাসুলাল্লাহর কণ্ঠস্থ ছিল এবং তিনি লিখাইয়াও রাখিয়াছিলেন। আল্লাহ তাঁহার স্মৃতি হইতে কথাগুলি ভুলাইয়া দিলেন এবং লিখার সামগ্রী হইতে লিখিত কথাগুলি মুছিয়া দিলেন। উম্মতগণের মধ্যে যাহারা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাদের সকলের স্মৃতি হইতে এবং লিখার সামগ্রী হইতে লিখিত কথাসমূহ আল্লাহ মুছিয়া ফেলিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু রাসুলকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু মুখস্থকারী জনগণ অনেককাল পর্যন্ত তাহা একেবারে ভুলিয়া যায় নাই। ভুলিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। বর্তমান যুগে এই শ্রেণীর কথাগুলির কিছুই আমাদের আর জানিবার কথা নহে। এইগুলি বিস্মৃতির অতল তলে চিরতরে ডুবিয়া গিয়াছে।

২। নসখ আল হুকুম দুনা তিলওয়া : এই শ্রেণীর কথাগুলি শুধুমাত্র পাঠ হিসাবে কোরানে আছে কিন্তু উহাদের মধ্যে নিহিত আদেশ ও নির্দেশগুলি পালনীয় আর থাকিবে না। ইহার কারণ ইহা হইতে উত্তম অথবা ইহার

সমতুল্য ওজনের মূল্যবান ব্যবস্থা কিছুকাল পরে আল্লাহতা'লা নাজেল করিলেন, যাহার কারণে পূর্ববর্তী নাজেল করা কথাগুলি কোরানে লিখিত থাকিলেও সেইগুলি আর আমল করা চলিবে না। ইহাদের সংখ্যাও কোরানে কম নহে। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা বিষয়েও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। এইরূপ মতভেদের সীমা ১৭ হইতে ৫০০ বাক্য পর্যন্ত বিস্তৃত।

৩। নসখ আল তিলওয়া দুনা হুকুম : এই শ্রেণীর কথাগুলি কোরান হইতে আল্লাহতা'লা উঠাইয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু উহাদের মধ্যে নিহিত যে সকল আদেশ ছিল তাহা পালন করিবার হুকুম বলবৎ থাকিতেছে। এই জাতীয় কথা নাজেল হইলে পর রাসুলুল্লাহ উহা আমল করিতে থাকিলেন এবং কোরানের মুসাফ হিসাবে লিখিয়াও রাখিলেন। সাহাবীগণও কেহ কেহ মুখস্থ করিয়া লিখিয়াও রাখিয়াছিলেন। আল্লাহ উহার পাঠ মানুষের মন হইতে এবং লিখার বস্তু হইতে উহার লেখা মুছিয়া দিলেন। কিন্তু উহার আমল যাহা চলিতেছিল তাহা উঠাইলেন না। ইহার একটি উদাহরণ হইল যৌন অপরাধীকে পাথর ছুঁড়িয়া হত্যা করা।

কথিত আছে যৌন অপরাধীকে পাথর মারিয়া হত্যা করিবার বিধান আল্লাহ কোরানে নাজেল করিয়াছিলেন। ফলতঃ রাসুলুল্লাহ উহা রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে পালন করিতে থাকিলেন। কিছুকাল পর রাসুলুল্লাহর জীবদ্দশাতেই আল্লাহতা'লা উহা রাসুলের স্মৃতি হইতে ভুলাইয়া দিলেন এবং উক্ত বিষয়ের লিখিত কথা সহিফা হইতে অলৌকিকভাবে মুছিয়াও ফেলিলেন। অন্যান্য যাহারা উক্ত নির্দেশ বাক্য মুখস্থ রাখিয়াছিলেন অথবা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাও আল্লাহপাক তাহাদের মন হইতে এবং তাহাদের লিখিত ফলক হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। উভয় দিক হইতে এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিবার আইন বলবৎ রহিয়াছে। এই আইনটি রক্ষা করিয়া চলার তাগিদে উপর হজরত ওমরের যে সকল উক্তি বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এইরূপ : তিনি বলিতেছেন, “হে জনগণ, তোমরা এইরূপ দণ্ড বিধান কোরানে উল্লেখিত না দেখিতে পাইয়া এই আইনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিও না। রাসুলুল্লাহ পাথর ছুঁড়িয়াছেন, আবু বকর পাথর ছুঁড়িয়াছেন এবং আমিও পাথর ছুঁড়িবার বিধান অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ইহা কোরানে লিখিত না থাকার জন্য ভবিষ্যৎ জনগণ যেন এই কথা না বলে যে, ইহা ওমরের একটি আবিষ্কার। এককালে ইহা কোরানের

‘মুসাফ’ রূপে লিখিত ছিল যাহার তেলাওয়াত আল্লাহ রহিত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমি ইহা কোরানের শেষে (পাদটীকা হিসাবে) অথবা কোরানের কোথাও এক পাশে ইহা লিখিয়া রাখিবার পক্ষপাতী।” (জন বার্টন)

কোরানে যৌন অপরাধের জন্য চরম যে দণ্ড বিধান আজও রহিয়াছে তাহার একটি হইল একশত বেত্রাঘাত। অপরটি হইল স্ত্রীকে পানাহার হইতে বঞ্চিত করিয়া ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখা যতদিন পর্যন্ত তাহার মৃত্যু না ঘটে অথবা আল্লাহতা'লা অপরাধী স্ত্রীকে ইহার একটি সুরাহা করিয়া না দেন। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন মুসলিম দেশে যৌন অপরাধের শাস্তি দানের ব্যবস্থা বিভিন্নরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

‘নসখ’-এর উপর আমাদের সমালোচনা

(ক) কোরানে উল্লেখিত উক্ত বাক্য কয়টির রাজকীয় অপব্যখ্যা প্রকাশের কি প্রয়োজন ছিল তাহা বুঝা কাহারও পক্ষে খুব কঠিন বিষয় নহে। এইরূপ অর্থ প্রকাশের দ্বারা কোরানের পবিত্র ধর্ম-দর্শনের উপর যে অপূরণীয় আঘাত হানা হইয়াছে তাহা হইতে মোসলিম জাতি কবে যে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইতে পারিবে তাহা আজও ধারণা করা কঠিন ব্যাপার। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ রাজনৈতিক অপব্যখ্যায় শুধু নবী-চরিত্র এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বংশীয় ইমাম-চরিত্রই মিথ্যার কলুষে কলুষিত হইয়া উঠে নাই আল্লাহতা'লাকেও হয় এবং নীতিহীন প্রমাণ করা হইয়াছে। এক কথায় ধর্মের বিশ্বজনীনতার উপর কলঙ্ক লেপন করা হইয়াছে।

(খ) রাজকীয় বর্ণনা অনুযায়ী বলা হইয়া থাকে : হযরত আবু বকরের রাজত্বকালে ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজে কোরান মৃত্যুবরণ করেন। কোরানের এমন কতকগুলি বাক্য তাহাদের মুখস্থ ছিল যাহা জীবিত অন্য কাহারও কাছে আর ছিল না। এই সম্বন্ধে এইরূপও উক্ত হইয়া থাকে যে, সেইগুলি উদ্ধার করিবার জন্য হজরত ওমরের রাজত্বকাল পর্যন্তও চেষ্টা চলিতে থাকে কিন্তু ঐ বাক্যগুলির উপর ওয়াকিবহাল কোন একটি লোক আর পাওয়া যায় নাই। এই কথার প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হইল : মাওলা আলী এবং আসহাবে সুফফার সকল সাহাবী তখন জীবিত ছিলেন যাহারা হাফেজে কোরান ছিলেন। মাত্র দুই বৎসর হইল রাসুল এন্তেকাল করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কোরানের অংশ বিশেষ ভুলিয়া যাওয়া অথবা একেবারে হারাইয়া

যাওয়ার কথা তখনও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কোরানের রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা যাহা বর্তমানে চলিত আছে তাহা খলিফা হযরত ওসমান কর্তৃক প্রকাশ করা হয় ইয়ামামা যুদ্ধের প্রায় ১৮ বৎসর পরে।

রাসুলুল্লাহর লিখিত কোরান ছাড়ও হজরত আবু বকর একখানি কোরান লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যাহা তিনি পাঠ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত ওমরও ঐ কোরান পাঠ করিতেন। হজরত ওমরের মৃত্যুর পর উক্ত কোরান তাঁহার কন্যা হাফসার নিকট গচ্ছিত ছিল। হজরত ওসমানের খেলাফতকালে তাঁহার নির্দেশে তদানীন্তন গভর্নর হাফসার নিকট উহা চাহিয়াও পান নাই, পরে হাফসার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহর নিকট হইতে উক্ত কোরান ছিনাইয়া লইয়া উহা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় (খোলাসাতুল কোরান)।

মাওলা আলীর স্বহস্তে লিখিত কোরান, যাহা তিনি নাজেলের ধারা অনুসারে লিখিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার স্বাক্ষরও ছিল। উক্ত কোরান চারশত হিজরী সনে পর্যটক নাদিম উনার শাহাদাতের স্থানে (অর্থাৎ কুফায়) দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাতে এই কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মাওলা আলীর লিখিত কোরান খেলাফতের পরেও অক্ষত অবস্থায় ছিল।

মুসলমানদের বিভিন্ন দলীয় বক্তব্য এবং ইতিহাস হইতে ইহাও জানা যায় যে, খেলাফতী কোরান সংকলন করার সময় মাওলা আলী তাঁহার নিজস্ব লিখিত পরিপূর্ণ কোরান লইয়া কোরান বোর্ডের নিকট হাজির হইয়াছিলেন কিন্তু তাহা হইতে উহা গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য খেলাফত উহা গ্রহণ করিতেও পারে না, কারণ খেলাফতের এই প্রকাশনা আসলে মাওলা আলীর শাসনাধিকারের বিরুদ্ধেই সাজাইয়া লেখা হইয়াছিল। আলী (আ) ইহা জানিতেন যে, খেলাফত তাঁহার লিখিত কোরান গ্রহণ করিবে না। তথাপি প্রমাণ এবং ইতিহাস রচনা করিয়া রাখিবার জন্যই তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। এইরূপ না করিলে খেলাফতী কোরান প্রকাশনায় মাওলা আলীর নীরব সম্মতির প্রমাণ হইয়া যাইত। রাসুলুল্লাহ (আ)-এর সমগ্র জ্ঞানের দরজা মাওলা আলী ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। কোরানে মাওলা আলীর নাম একবারও উল্লেখ করা হয় নাই। মাওলা আলীর নাম কোরানে বহুবার উল্লেখিত ছিল। তাই দেখা যায় আজও উহাদের মধ্য হইতে তিন-চারটি উল্লেখ মধ্যযুগীয় লেখকগণ হইতে উল্লেখিত হইয়া আসিতেছে।

(গ) রাসুলের এন্তেকালের প্রায় ২১ বৎসর পর খেলাফত কোরানের রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা সংকলন করেন। এত বিলম্ব করিয়া প্রকাশ করার অন্যতম প্রধান একটি কারণ ছিল মাওলাইয়াতের বিরুদ্ধে এবং আলো রাসুলের বিরুদ্ধে তাহাদের এই প্রকাশনাকে সাজাইয়া লওয়া। কি বাদ দিতে হইবে এবং কেমন করিয়া সাজাইতে হইবে ইত্যাদি নানারূপ বিষয় ছিল তাহাদের চিন্তার বিষয়। ক্ষমতা এবং পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া উপযুক্তভাবে উহার প্রকাশ পরিচালনা করা-যাহাতে জনমতে কোনরূপ বিদ্রোহ প্রকাশ না পায়। এত সাবধানতা সত্ত্বেও দেখা গেল কোরান সংকলন হজরত ওসমানের পতনের সর্বপ্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এইসব তথ্য সমাজ হইতে লুকাইয়া রাখার জন্য আজও ১৪০০ বৎসর পরে হজরত ওসমানকে তাহার মিথ্যা সংকলনের জন্য দোওয়া করা হইয়া থাকে। সত্যের প্রমাণ দেওয়ার জন্য এত আশীর্বাদের দরকার হয় না, যত হইয়া থাকে মিথ্যাকে ঢাকিয়া রাখার জন্য। ‘নসুখ’ ইহার মূল রচয়িতা খেলাফত।

(ঘ) বিবাহিত পুরুষের জন্য যৌন অপরাধের শাস্তি হিসাবে ১০০ বেত্রাস্ত করিবার কথা স্পষ্টভাবে কোরানে উল্লেখ আছে। বিবাহিত স্ত্রী লোকের যৌন অপরাধের শাস্তি হিসাবে গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া মৃত্যুদণ্ড দানের বিধান কোরানে স্পষ্ট লিখা আছে। এমতাবস্থায় যেইরূপ শাস্তির উল্লেখ কোরানে নাই (অর্থাৎ পাথর মারিয়া হত্যা করা) তাহার গুরুত্ব আমল হিসাবে অধিক হইতে হইবে, ইহা একটি যুক্তিহীন অন্যায় কথা বলিয়াই আমরা মনে করি। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, পাথর মারিবার হাদিস মিথ্যা। কোরানে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও রাসুলের নির্দেশ কেমন করিয়া কোরানের নির্দেশের উপর বলবৎ থাকিতে পারে? ইহা একটি সাধারণ যুক্তির প্রশ্ন। আসলে এইরূপ হাদিস রচনা করিয়া রাসুলকে স্বেচ্ছাচারী এবং হেয়প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তাই এইরূপ হাদিসের প্রকাশের দ্বারা কোরানে উল্লেখিত স্পষ্ট দুইটি বাক্যকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়াছে বলা হইয়া থাকে, যথা-(৪:১৫), (২৪:২)। অর্থাৎ বাক্য দুইটি পঠনীয় থাকিবে কিন্তু উহার উপর আমল থাকিবে না।

A celebrated hadith from Ubada of which the basic form is: The prophet said, "Take it from me! God has now appointed a way for women: The virgin with the virgin one hundred strokes and a year's banishment; the non-virgin with the non-virgin, one hundred strokes and stoning."

(Risalat P. 20)

From John Burton.

মানব জীবনে প্রভু পরিচয়ের বহু রকমের অদল-বদল হইতে থাকে। স্মৃতি হইতে একটি পরিচয় মুছাইয়া দিলে অনুরূপ আর একটি পরিচয় সেই স্থান দখল করিয়া থাকে, অথবা উহা হইতে উত্তম পরিচয় তিনি দান করিয়া থাকেন। ইহাই তাহার সৃজিত বিধান। এইরূপে উন্নতি লাভ করিতে করিতে সাধকের জীবনে এমন একটি অবস্থা বা স্তর আল্লাহর খাস প্রতিনিধিগণ দান করিয়া থাকেন যেখানে অবস্থান লাভ করিলে মানুষ আর কোন কিছুই ভুলিয়া যায় না, কেবলমাত্র তাহার অতীত জীবনের পাপকর্মের স্মৃতিগুলি ভুলাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহার অন্তরে জাহেরে বাতেনে আর কোন অশান্তি না থাকে (দ্রষ্টব্য ৮৭ঃ৬-৭)।

ধর্ম পালন ব্যবস্থা ইত্যাদিকে সায়ায়েরালাহ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানকেও আল্লাহর নিদর্শন বলে, যথা : কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরাইবার অনুষ্ঠানকে এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠা-নামা করা ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে আল্লাহর নিদর্শন (সায়ায়ের) বলা হইয়াছে। একরূপ অনুষ্ঠান বদল করিয়া সেইস্থলে তদনুরূপ অন্য অনুষ্ঠান অথবা উহা হইতে উত্তম অন্য প্রকার অনুষ্ঠান নবীগণ প্রবর্তন করেন-যাহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ উহার উপযুক্ত বাক্য বা বাণী নাজেল করিয়া থাকেন। (১৬ঃ১০১)

উল্লেখিত যে কোনরূপ পরিচয় হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হইলেন নবী এবং রাসুলগণ। আল্লাহর পরিচয় নবী ও রাসুলগণ যতটুকু দান করিতে পারেন তাহাদের চেয়ে অধিক আর কোন পরিচয় দাতা হইতেই পারে না। এইজন্য মহামানব ও মহামানবীগণকে কোরানে আল্লাহর আয়াত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোরানে “আমাদের পরিচয়” কথাটি অনেকবার বলা হইয়াছে। “আমাদের পরিচয়” অর্থই আল্লাহর পরিচয়। আল্লাহর পরিচয় সরাসরি লাভ করা যায় না। উচ্চতম পরিষদের যে কোন একজনের পরিচয় আল্লাহর খাস পরিচয়। ইহার পরে স্থান লাভ করিল অন্যান্য নবী-রাসুলগণের পরিচয়। যে ব্যক্তি তাহার নবীকে চিনিয়াছে সে আল্লাহর পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহার পরে আসিল কামেল মহাপুরুষগণের পরিচয়। তাহারাও আল্লাহর পরিচয় দাতা মহান সৃষ্টি। ইহার পরে স্থানলাভ করিল অন্যান্য সকল সৃষ্টি যাহার মাধ্যমে আল্লাহর সেফাতেরই নীরব আনাগোনা সৃষ্টিময় চলিতেছে। এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় একটি আয়াত বদল করিয়া সম-পর্যায়ের অন্য একটি আয়াত আল্লাহ সেই স্থলে স্থাপন করিয়া থাকেন, অথবা উহা হইতে উত্তম ও উন্নতমানের অন্য একজন পরিচয়দাতা ‘আয়াত’ আল্লাহ স্থাপন করিয়া থাকেন।

মোসলেম লেখকগণ পূর্বাপর চিন্তা না করিয়া রাজশক্তিকে সমর্থন দানের উদ্দেশে এই বাক্যে উল্লেখিত ‘আয়াত’ শব্দটিকে একগুয়েমি মনোভাব লইয়া নিশ্চিতরূপে ‘কালাম’ বা ‘বাক্য’ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহারই উপর তাহাদের “নসুখ ও মনসুখ” সাহিত্যের মূলনীতিকে কোরানভিত্তিক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া বিপুল অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৮৭ : ৬-৭) : ৬। শীঘ্রই আমরা তোমাকে ঘোষণা শুনাইব অতএব আর তুমি ভুলিবে না।

৭। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জ্ঞাত আছেন ব্যক্ত এবং যাহা অব্যক্ত।

ব্যাখ্যা : এই সূরাটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহকে নহে বরং মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এই সূরাটির প্রথম হইতে ৭ নম্বর বাক্য পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা না লিখিয়া (৬-৭) ইহা ব্যাখ্যায় এতটুকু বলিয়াই বিরত হইলাম যে, ইহা আল্লাহর পথের পথিককে লক্ষ্য করিয়া ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে : “যদি তুমি (অর্থাৎ হে মানব তুমি) তোমার রবের পবিত্রতা প্রকাশ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাক তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা তোমাকে ক্বারা বা ঘোষণা অর্থাৎ এলহাম দান করিয়া ভুল হইতে উদ্ধার করিব এবং তাহার ফলে অতীত জীবনের পাপকর্মের স্মৃতিগুলি ব্যতীত কিছুই আর ভুলিয়া যাইবে না। তোমার স্মৃতিফলক আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে আমাদের দ্বারা হেফাজতপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।” মানুষের স্মৃতিফলক হেফাজতপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে ‘লৌহমাহফুজ’ বলে। কোরান সেখানে হেফাজতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। (বিঃদ্রঃ বাক্য দুইটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ‘সূরা আলা’-এর উপর লিখিত তফসীরে দ্রষ্টব্য)।

(১৬ঃ১০১) : একটি আয়াতের স্থলে বদল করিয়া আমরা যখন অন্য একটি আয়াত আনয়ন করি তখন তাহার নাজেল বিষয়ে আল্লাহ ভাল করিয়াই জানেন। লোকেরা বলে, “তুমি তো কেবল নকলকারী জালিয়াত। তাহাদের অধিকাংশই বরং অজ্ঞান।”

ব্যাখ্যা : পূর্বাপর বিচার করিলেই দেখা যায় এখানে আয়াত অর্থ ধর্মানুষ্ঠান। শুদ্ধভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন করিলে উহা আল্লাহর পরিচয় দান করিতে সক্ষম হয়। এই অর্থে অনুষ্ঠানকেও আয়াত বলা হইয়াছে। আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের সদস্যগণ কোন জাতির একটি ধর্মানুষ্ঠান বদল করিয়া

যখন অন্য আর একটি জাতিকে উহা পালনীয় বিধান হিসাবে দান করেন তখন প্রয়োজনবোধে তাঁহারা উক্ত বিধানের পরিবর্তন করিয়া উহা হইতে উন্নতমানের আর একটি বিধান দিয়া থাকেন অথবা উহার সম-পর্যায়ের অন্য প্রকার আর একটি আনুষ্ঠানিক বিধান দান করেন। ইহার কারণ, বিভিন্ন প্রকার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া একই মূল লক্ষ্যে পৌছান যাইতে পারে। যখন তাঁহারা অন্যরূপ একটি পরিবর্তিত অনুষ্ঠান-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহতা'লা উক্ত বিষয়টির উপর কিরূপ কথা নাজেল করিতে হইবে সেই বিষয় ভাল করিয়াই জানেন। অর্থাৎ নির্ভুলভাবে উহার বাক্যাদি আল্লাহ নাজেল করিয়া থাকেন। অতএব উহাতে নবীর পক্ষ হইতে মিথ্যা বা জালিয়াতির কিছুই থাকে না। সবকিছুই আল্লাহর অনুমোদনক্রমে হইয়া থাকে।

(১৬ঃ১০১) এই বাক্যটির ব্যাখ্যা আরও একটু বিস্তারিত করিয়া বলাই ভাল। ইহুদি ও খৃষ্টানগণের মধ্যে প্রচলিত যে সকল ধর্মানুষ্ঠান ছিল রাসুলাল্লাহ যখন সেই অনুষ্ঠান কিছু কিছু পরিবর্তীতরূপে প্রবর্তন করিতে লাগিলেন তখন অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে পরধর্ম নকলকারী মিথ্যাবাদী জালিয়াত বলিয়া উল্লেখ করিতে থাকে। তাহার জবাবে কোরানে বলিতেছেন : আমরা যখন আল্লাহর পরিচয়-দাতা কোন একটি অনুষ্ঠান আনয়ন করি তখন তাহার নাজেল বিষয়ে (অর্থাৎ সেই অনুষ্ঠানের নির্দেশ দানকারী বাক্য নাজেল বিষয়ে) আল্লাহতা'লা সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকেন। বিষয়টি না বুঝিয়াই অজ্ঞান লোকেরা নবীকে এক্ষেত্রে মিথ্যা উদ্ভাবনকারী মনে করে এবং অন্য জাতির অনুষ্ঠান হইতে গ্রহণকারী নকলনবিস মনে করিয়া থাকে। কোন একটি বিষয়ের অনুষ্ঠান বদল করিয়া অন্যরূপ অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা দান করা হইলেও বিষয়টির মূলনীতি অক্ষুণ্ণ এবং চিরন্তন। ইহার কারণ উভয় ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ একই।

অনুষ্ঠান বদল আসলে কোন বদলই নহে

আল্লাহর সুন্নাত একবার প্রকাশ লাভ করিবার পর কখনও আর বদলায় না। সৃষ্টির মধ্যে যে সুন্নাত কার্যকরী রহিয়াছে তাহা প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবে চলিয়াই আসিতেছে। মানুষের ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রণের

জন্য আল্লাহ যে বিধান দান করিয়া থাকেন তাহাও নবীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিলে উহার মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ হইয়াই থাকে।

নবীগণের নিকট যে সকল অহি হয় তাহা দ্বারা মানবজাতির প্রতি সৃষ্টির ষোলআনা ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয় না। নবীগণের মস্তিষ্ক হইতে অলৌকিক জ্ঞানের উন্মেষ সর্বদাই হইতে থাকে, কারণ সৃষ্টির অলৌকিক জ্ঞানের ভাববাদ তাঁহাদের মনের উপর সর্বদাই নাজেল হইতে থাকে। অর্থাৎ তাঁহাদের উপর সর্বক্ষণ অহি হইতেই থাকে। উহাই নবীর মানবীয় ভাষায় তাঁহার বিভিন্ন হালের মধ্যে মূর্ত হইয়া ওঠে। কোনটা হয় মূলনীতি কোনটা হয় আমলনীতি ইত্যাদি প্রকার বিন্যাস করিয়া নবী নিজেই উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব দান করিয়া থাকেন। তাই কোন অংশ হয় কোরান এবং কোন অংশ হইয়াছে সুন্নাহ। এইরূপ বিভক্তিও নবীর পাক জবান হইতে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

নবীর রব হইতে নবীর নিকট আগত জ্ঞান-সমুদ্রকে নবীর মস্তিষ্ক উত্তম কম্পিউটার হইতেও উত্তমরূপে বিচার করিয়া যুগোপযোগী শিক্ষা ও ভাষার মাধ্যমে স্থান, কাল ও পরিবেশের উপযোগী করিয়া তিনি সমাজ ব্যবস্থা দান করেন। এইজন্য উহা হয় নির্ভুল। ইহাতে “আল্লাহর সুন্নাহ”-এর ব্যতিক্রম ঘটে না। করণীয় পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটে মাত্র। উপস্থিত নবীর মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের ব্যতিক্রম ঘটে মাত্র, কিন্তু উহার অর্থাৎ আল্লাহর আদেশকৃত সুন্নাহের মূল ভিত্তি অটুট থাকিয়াই যায়। সত্য বলিতে কি এই কারণেই প্রত্যেক নবীর অনুষ্ঠান সংক্রান্ত অহি বাক্য (অর্থাৎ নবীদের দেওয়া সুন্নাহ) চির পরিবর্তনশীল। আল্লাহর সুন্নাহ বুঝিবার মত মস্তিষ্ক নবী, রাসুল ও ইমাম ব্যতীত আর কাহারও থাকে না। তাঁহারা দুর্জয় জ্ঞানের অধিকারী। এইজন্য তাঁহাদের দ্বারা কোন অনুষ্ঠান বদল হইলে তাহাতে “আল্লাহর সুন্নাহ” অক্ষতই থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে “আল্লাহর সুন্নাহের বদল নাই” কথাটির ব্যাপকরূপ পরিদৃষ্ট হয়। কাজেই মানব চরিত্র গঠনের নীতির পরিবর্তন ঘটান হয় না, শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের ধারা অধিকার প্রাপ্ত অতি-মানবগণ বদলাইয়া থাকেন।

(২২ঃ৫১-৫৪) :

৫১। এবং যাহারা আমাদের আয়াতের (অর্থাৎ নিদর্শনের) মধ্যে কাজ করে বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারীরূপে তাহারা জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী।

৫২। আপনার পূর্বেও আমরা এমন কোন রাসুল ও নবী পাঠাই নাই যিনি যখনই কিছু তামান্না করিয়াছেন শয়তান তাঁহার তামান্নার মধ্যেও প্রক্ষেপ না করিয়াছে (শয়তানের আপন তামান্না)। অতএব, আল্লাহ বাতিল করেন যাহা শয়তান প্রক্ষেপ (বা পেশ) করিয়া থাকে, তারপর আল্লাহ তাঁহার পরিচয় দানের হুকুম পরিচালনা করেন। এবং আল্লাহ হইলেন জ্ঞানময় বিজ্ঞানী ও বিচারক।

৫৩। যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে এবং যাহারা পাষণ্ড হৃদয়, শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয়াদি তাহাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করিয়া তুলিবার জন্য (এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে অর্থাৎ শয়তানকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে)। এবং নিশ্চয় জালেমগণ সুদূর প্রসারিত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অবস্থান করে।

৫৪। এবং এইজন্য যে, যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা আপনার রব হইতে আগত সত্য, এইরূপে লোকেরা যেন উহাতে (অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনে) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর যেন উহার জন্য বিনম্র হয়। এবং নিশ্চয় আল্লাহ হইলেন সেরাতুল মোস্তাকীমের দিকে বিশ্বাসীদের হাদি।

ব্যাখ্যা : ৫১। সৃষ্টির যত রকমের পরিচয় বা আয়াত সৃষ্টিতে আছে তাহার মধ্যে “আমরা দলের” ব্যক্তিগণ হইলেন সর্বোচ্চ মানের পরিচয়। আল্লাহর পরিচয় অন্য কোন সৃষ্টিই তাঁহাদিগ হইতে অধিক দান করিতে পারে না। তাঁহারা হইলেন আল্লাহর নফসের মোখতার। তাহাদের সত্যিকার পরিচয়কে যাহারা বিপর্যস্ত করে তাহারা আসলে জ্বলন্ত নরকানলে বাস করে। এইরূপ লোকের সংখ্যা অত্যধিক বিধায় ‘তাহারা’ শব্দটির উপর মদ রহিয়াছে। আল্লাহর প্রেরিত কোন ব্যক্তির নির্দেশিত পদ্ধতিতে জীবন যাপন না করিলেই সৃষ্টি পরিব্যাপ্ত আল্লাহর আয়াতের মধ্যে মানুষকে বিরোধী ভূমিকায় গণ্য করা হইয়া থাকে।

৫২। তামান্না অর্থ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করা। কোন নবী যখনই মানব মনে ও সমাজ জীবনে আল্লাহর মনোনীত সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিবার মত উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি প্রচলন করিবার তামান্না করেন তখনই শয়তান আসিয়া সেই ব্যবস্থার মধ্যে তাহার পছন্দমত স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা আরোপ করিবার আশা-আকাঙ্ক্ষা উহাতে প্রক্ষেপ করিয়া থাকে অর্থাৎ পেশ করিয়া

থাকে। দলের এক একজন বিশিষ্ট নেতা সাজিয়া এইরূপ করিয়া থাকে। এইভাবে সমাজ ব্যবস্থা হইতে আল্লাহর দ্বীনকে বিদায় করিয়া দিয়া মানবীয় বুদ্ধিপ্রসূত দ্বীন প্রচলন করিয়াই ফেলে। রাসুলাল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থার ব্যাপারেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কোরানে প্রকাশিত এই সত্য চিরন্তন। এইজন্য শয়তান যখন যাহা দলের মধ্যে প্রক্ষেপ বা পেশ করে আল্লাহ তাহা বাতিল বলিয়া প্রকাশ করিয়া দেন এবং আপন পরিচয় দানের উপযুক্ত হুকুম দান করেন। কিন্তু তথাপি দেখা যায় আল্লাহ প্রদত্ত এইসব সাবধানবাণী দ্বারা মানুষ কোনকালেই সাবধানতা অবলম্বন করে নাই।

শয়তান মানবরূপেই মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে। রাসুলের ইচ্ছার মধ্যে শয়তানের ইচ্ছা নিক্ষেপ করার বিষয় হইল এই বাক্যের প্রধান কথা। ইহা দ্বারা অনেকেই রাসুলের (আ) মনের মধ্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ করিবার ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে হেয় প্রমাণ করিয়া থাকেন। আমরা বলিতে চাই : যে ব্যক্তির মনে শয়তানের অনুপ্রবেশ সম্ভবপর হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি কখনও আল্লাহর রাসুল হইতে পারেন না। ইহা চির সত্য।

কথাটির প্রকৃত অর্থ হইল : রাসুলাল্লাহর প্রস্তাবিত এবং তাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার মধ্যে শয়তান অর্থাৎ ভ্রান্ত মানুষ তাহাদের ইচ্ছা নিক্ষেপ করিয়া বা উপস্থাপিত করিয়া জনমনকে রাসুলের দেওয়া মতবাদ হইতে সরাইয়া তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারিতায় এবং নবীর দেওয়া মতবাদ ও বিধান হইতে বিচ্ছিন্নতাবাদে মাতাইয়া তোলে। পৃথিবীতে এমন কোন রাসুল ও নবী আসেন নাই যাহার ঈঙ্গিত মতবাদের মধ্যে শয়তান তাঁহার আপন মতবাদ স্থাপন করিয়া উহাকে বিনষ্ট না করিয়াছে।

এই বাক্যের প্রেক্ষিতে আমাদের মূল বক্তব্য হইল নিম্নরূপ : আল্লাহ নিজ হইতে ব্যক্ত করা কোন কথা এবং নিজ হইতে দেওয়া সমাজ ব্যবস্থা অথবা রাসুলের কোন কথা ও তাঁহার দেওয়া কোন সমাজ ব্যবস্থা তিনি কখনও বাতিল করেন না এবং করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র মানব মন হইতে উত্থাপিত শয়তানের ইচ্ছাকেই বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন। এইজন্যই যত প্রকার সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে মানব মনে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটিতে পারে তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আল্লাহতা’লা কোরানে প্রকাশ করিয়াছেন, যেন মানুষ সাবধান হইতে পারে।

৫৩। ঈমান রুগ্ন-দুর্বল হৃদয়ে এবং বস্তুবাদী কঠিন হৃদয়ে সত্য প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। শয়তানের প্রক্ষিপ্ত ইচ্ছা দ্বারা এই জাতীয় লোকদিগকে পরীক্ষা করার জন্যই শয়তানকে এইরূপ সাময়িক সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই জাতীয় দুর্বলচিত্ত এবং কঠিন-হৃদয় লোকেরাই আপন নফসের প্রতি জালেম এবং তাহারা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু দূর সরিয়া গিয়াছে। সংসারে প্রায় সবাই ধর্মের নামে আসলে শয়তানের উপস্থাপিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই চলিয়াছে।

৫৪। এইরূপ পরীক্ষা সৃষ্টি করিবার কারণে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে কেবল তাঁহারা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ইহা রাসুলুল্লাহর (আ) রব হইতে আগত সত্য। ইহা রাসুলের মানবীয় অমিত্ব হইতে নহে। অতএব এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বিনম্র হৃদয়ে ঈমানের সহিত লোকেরা যেন আল্লাহর পরিচয় লাভে যত্নবান হয়। এই বাক্যে স্পষ্ট যে একটি ইঙ্গিত বহন করিতেছে তাহা হইল : আল্লাহর তরফ হইতে জ্ঞান দান না করিলে কেহই রাসুলকে চিনিতে পারে না।

উপসংহার : উমাইয়া এবং আব্বাসী রাজতন্ত্রের যুগে ইসলাম ধর্মকে বিপথগামী করিবার উদ্দেশে ইহার পাশাপাশি “রাজকীয় ইসলাম” ধর্মের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কোরানের বিশেষ বিশেষ কথার সংজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া ধর্মদর্শনে নূতন নূতন রূপ আমদানী হইতে লাগিল এবং পরিণামে দেখা গেল রাসুল বংশীয় ইমামগণের প্রচারিত ইসলামের সঙ্গে সমাজে প্রচারিত রাজকীয় ইসলামের মিল আর রহিল না। নূতন আমদানীকৃত যতসব কথা ধর্মশাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে “নসুখ ও মনসুখ” তাহাদের মধ্যে অন্যতম। “নসুখ ও মনসুখ” ইসলামের ধর্মীয় সাহিত্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। আমরা ইহাকে একবাক্যে মিথ্যা বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকি। ইসলামের ধর্মীয় সাহিত্যে যত প্রকার গোলযোগ এবং মতভেদের সূত্র ও উৎস রহিয়াছে বা রচিত হইয়াছে ইহাদের মধ্যে অন্যতম একটি মূল সূত্র ও উৎস হইল “নসুখ ও মনসুখ”।

যাহারা কোরানের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে তাহাদের সমর্থনকারী দলের লোকেরা এই কেলেঙ্কারি ঢাকিয়া রাখিবার উদ্দেশে এইরূপ বলিয়া থাকে : “মানুষের কোন ক্ষমতা নাই যে, কোরানের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে, কারণ আল্লাহ নিজেই উহা হেফাজত করিয়া থাকেন।” নিম্নে উল্লেখিত কোরানের

দুইটি বাক্য হইতেও এই প্রমাণ তাহারা দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে (১৫ঃ৯), (৮৫ঃ২১-২২)। আমরা এই বাক্য দুইটির প্রকৃত ব্যাখ্যা অল্প কথায় প্রকাশের চেষ্টা করিলাম।

(১৫ঃ৯) : নিশ্চয় আমরা সংযোগ নাজেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় উহার জন্য আমরাই হেফাজতকারীরূপে রহিয়াছি।

ব্যাখ্যা : ‘জিকির’ শব্দের অর্থ স্মরণ ও সংযোগ। ‘স্মরণ’ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পরিণতি ‘সংযোগ’ পর্যন্ত সকল অবস্থাকেই জিকির বলে। নিজ ক্ষমতায় আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ লাভ করা মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের ব্যক্তিগণই কেবল মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং এই সংযোগের হেফাজত করা তাঁহাদেরই কাজ। অর্থাৎ তাঁহারা আল্লাহর সংযোগ দান করিয়া থাকেন এবং দান করার পর উক্ত সংযোগের হেফাজতও তাঁহারা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ মানুষের হইতে পারে না। সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখা তাঁহাদেরই ক্ষমতাবিশীল।

অপরপক্ষীয় লোকেরা ‘জিকির’ শব্দটিকে ‘কোরান’ অর্থে এবং ‘নাহ্নু’ শব্দটিকে ‘আমি’ অর্থে গ্রহণ করিয়া নিম্নরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে : “নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) কোরান নাজেল করিয়াছি এবং উহার হেফাজতকারীও আমি।” এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহারা বলিতে চাহেন যে, কোন রাজশক্তির সাধ্য নাই কোরানকে ব্যতিক্রম করিয়া প্রকাশ করিবার। তাহাদের নিকট ইহাই যদি বাক্যটির অর্থ হইয়া থাকে তবে তাহারা আবার কেমন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, পূর্ববর্তী আহলে কেতাবগণ তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বদলাইয়া ফেলিয়াছে? আল্লাহ তখন সেগুলির হেফাজতকারী কেন হইলেন না? মানুষ কেমন করিয়া উহা বদল করিতে পারিল? অতএব, ভাষাগত শব্দার্থ বদলাইয়া ‘জিকির’ শব্দটিকে কোরান বলিবার অধিকার তাহারা কোথায় পাইলেন?

(৮৫ঃ২১-২২) বরং ইহা কোরান মাজিদ, লৌহের মধ্যে হেফাজতপ্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা : ‘লৌহ’ শব্দের অর্থ ‘স্মৃতিফলক’। মানব মস্তিষ্কের যে স্নায়ুতন্ত্রসমূহ মানব মনের সকল স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকে তাহাকে লৌহ বলে। স্মৃতিফলকের স্মরণশক্তি সীমাবদ্ধ। অনেক বিষয় মানুষের স্মৃতি হইতে স্বাভাবিকভাবেই মুছিয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর উচ্চতম প্রতিনিধিগণ যে ব্যক্তির

স্মৃতিফলককে হেফাজত করেন তাহার স্মৃতিফলকে সবকিছু রক্ষিত হইয়া থাকে, কিছুই আর ভুলিয়া যায় না। এইরূপ একটি স্মৃতিফলককে লৌহ মাহফুজ বলে।

রাসুল বংশের বিপক্ষীয় লোকেরা লৌহ-মাহফুজ বলিতে একটি মূল্যবান পাথরের ঘর বুঝাইয়া থাকে। এই ঘর সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত। ইহাতে সমগ্র কোরান সোনালী অক্ষরে খোদিত করিয়া লিখিয়া রাখা হইয়াছে। অতএব কোরানের কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যদি কেহ উহার ব্যতিক্রম কিছু লিখিয়াও রাখে আল্লাহ উহা মুছাইয়া ফেলিবেন। আমাদের নিকট যে কোরান আছে অর্থাৎ হজরত ওসমান কর্তৃক প্রকাশিত যে কোরান তাহা সপ্ত আকাশের উপর লৌহ-মাহফুজ খোদিত খাস কোরানের অনুরূপ। একটুও ব্যতিক্রম হইতে পারে নাই। লৌহ-মাহফুজ সম্বন্ধে তাহাদের উক্তরূপ মন্তব্য বা আবিষ্কার সত্যই হাস্যাস্পদ নহে কি? আমরা ইহাকে রাসুল বংশের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করি না।

রাসুল বংশীয় ইমামগণ এবং তাহাদের অনুসারী অন্যান্য আরও কিছু সংখ্যক লোক লৌহ-মাহফুজের অধিকারী ছিলেন। তাহাদিগের এই শ্রেষ্ঠত্ব জাতিকে ভুলাইয়া দেওয়ার জন্য রাজশক্তি কোরানের শব্দার্থের যে সকল ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে এই দুইটি বাক্যের ব্যতিক্রম তাহাদের মধ্যে অন্যতম। নবী এবং ইমামগণকে অতি-মানবরূপে প্রকাশ করিতে রাজশক্তি মোটেই রাজী নহে। ইহাই ছিল সকল অনর্থের মূল কারণ। তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে ধর্মরাজ্য পরিচালনা করিবার তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান আপত্তি।

কোরানের মৌলিক কথাকে বিকৃত করা বিষয়ে যে কয়টি নজির কোরানের টীকাকারগণ আজও বলিয়া আসিতেছেন তাহার সকল কথা আমাদের জানা নাই। তথাপি যে কয়টি আমাদের জানা আছে তাহা হইতে মাত্র কয়েকটি কথা নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা হইল।

ইমাম বাকের (আ) বলিয়াছেন, তিন শতের উপর কোরানের বাক্য ‘তাহরীফ’ অর্থাৎ ‘বদল’ করা হইয়াছে যাহা আহলে বাইতের শানে ছিল। ইহাদের মধ্য হইতে ইমাম (?) নেসাই ১৫০টা দেখাইয়া দিয়াছেন। “সিরাতুন নবী” (অর্থাৎ নবীর চারিত্রিক গুণরাজি) যে সকল বাক্যে উল্লেখিত ছিল তাহাদের মধ্য হইতে ১১৪টি বাক্য বদল করা হইয়াছে। এই শ্রেণীয় বাক্যের

অনেকগুলি ইবনে কাসির তাহার তফসীরের টীকাতে প্রকাশ করিয়াছেন। কি ছিল এবং উহার স্থলে কি আছে তাহা তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন।

ব্যতিক্রমগুলির অধিকাংশই সূক্ষ্ম এবং তাহা বুঝাইতে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে। সেইজন্য কয়েকটি মাত্র স্থল ব্যতিক্রমের বিষয় উল্লেখ করা হইল। বক্তব্য বিষয়টির সত্যতা প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

নবীর চরিত্র বদল করিয়া দেখাইলে যে কিরূপ হইয়া দাঁড়ায় তাহার একটি মাত্র নমুনা লক্ষ্য করিলেই পাঠক বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন। যথা : (৩৩ঃ১-৩)।

শানে নজুল : খন্দকের যুদ্ধ। অনেকগুলি শত্রুদল সমবেত হইয়া মদিনা আক্রমণ করিয়াছে। মদিনায় অবস্থিত কাফের-মোনাফেকগণ মদিনার পতন ঘটাইবার জন্য শত্রুদলসমূহের সঙ্গে গোপনে যোগসাজশ চালাইতেছে। এই অবস্থার মধ্যে দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীগণ ভয় পাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইমানের নির্ভর ও দৃঢ়তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সূরার প্রথম কয়টি বাক্য নাজেল হইল, যাহাতে তাহারা কাফের-মোনাফেকের ভাব অনুসরণ না করিয়া সর্বপ্রকার শত্রুভয় ত্যাগ করিয়া আল্লাহর উপর নির্ভর স্থাপন করে, কারণ ত্রাণকর্তা হিসাবে আল্লাহ তাহাই যথেষ্ট।

সূরা আহযাবের প্রথম বাক্যটি এইরূপ ছিল : ইয়া আইয়ুহান নাবী কুল এত্তাকিল্লাহা অলা তুতিইল কাফেরীনা অল মোনাফেকীনা। অর্থাৎ, হে নবী, আপনি (বিশ্বাসী জনগণকে) বলিয়া দিন আল্লাহকে ভয় করিতে এবং কাফের ও মোনাফেকগণকে অনুসরণ না করিতে।

এই বাক্য হইতে ‘কুল’ অর্থাৎ “বলিয়া দিন” কথাটি ফেলিয়া দিয়া এই সূরার প্রথম তিনটি বাক্যে উল্লেখিত হেদায়েত নবীর উপরেই হইয়াছিল বলিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে নবীর চরিত্র অত্যন্ত হীন এবং সাধারণ মানব চরিত্রে পরিণত হইয়া যাইতেছে। এইরূপে বহু জায়গায় নবীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মধ্যে কত যে কলঙ্কের রেখাপাত কোরানে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা চিন্তাশীল পাঠক সহজেই অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন যদিও প্রতিকার করিতে অক্ষম।

হাদিস গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে আরও পরে, পরিপূর্ণ রাজতন্ত্রের যুগে। সেইজন্য রাসুল চরিত্রের উপর কলঙ্ক রচনার পরিমাণ সেখানে আরো অধিক

হইতে পারিয়াছে। এক একটি সত্যকে ঢাকিবার জন্য সত্য হাদিসের পাশাপাশি বহু মিথ্যা হাদিস রচনা করিয়া রাসুলের সুন্নাহকে একেবারে কলুষিত ও ঝাপসা করিয়া রাখিয়াছে। মিথ্যা হাদিসসমূহ সত্য হাদিস বলিয়া এমনভাবে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে যে, ইহার শোধন ক্রিয়ার বিষয় নূতন করিয়া ঘোষণা করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। মিথ্যা হাদিসগুলিকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিতে গেলে যে পরিমাণ বিরোধীতা আলেম সমাজ হইতে সৃষ্টি হইবে তাহা মোটেই সাধারণ বিষয় হইবে না। বিরোধীদলে দেশের শতকরা নিরানব্বই জন আলেম থাকিলে কোন কথা বুঝাইয়া বলাও সম্ভব নহে।

(৩ঃ৫) সূরা আলে ইমরানের পাঁচ নম্বর বাক্যটি হইল : ইন্নালাহা লা ইয়াখফা আলাইহে শাইউন ফিল আরদে অলা ফিস সামায়ে। ইহা নিম্নরূপে ছিল বলিয়া উল্লেখিত আছে : “ ইন্নালাহা নফসা ইল্লা উসয়াহা লা ইয়াখফা আলাইহে শাইউন ফিল আরদে অলা ফিস সামায়ে। ” বাক্যটি হইতে নফসা ইল্লা উসয়াহা কথাটি বাদ দিয়া বাক্যটি রাখা হইয়াছে।

(৩ঃ১৪৪) মোহাম্মদ একজন রাসুল ব্যতীত নহেন। নিশ্চয় তাঁহার পূর্বে অনেক রাসুল গত হইয়া গিয়াছেন। যদি তিনি মরিয়া যান অথবা কতল হইয়া যান তোমরা কি পশ্চাদপদ হইয়া ফিরিয়া যাইবে? এবং যে ব্যক্তি পশ্চাদপদ হয় তাহা দ্বারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি হয় না। কিন্তু শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার দিয়া থাকেন।

এই বাক্যটি কোরানের বাক্য নহে বলিয়া প্রাচীন তফসীরকারগণের লিখিত তফসীর হইতে আজও কোন কোন তফসীরকার মতব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। রাসুল্লাহর এন্তেকালের সময় আবু বকর এবং ওমর উপস্থিত ছিলেন না। রাসুলের মনোনীত আলীকে (আ) ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তাহাদের মনমত ‘খেলাফত’ প্রতিষ্ঠার প্রচারকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এন্তেকালের পর তাহাদিগের নিকট খবর পাঠান হইল। প্রথমে আসিলেন ওমর। তিনি পাগলের মত হইয়া তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে লাগিলেন : “যে বলিবে মোহাম্মদ মারা গিয়াছেন তাহাকে আমি কতল করিয়া ফেলিব। আমি এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, মোহাম্মদ মরিতে পারেন।” এমন সময় আসিলেন আবু বকর। তিনি মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়া মসজিদের আঙ্গিনায় আসিয়া ওমর এবং উপস্থিত জনগণকে লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিক যে ছোট ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা হইতেই কোরানের এই বাক্যটির উদয় হইয়াছিল।

ইহার উপর মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল সাহেব লিখিতেছেন :

On the morning when the Prophet died, Abu Bakar came into the Mosque of Al-Madina and found the people all distracted, and Omar telling them that it was a sin to say that he was dead. Abu Bakar went and ascertained the truth and coming back into the Mosque, cried; "Lo! as for him who worshipped Mohammed, Mohammed is dead, but as for him who worshipped Allah, Allah is alive and death not." Then he recited this verse "and it was as if people had not known till then that such a Verse had been revealed."

অনুবাদ : রাসুল্লাহর এন্তেকালের প্রভাতে আবু বকর মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইলেন এবং লোক সকলকে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং ওমর বলিতেছিলেন যে, রাসুলকে মৃত বলা পাপ। আবু বকর ভিতরে যাইয়া মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া মসজিদে ফিরিয়া আসিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন : “যাহারা মোহাম্মদের পূজা করিতে তাহারা জানিয়া রাখ মোহাম্মদ মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যাহারা আল্লাহর পূজা করিতে তাহারা জানিয়া রাখ, আল্লাহ চিরঞ্জীব কখনও মরেন না।” তারপর তিনি উক্ত বাক্য পাঠ করিলেন। বিষয়টি এমন হইয়াছিল যে, ইহার পূর্ব পর্যন্ত লোকদের জানাই ছিল না যে, এমন একটি বাক্য নাজেল হইয়াছিল।

এই ঘটনার উপর রডওয়েল সাহেব লিখিতেছেন : This Verse and (39:31) were recited at Mohammed's death by Abu Bakar, in order to convince Omar and other Muslims of the possibility of that event. It has been supposed that these passages were invented by Abu Bakar on this occasion, and inserted into the Quran. But it is more than doubtful.

বঙ্গানুবাদ : এই বাক্য এবং (৩৯ঃ৩১) বাক্য মৃত্যু ঘটনাটির উপর বিশ্বাস আনাইবার জন্য ওমর এবং অন্যান্য মুসলমানগণকে লক্ষ্য করিয়া আবু বকর মোহাম্মদের মৃত্যু উপলক্ষে উল্লেখ করেন। ইহা মনে করা হইয়া থাকে যে, এই বাক্য দুইটি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আবু বকর নিজেই উদ্ভাবন করিয়াছেন

এবং কোরানের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সন্দেহজনক অপেক্ষা অধিক।

(২৮ঃ৫৬) : নিশ্চয় আপনি হেদায়েত করিতে পারিবেন না যাহাকে আপনি ভালবাসেন; কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েত করিয়া থাকেন এবং তিনিই জানেন কাহারো হেদায়েতপ্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ হাদীরূপে আসিয়াছেন। কে হেদায়েতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং কে হয় নাই তাহা তিনি জানেন। কে হেদায়েতে গ্রহণ করিবে এবং কে করিবে না তাহাও তিনি বেশ জানেন। তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি, সুতরাং তিনি যাহাকে হেদায়েত করিতে পারিবেন না, আল্লাহও তাহাকে হেদায়েত করিতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া যিনি রাসূলুল্লাহর ভালবাসার পাত্র তিনি অবশ্যই হেদায়েত গ্রহণকারী ব্যক্তি হইবেন; নতুবা ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর ভালবাসার পাত্র হইতে পারেন না।

(২৮ঃ৮৫) : নিশ্চয় যিনি কোরানকে আপনার দিকে (অহি হওয়া) নির্ধারিত করিয়াছেন। তিনি অবশ্য আপনাকে ফিরাইয়া আনিবেন প্রত্যাবর্তন স্থলে। বলিয়া দিন, “আমার রবই ভাল জানেন কে হেদায়েত লইয়া আসিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।”

ব্যাখ্যা : এই বাক্যটিতে কোন ভুল নাই যদিও ব্যাখ্যায় প্রায় সবাই ভুল করিয়া থাকেন। তাহাজ্জী বুঝাইতে চাহেন : কে পথে আছে এবং কে বিপথে আছে তাহা শুধু আল্লাহই জানেন, রাসূলুল্লাহ জানেন না। আসলে বিষয়টি সেইরূপ নহে। যাহা রাসূলের রব জানেন, তাহা রাসূলুল্লাহ নিজেও জানেন।

(২৮ঃ৮৬) আপনি আশঙ্কিত করেন নাই যে, আপনার দিকে কেতাব দেওয়া হইবে। ইহা তো কেবল আপনার রবের অনুগ্রহ। সুতরাং কাফেরদিগকে কোনরূপ সমর্থন দান করিবেন না (অথবা কাফেরদিগের জন্য পৃষ্ঠপোষক হইবেন না)।

ব্যাখ্যা : ‘কেতাব’ কথা দ্বারা কোরান, ইঞ্জিল, তৌরাত ইত্যাদি কোন ধর্মগ্রন্থ বুঝায় না। ইহা সৃষ্টির রহস্যের মৌলিক জ্ঞান। ধর্মগ্রন্থগুলি কেতাবের পরিচয়দাতা বাক্যাবলী। এইজন্য কোরানে দেখিতে পাওয়া যায় তিন দিনের শিশু ঈসা (আ) বলিতেছেন, “আমি কেতাবপ্রাপ্ত।” রাসূলুল্লাহ (আ) শুধু জন্ম হইতে নহে, জন্মের পূর্ব হইতেই কেতাবপ্রাপ্ত। কোরান তাঁহার দিকে অহি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ৪০ বৎসর বয়সে। এই বাক্য এই কথাই বুঝাইতে

চাহেন যে, কোরানের বাণী নাজেল হওয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কেতাবপ্রাপ্তির মহান অনুগ্রহের কথা ধারণায়ও আনিতে পারেন নাই। যেহেতু কেতাবপ্রাপ্তির মত মহান অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন সেইহেতু কাফেরগণের ভ্রান্ত মতবাদের কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন তিনি যেন না করেন।

মন্তব্য : এই বাক্যটির প্রথম অংশ তথ্যগত ভুল এবং দ্বিতীয় অংশ কোন নবীর প্রতিই প্রযোজ্য নহে। মহানবীর প্রতি এইরূপ কিছু হইতে পারে ধারণা করাই পাপ। অতএব, এই বাক্যটি কোরানের কথা হইতে পারে না। মানুষের রচনা কোরানের মধ্যে একাত্ম হইয়া মিশিয়া থাকিতে যে পারে না এই বাক্যটি তাহারই একটি প্রমাণ।

(২৮ঃ৮৭) : যখন তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়া যায় তখন আল্লাহর পরিচয় হইতে তাহার যেন তোমাকে বাধা দিতে না পারে। এবং তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান কর। এবং মোশরেকদিগের অন্তর্গত হইও না।

ব্যাখ্যা : দুঃখের বিষয়, এই বাক্য রাসূলকে লক্ষ্য করিয়া নাজেল হইয়াছে বলা হইয়া থাকে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে বাক্যটি কোরানের কথা হইতে পারে না। রাসূলকে মোশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার উপদেশ দেওয়া অর্থই তাঁহার নবুয়ত অস্বীকার করা। এবং তাঁহাকে অপমান ও তাচ্ছিল্য করিয়া সাধারণ মানুষরূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা। পাপী ব্যক্তি কখনও নবীরূপে মানুষের কাছে পাঠান হয় না।

যদি ইহা একবচনে মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে তবে এই বাক্যটি নির্ভুল এবং সত্য। ‘রুহ’ নাজেল হওয়ার ঘটনা হইতে আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্তির আরম্ভ ঘটে (দ্রষ্টব্য সূরা কদর)। মানুষের নিকট যখন ‘রুহ’ তথা “আল্লাহর পরিচয়” নাজেল হয় তখন তাহার জন্য ইহা একটি সাবধানবাণী বা উপদেশ। ‘রুহ’ নাজেল করিয়া কোন বিশ্বাসীকে শক্তিশালী করার পর সে যেন কোনরূপ বাধায় দমিয়া না যায় বরং আল্লাহর পরিচয় লাভের পথে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম শেরেক এমনভাবে ত্যাগ করিবার জন্য দৃঢ় হইতে বলিতেছেন যেন সেই মানুষের মন মোশরেকগণের দলভুক্ত আর না থাকে। ইহা দ্বারা আল্লাহর পরিচয় নাজেল হইয়া যাওয়ার পর সেই পর্যায়ে মোমিনগণের উপর সত্য প্রচার করা ওয়াজেব বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এইরূপে মানুষকে আল্লাহর পরিচয়

দানের পথে এবং রবের দিকে জনগণকে আহ্বান করার পথে লোকেরা যেন বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে সেদিকে দৃঢ় হইতে তাহাদিগকে বলিতেছেন।

(২৮ঃ৮৮) এবং আল্লাহর সহিত অন্য কোন কিছুকে ইলাহরূপে ডাকিও না—তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাঁহার চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। হুকুমত মাত্রই তাঁহার জন্য।

অর্থাৎ : হে মানুষ, সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহরূপে ডাকিও এবং তাঁহারই উপরে নির্ভর করিও, তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন কিছুকেই এই বিষয়ে জড়াইও না। তাঁহার চেহারা পরিণত হইতে চেষ্টা কর তবেই ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবে এবং অক্ষয় জীবন লাভ করিতে পারিবে। ইহাও রাসুলকে বলা হয় নাই। এই নির্দেশ তাঁহার উম্মতের জন্য।

(৪৫ঃ১৮-১৯) এই দুইটি বাক্যের প্রথমটিতে ‘জায়ালনাকা’ এবং দ্বিতীয়টিতে ‘আনকা’ কথা রহিয়াছে। আসলে প্রথমটি হইবে ‘জায়ালনাকুম’ এবং দ্বিতীয়টি হইবে ‘আনকুম’।

কেন এইরূপ হইবে ?

(১৬ হইতে ১৯ নম্বর বাক্য দ্রষ্টব্য) এই চারটি বাক্যের কথা হইল নিম্নরূপ :

(১৬) “বনি ইসরাইলদিগকে আমরা কেতাব, হেকমত এবং নবুয়ত দান করিয়াছি; তাহাদিগকে পবিত্র রেজেক দিয়াছি (অর্থাৎ স্থায়ী রেজেক দিয়াছি) এবং তাহাদিগকে সারা সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

(১৭) এবং তাহাদিগকে ধর্মরাজ্য পরিচালনা করার সুস্পষ্ট বিধান দান করিয়াছি। অতএব জ্ঞান লাভ করিবার পরেই তাহারা মতভেদে বিভক্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় আপনার রব কেয়ামতের সময় উহাদিগের মধ্যকার মতভেদের বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দিবেন।

(১৮) তারপর আমরা তোমাদিগকে (আপনাকে নয়) লাগাইয়া দিয়াছি একটি শরীয়তের উপর (অর্থাৎ বিধানের উপর)। ধর্মরাজ্যের পালনীয় আইন-কানুন হইতেই দেওয়া হইয়াছে এই শরীয়ত। সুতরাং ইহার অনুসরণ কর, যাহারা অজ্ঞান তাহাদিগের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না।

(১৯) নিশ্চয় তাহারা (অর্থাৎ অজ্ঞানীরা) আল্লাহ হইতে কিছুমাত্র সম্পদ বা লাভ তোমাদিগকে (আপনাকে নয়) দান করিতে পারিবে না। নিশ্চয়

জালেমগণ একে অপরের বন্ধু হইয়া থাকে, কিন্তু মোত্তাকীর্ণগণের বন্ধু হইলেন আল্লাহ।”

ব্যাখ্যা ও মন্তব্য : বনি ইসরাইলগণ আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত অনুসরণ করিয়া কেতাব, হেকমত ও নবুয়তের অধিকারী হইয়া সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারিয়াছে। ধর্মজ্ঞান বহু শাখায় বিভক্ত। ধর্মাক্ত লোকেরা সত্য ধর্মের মধ্যে মতভেদ আনয়ন করে না। জ্ঞানীরাই এইরূপ করিয়া থাকে। মতভেদে ইহুদিদের মধ্যে আসিয়াছে জ্ঞান লাভ করিবার পর। তাহাদের এইরূপ মতভেদের ফয়সালা মৃত্যুকালে আল্লাহ তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন বা উহার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

ইহুদিদের পর তোমাদিগকে অর্থাৎ কোরায়েশদিগকে আল্লাহর বিধিবদ্ধ পথে লাগাইয়া দিয়াছি। তাহারা যদি ইহা পালন করে তাহা হইলে তাহারাও কেতাব এবং হেকমত লাভ করিয়া মহান হইতে পারিবে। তাহারা যদি অজ্ঞান লোকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করিয়া আমাদের দেওয়া শরীয়তকে গ্রহণ করে তবে তাহারাও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারিবে।

এই হেদায়েত যদি রাসুলকে করা হয়, যেইরূপ এখানে করা হইয়াছে তাহা হইলে ইহা মিথ্যা কথা হইয়া দাঁড়ায়। রাসুলাল্লাহ মূখ্য লোকের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে যাইবেন বা করিবেন—ইহা তো ঘোর অন্যায় উক্তি।

সুতরাং, এখানকার এইরূপ স্পষ্ট ব্যতিক্রম প্রকাশটি বুঝিতে মোটেই কঠিন কথা নহে। সুতরাং, এই দুইটি বাক্যে ‘তোমাকে’ না হইয়া ‘তোমাদিগকে’ হইবে। ইহার কারণ রাসুলাল্লাহ মোটেই কোনরূপ হেদায়েতের মুখাপেক্ষী নহেন। সরদার নবী তো দূরের কথা, অন্য কোন নবীকেও এইরূপ বলা যাইতে পারে না। ইহা অধর্ম।

(৬৬ঃ১) : হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা আপনি কেন হারাম করিয়াছেন? আপনার স্ত্রীগণের সম্ভ্রুতি সন্ধান করিতেছেন? এবং আল্লাহ হইলেন ক্ষমাশীল রহিম।

এই বাক্য নাজেল হওয়ার শানে নজুল দুই প্রকার ঘটনার উপর ব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন ঘটনা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, অথবা উভয়টা মিথ্যা তাহা আমাদের বক্তব্য নহে। আমরা বলিতে চাই : রাসুলাল্লাহ কখনও স্ত্রীগণকে সম্ভ্রুত করার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে আল্লাহর ঘোষিত কোন হালাল বস্তুকে কোন অবস্থাতেই নিজের জন্য হারাম করিয়া লইতে

পারেন না। এবং সেই কারণে আল্লাহর তরফ হইতে নবী চরিত্রের জন্য সংশোধনী বাক্য প্রকাশ্য কোরানে এইভাবে উক্ত হইতে পারে না। অতএব, বাক্যটি কিরূপে উক্ত হইয়াছিল অথবা বিষয়টি কি ছিল তাহা আমরা জানি না।

(৮ঃ২৫) : এবং ফেৎনাকে ভয় কর যাহা পতিত হইবে না খাস করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা জালেম তাহাদের উপর। এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ শক্ত পরিণতি (দাতা)।

ইহা নিম্নরূপ লিখিত ছিল : এবং ফেৎনাকে ভয় কর যাহা অবশ্য পতিত হইবে খাস করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা জালেম তাহাদের উপর। এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ শক্ত পরিণতি (দাতা)।

বলেছেন আলী (আ), ইমাম বাকের (আ), হজরত যায়েদ বিন সাবেত, রাবি বিন আনাস, আবুল আলীয়া এবং আরও অনেকে।

মন্তব্য : এখানে বাক্যটি ছিল হ্যাঁ-বাচক, ইহাকে (কোরান বোর্ড কর্তৃক) করা হইয়াছে না-বাচক। ইহাতে ভাবধারা কিছুটা বদলাইয়া গিয়াছে। কথাটি ছিল (লাতুছিবাননা) অবশ্য পতিত হইবে। ইহাকে করা হইয়াছে (লা-তুছিবান্না) পতিত হইবে না।

অবাস্তিত আপদ অথবা গোলযোগ সৃষ্টি করার নাম ফেৎনা। ফেৎনাকে ভয় করিতে আদেশ করিতেছেন, কারণ ফেৎনা সৃষ্টি করা সামাজিক অপরাধ। সমাজে যাহাতে ফেৎনা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। অবাস্তিত গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপ সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলে উহার কুফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। ফেৎনা আমদানিকারী জালেমগণই ফেৎনার দুর্ভোগ অধিক ভুগিয়া থাকে। শব্দটিকে নিষেধ বাচক করিবার ফলে ফেৎনার আমদানিকারী জালেমগণের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বাদ পড়িয়া যায়। ইহাতে সকলকেই সমপর্যায় গণ্য করা হইয়াছে। ফেৎনা সৃষ্টিকারীদের প্রতি ইহা একটি সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। জালেমগণ যে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে-সেই ভাবটির উচ্ছেদ করা হইয়াছে। ইহাতে সবাইকে সমপর্যায় ফেলা হইয়াছে।

(৩৩ঃ২১) : নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে সৌন্দর্যের আদর্শ, (ইহা) সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও পরকালে আশা রাখে এবং আশা রাখে আল্লাহর অধিক জিকিরের (অর্থাৎ সংযোগের)।

ব্যাখ্যা : রাসুলুল্লাহ হইলেন আমাদের সবার জন্য সর্ব সৌন্দর্যের আদর্শ ব্যক্তি। পরকালের কল্যাণ এবং আল্লাহর সঙ্গে সংযোগের আশা যাহারা রাখিবেন রাসুলুল্লাহ হইলেন তাহাদের জন্য সৌন্দর্য অনুশীলনের পরম আদর্শ। মনকে সুন্দর করিয়াই পরম সুন্দরের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এইরূপ উপযুক্ত সুন্দর হইয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবার উত্তম আদর্শস্থানীয় এবং অনুকরণীয় ব্যক্তি হইলেন রাসুলুল্লাহ (আ)।

(৬০ঃ৪,৬) এই দুইটি বাক্যে যেইরূপ কথা আছে তাহা কোরান হইতে বাক্য :

৪নং বাক্যে আছে : নিশ্চয় তোমাদিগের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার পারাদিগের মধ্যে রহিয়াছে সৌন্দর্যের আদর্শ.....ইত্যাদি।

৬নং বাক্যে আছে : নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাহাদের মধ্যে (ইব্রাহীমের তর মধ্যে) রহিয়াছে সৌন্দর্যের আদর্শ, সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও পরকালে আশা রাখে। এবং যে মুখ ফিরাইয়া লয় সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ তাবান এবং প্রশংসনীয়।

ব্যাখ্যা ও মন্তব্য : উপরোক্ত ৪ ও ৬নং বাক্য অনুসারে দেখা যায় : শুধু রাসুলুল্লাহই তাহার উম্মতের জন্য সৌন্দর্যের একমাত্র আদর্শ নহেন, বরং প্রাক-ইসলাম যুগের ইব্রাহীম নবীও তাহাদের জন্য সৌন্দর্যের আদর্শ। মহানবী উম্মত থাকিতে তাহারই উম্মতগণের জন্য প্রাচীনকালের অনুপস্থিত এবং তাঁহা হইতে নিম্নমানের একজন নবী কেমন করিয়া সৌন্দর্যের আদর্শ হইতে পারেন তাহা আমাদের বুঝে আসে না। বর্তমান যুগে আমরা না হয় উভয় নবী হইতে সময়ের ব্যাপারে দূরে পড়িয়া আছি, কিন্তু যাহাদের সম্মুখে মহানবী অনুপস্থিত ছিলেন তাহাদের জন্যও অনুপস্থিত একজন নবী, এবং যিনি তাঁহা হইতেও নিম্নমানের নবী, তিনি কেমন করিয়া তাহাদের জন্য আদর্শ স্থানীয় হইতে পারেন? অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় আদর্শ নিকটে উপস্থিত থাকিতে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আদর্শরূপে কেন গ্রহণ করিতে হইবে? এটি গ্রহণ করিলে উম্মতে মোহাম্মদী না হইয়া উম্মতে ইব্রাহীম হইয়া যায় কিনা?

রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধতার এখানেই শেষ করা হয় নাই। অন্যান্য নবী হইতে তাহাকে খাট করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই, বরং তাহার মর্যাদা কমাইয়া তাহার জন্য ইব্রাহীম নবীর উম্মতগণকেও মহানবীর উম্মতের জন্য

আদর্শস্থানীয়রূপে অংকিত করা হইয়াছে। ইহা সত্যই হাস্যাস্পদ। আমরা এই দুইটি বাক্য কোরানের বাক্য বলিয়া মনে করি না।

কোরানের এইসব উক্তিগুলিকে ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্তী উমাইয়া এবং আব্বাসী রাজাগণ যত সব তফসীর এবং ফেকাশাত্ত তৈয়ার করিয়া দিয়াছে তাহা দ্বারা মুসলিম প্রজাবৃন্দকে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী না বানাইয়া ব্যাপকভাবে তাহাদিগকে আদর্শহীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। মোহাম্মদের পরিচয় ও নির্দেশ লুপ্ত করিয়া দিয়া অন্যান্য নবীকে শিক্ষা এবং অলীক কাহিনীর উপর তাহারা এক প্রকার রাজকীয় “পরাদীন ইসলাম” তাহাদের ইচ্ছামত দাঁড় করাইয়াছে। বর্তমানে আমরা সেই রাজকীয় ইসলামেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছি। মোহাম্মদী ইসলাম হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইব্রাহীম নবীর সঙ্গী সাথীগণ, এমন কি ইব্রাহীম (আ) নিজেও যদি তৎকালীন আরব জাতিসমূহের জন্য সৌন্দর্যের আদর্শ হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে নূতন করিয়া অন্য কোন নবীর আগমনের প্রয়োজন থাকিত না। রাসুল এবং তাঁহার প্রতিনিধিস্থানীয় মহান বংশধরগণের বিরুদ্ধে খেলাফতের রচিত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা ব্যতীত এইগুলি অন্য আর কিছুই ছিল না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আমরা ধর্ম হারাইয়া ফেলিয়াছি।

(৪ঃ২৪) : এবং (তোমাদের জন্য বিবাহ করা হারাম) সধবা নারীকে—যদি না তাহারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকে। তোমাদের উপর ইহা আল্লাহর বিধানরূপে দেওয়া হইল। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত, যৌন কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী না হইয়া, তোমাদের মালের বিনিময়ে সধবা নারীকেও সৎভাবে ভোগ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করা হইল। সুতরাং তাহাদিগকে সন্তোগ করিবার নির্ধারিত মোহর অর্পণ কর। যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর রাজী হইয়াছ উহা করিলে কোন অপরাধ হইবে না—মোহর স্থির করিবার পর। নিশ্চয় আল্লাহ হইলেন জ্ঞানময় বিজ্ঞানী।

বাক্যটি হইতে যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল “ইলা আজালিম মুসাম্মা।” অর্থাৎ “একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।” বাতিলকৃত অংশটি ছিল, ‘মোহসেনীনা’ শব্দটির পর। তাহাছাড়া এই বাক্যটির মধ্যে ‘ফামাসতাম্’ তা’তুম্ কথাটিও একটি পরিবর্তিত কথা।

রেফারেন্স : “ওসমানী মসহব (কোরান) ব্যতীত অন্যান্য মসহবে লিখিত ছিল : মুহসেনীনের পর পর “ইলা আজালিম মুসাম্মা।”

ইবনে আব্বাসের সম্মুখে উক্ত বাক্য পাঠ করা হইলে তিনি “ইলা আজালিম মুসাম্মা” সহ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ইহাতে আবি নাদারা বলিলেন : আমরা আপনার মত পাঠ করি না। প্রত্যুত্তরে ইবনে আব্বাস বলিলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহতা’লা “ইলা আজালিম মুসাম্মা” সহ নাজেল ফরমাইয়াছেন।

হজরত আলী (আ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন : “যদি হজরত ওমর মোতা প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করিতেন তবে কেয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামী ছাড়া আর কেহই জেনা করিত না।”

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা রাসুলুল্লাহর (আ) জীবনকাল এবং আবুবকর সিদ্দিকের খেলাফতকাল এবং হজরত ওমরের খেলাফতের পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মোতা করিতাম। হজরত ওমর নিজের খেলাফতের ষষ্ঠ বৎসরে মোতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন যে ঐতিহাসিক ভাষণ দ্বারা, তাহা হইল : “দুই মোতা রাসুলুল্লাহর (আ) জামানায় হালাল ছিল—হজের মোতা এবং অভিযানের মোতা। আমি দুইটাকেই হারাম ঘোষণা করিতেছি। এবং এই দুইটার জন্য শাস্তি প্রদান করিব।”

দ্রষ্টব্য :

- ১। তফসীরে দুরে মনসুর ২য় খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা
- ২। তফসীরে কাশ্শাফ ১ম খণ্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা
- ৩। তফসীরে কবির ৩য় খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা

(মিশরীয় প্রকাশনা)

আমাদের মন্তব্য : বাক্যটির প্রকাশভঙ্গিতে যৌন লালসা ত্যাগ করা এবং মনের শুদ্ধতা রক্ষা করার বিশেষ তাগিদ রহিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, সাময়িক বিবাহের প্রয়োজনের খাতিরেই এত শুদ্ধতার উল্লেখ করিতে হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির জন্য চুক্তিবদ্ধ সাময়িক বিবাহের ব্যবস্থা রাখিলে তাহা হইতে হইবে শুদ্ধ এবং যৌন আবিগতা বর্জিত। ইহাতে সমাজে বেশ্যাবৃত্তির উদয় হইতে পারে না এবং মনের যৌন কদাচার সমাজ হইতে লোপ পায়। আল্লাহর দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর বাণীর মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপ হইলে উহার গরমিল স্বভাবতই ফুটিয়া উঠে। এইরূপ গরমিলের বহু প্রমাণ

বর্তমান কোরানে রহিয়াছে। মানুষ কখনও কোরানের ভাষার সঙ্গে নিজের ভাষা সুষ্ঠুভাবে মিলাইয়া দিতে পারে না।

বর্তমানে কোরানে যেভাবে বাক্যটি ব্যক্ত আছে তাহার সঙ্গে “একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য” কথাটি যোগ দিলে অবশ্যই মোতা বিবাহের অস্তিত্বের বিষয় সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাহাতেও ভাষার ধারা অনুসারে দেখা যায় বিবাহিত স্ত্রীকেও অন্যলোকে মোতা অর্থাৎ সাময়িকভাবে বিবাহ করিতে পারে। ইহা আমাদের নিকট কেমন যেন মনে হয়।

বর্তমানে বাক্যটি যেভাবে রহিয়াছে তাহাতে বিবাহিত স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তি স্থায়ীভাবে বিবাহ করিবার অনুমতির কথা প্রকাশ পাইতেছে, যাহার ফলে নারীর জন্য একাধিক স্বামী গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই কারণে বাক্যটি আমাদের নিকট অস্পষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। রাসুলুল্লাহর প্রবর্তিত মোতা বিবাহ যে কতখানি কল্যাণকর ছিল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতীত কেহই সঠিক অনুমান করিতে পারিবে না।

(৪৩ঃ৬১) : ওয়া ইন্নাহু লা এলমুন লিস্‌সায়াত ফালা তাম্তারুন্না বেহা অত্তাবেউনী। হাজা সিরাতুম মোস্তাকীম।

অনুবাদ : এবং নিশ্চয় তিনি (ঈসা) হইলেন সায়াতের জন্য জ্ঞান, সুতরাং তোমরা ইহাতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সেরাতুম মোস্তাকীম।

ইবনে মাগাজেনী ফকিয়ে শাফেয়ী মনাক্কেবের মধ্যে জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী হইতে সনদসহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত ৬১ নম্বর বাক্য আসলে এইভাবে নাজেল হইয়াছিল :

অইন্না আলীয়ান লে এলমু লিস সায়াতা ফালা তাম্তারুন্না বেহা অত্তাবেউনী। হাজা সিরাতুম মোস্তাকীম।

অনুবাদ : এবং নিশ্চয় আলী হইলেন সায়াতের জ্ঞানের জন্য, সুতরাং তোমরা ইহাতে (অর্থাৎ সায়াতে) সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সিরাতুম মোস্তাকীম।

‘আলী’ নামের স্থলে ‘হু’ অর্থাৎ ‘সে’ লেখা হইয়াছে যাহার তফসীরে ঈসা নবীর দিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। ‘লে এলমুন’ অর্থাৎ ‘জ্ঞানের জন্য’ এর স্থলে লেখা হইয়াছে ‘লা এলমুন’ অর্থাৎ ‘অবশ্যই জ্ঞান’।

যাহা ছিল তাহার ব্যাখ্যা :

‘সায়াত’ অর্থ জীবনের অকৃতকার্য পরিণতি বা ধ্বংসাত্মক মৃত্যু। যে মৃত্যু দ্বারা জান্নাতে উত্তোরণ না হইয়া জাহান্নামে যাইতে হয় তাহাকে সায়াত বলে। অধিকাংশ মানুষের কর্মফলে সায়াত হইয়া থাকে। সায়াতের জ্ঞান লাভ করিতে চাহিলে তাহার জন্য আদি শিক্ষাগুরু হইলেন মাওলা আলী (আ)। তাঁহার বাস্তব জীবনাদর্শ অনুসরণের দ্বারা সায়াত এড়াইয়া বা ডিঙ্গাইয়া জান্নাতে উত্তোরণ সম্ভবপর হইয়া থাকে। কোরানে তাঁহাকে জান্নাতের ‘তুয়া বৃক্ষ’ বলা হইয়াছে। এই বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণকারীগণই সত্যিকার উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। আলী হইলেন ‘আল্লাহর আলি’ অর্থাৎ বন্ধু। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে তিনিই কেবল এই খেতাবপ্রাপ্ত। আল্লাহর বন্ধুত্বের ধারা তাঁহা হইতেই উৎসারিত হইয়া তাঁহার আশ্রিত জনকেও তিনিই দান করিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রয় লাভ ব্যতীত সায়াতের জ্ঞান লাভ করাও সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি কাজ ও চিন্তার মধ্যে জয় ও পরাজয় উভয় নিহিত আছে। কোন পথে কেমন করিয়া কি করিলে বিজয় আসিবে অর্থাৎ পরাজয় এড়াইয়া যাওয়া যাইবে তাহার মূল গুরু মাওলা আলী (আ)।

মহানবীর আদেশ-নিষেধ পালন করা বিষয়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে। তিনি যেমন আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলকে চিনিয়াছেন আর কেহই তেমন পারেন নাই। অন্যেরা যে যতটুকু পারিয়াছে তাহা শুধু তাঁহারই মত জীবনাদর্শ গ্রহণের ফলশ্রুতি মাত্র। এইজন্য রাসুলুল্লাহ (আ) বহুবার বহু ভাষণে বলিয়াছেন, “আলীকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, হে আল্লাহ তুমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর, এবং যে তাহার সঙ্গে শত্রুতা করে তুমিও তাহাকে শত্রুরূপে গ্রহণ কর।” এই জাতীয় বহু কথা আলী সম্বন্ধে রাসুলুল্লাহ বলিয়াছেন। মাওলার নাম এবং তাঁহার প্রশংসার প্রায় সব কথাই কোরান হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাসুলুল্লাহ (আ) বলিয়াছেন, “আলী যে দিকে মোড় নেয় আল্লাহর দীনও সেদিকেই মোড় নেয়।” মোট কথা আলীই (আ) রাসুলের হাকিকাতের চূড়ান্ত প্রকাশ।

জীবজগতে এবং খাস করিয়া মনুষ্য ও জিন জগতে ‘সায়াত’-এর মধ্যে দিয়া অসীম এক ‘সৃষ্টি লীলা’ চলিতেছে। ইহার সামগ্রিক জ্ঞানের মূলাধার যে

ব্যক্তিতে রহিয়াছে তিনি হইলেন মাওলা আলী (আ)। অন্য কথায় আল্লাহর এবং নূরে-মোহাম্মদীর সেফাতের যে প্রকাশলীলা সৃষ্টির মধ্যে আবর্তিত হইতেছে সে জ্ঞান সর্বাধিকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ‘আসাদুল্লাহ’ অর্থাৎ ‘শেরে খোদা’ মাওলা আলী (আ)।

(৪৮ঃ১-৩) ‘সূরা ফাতাহ’ এর প্রথম তিনটি বাক্য রাসুলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে স্বীকার করিলে নবীকে গুনাহগার বলিয়া মানিয়া লইতেই হইবে। ইহা সকল ধর্মের মানদণ্ডে সম্পূর্ণ ধর্ম বিরোধী কথা। অবশ্য বস্তুবাদী অহাবী মতবাদ যাহা মোটেই ইসলাম ধর্ম নহে তাহা ইহার ব্যতিক্রম। এই মতবাদ বর্তমান ইসলাম ধর্মকে ব্যাপকভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

কথাগুলি কোরানের অতীব সুন্দর শিক্ষামূলক বাক্য। কথাগুলি নবীর নিকট আত্মসমর্পণকারী সকল বিশ্বাসী মানুষকে একবচনে সম্বোধন করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহা না হইলে এই বাক্যগুলি কোরানের বাক্যই হইতে পারে না।

মানুষ যখন ঈমানের বলে বলীয়ান হইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় ও নির্ভীক চিত্তে আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের (আ) নিকট জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে তখনই কেবল মানুষ স্পষ্ট বিজয় “ফাৎহাম মোবিন”-এর অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের প্রায় সকল তফসীরকারগণ এই বাক্যগুলিকে রাসুল্লাহ উপর আরোপ করিয়া থাকেন এবং তাহাকেই ফাৎহাম মোবিনের অধিকারী বলিয়া এখানে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ইহাতে ইচ্ছাকৃত হউক বা অনিচ্ছাকৃত হউক নবীকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাপী নবী বলিয়া মানিয়া লইতেই হয়।

সূরা কলম ৪ (৬৮ঃ৪-১৬) এই সূরাটি সূরা আহ্যাবের মত ব্যাপকভাবে বিকৃত করা একটি সূরা। ইহার ৪ হইতে ১৬নং বাক্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হইল ৪ মানব চরিত্রের ১০টি দোষের কথা এখানে উল্লেখিত আছে। এত সব অপরাধ যে চরিত্রের মধ্যে থাকে তাহাকেও রাসুল্লাহ তাঁহার দলে ভিড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারেন, কারণ তিনি পাপীর আত্মগুন্ডি করাইতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ধনবল ও জনবলের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে দলে আনিতে চাহিবেন ইহা মিথ্যা কথা। তাহাছাড়া, এই জাতীয় এতগুলি দোষ যেসব চরিত্রে থাকে তাহাদিগকে রাসুল মোটেই চিনিতে পারেন নাই যাহার কারণে রাসুলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে যেন তিনি

তাহাদের অনুসরণ না করেন অথবা তাহাদের প্রভাবের ফাঁদে না পড়েন। এমন কলুষিত চরিত্রের ব্যক্তি রাসুলের দলে যে আসিবে না তাহাও রাসুলের অজানা বিষয় থাকিবে-এই কথাও অবিশ্বাস্য। তিনি এহেন দুঃচরিত্র লোকের অনুসরণ করিবেন এই কথা কেমন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ব্যক্ত হইতে পারে তাহা আমরা চিন্তাও করিতে পারি না।

সাধারণ একজন রাজনৈতিক নেতাকেও তাহার পার্শ্ববর্তী দুঃচরিত্রের লোক সম্বন্ধে এইভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া যায় না; কারণ তিনিও মানবচরিত্র সম্বন্ধে মোটামুটি কিছুটা অবগত থাকেন। এইরূপ না হইলে নেতা হওয়া যায় না। অপরপক্ষে সর্বদ্রষ্টা মহানবী রাসুল্লাহকে এইরূপ দুঃচরিত্র লোকের অনুসরণ করা হইতে নিষেধ করা সত্যই কি অপমানজনক কথা নহে। আসলে তাঁহাকে অজ্ঞান, অন্ধ, বেকুফরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার জন্য কোরান বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে ইহা জনমনে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। হইয়াছেও তাহাই। আমরা এই অংশকে কোরান বলিয়া মনে করি না। এইগুলি কোথাকার কথা বিক্ষিপ্ত করিয়া কোথায় লইয়া আসিয়াছে তাহাও জানি না। দুঃচরিত্র লোক তো দূরের কথা কোন সৎচরিত্র মানুষকেও রাসুল অনুসরণ করিতে পারেন না।

সূরা দোহা ৪ (ওসমানী ক্রমিক নং ৯৩)

সূরা দোহার কথাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নবী চরিত্রের উপর প্রযোজ্য নহে। মহানবীকে আল্লাহর সংযোগ হইতে সাময়িকভাবে আল্লাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন কোন একটি কারণে-এই কথা অবাস্তব ও মিথ্যা। ৭ নং বাক্যে দেখা যায় নবী নিজেই পথহারা বা বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং, তাঁহাকে হেদায়েত দেওয়া হইয়াছিল ইত্যাদি কথাগুলি নবী সম্বন্ধে একেবারেই মিথ্যা। নবী চরিত্রকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কলঙ্কিত করিয়া অংকন করার ব্যবস্থা ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। সূরাটির বাক্যগুলিকে কতখানি কিরূপ বদল করিয়া দিয়াছে তাহা এতকাল পরে আমাদের আর জানিবার কথা নহে।

উবাই, আবু মুশা আশারী, আবু ওয়াক্কিদ এবং ইবনে আব্বাসের উক্তি হইতে জানা যায় যে সূরা ইউসুফে এইরূপ বাক্য ছিল ৪

"We sent down wealth for the upkeep of prayer and Ulms giving. Were ibn Adam to possess a wadi he would desire another like it, which, if he had, he would desire yet another. Nothing will fill the maw of ibn Adam but dust, but God relents to him who repents."

From "Collection of the Quran"
by John Burton,

From Ibid, Itqan Burhanuddin Al Bajis
Jawab, Mesdar Al Kutub's Majami.

বঙ্গানুবাদ : সালাত দাঁড় করিবার জন্য এবং জাবজত দেওয়ার জন্য আমরা ধনসম্পদ নাজেল করিয়াছি। আদম সন্তান একটি উপত্যকার অধিকারী হইলে সে উহার মত আর একটি চাহিবে। মাটি দ্বারা মুখ গহবর না ভরা পর্যন্ত অন্য কোন কিছুতেই আদম সন্তানের পেট ভরিবে না। আল্লাহ অনুতাপকারীর প্রতি কোমলতা প্রকাশ করেন।

আইবিদ, এংকান "বুরহান উদ্দিন আল বাজি"
এর জওয়াব, "মেস্দার আল কুতুব" এর মাজামী। ইত্যাদি পুস্তক হইতে
"জন বার্টন"-এর লিখিত
"কোরান সংগ্রহ" নামক পুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠা।

Abu Musa said, "We used to recite Surat al Ahzab likening it for length and severity with Bara. But I have been caused to forget it, except that I recall the ibn adam verse."

From the collection of the Quran,
by John Burton,

From Abdullah Al Alusi-
Ruhul maani, Vol. 1, page 315 (Cairo).

বঙ্গানুবাদ : আবু মুসা বলিয়াছেন : দৈর্ঘ্য এবং দৃঢ় তাগিদে সূরা আহযাবকে আমরা সূরা "বারায়া"-এর মত সমান করিয়া পাঠ করিতাম। কিন্তু আমাদের ইহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল "ইবনে আদম" বাক্যটি ব্যতীত, যাহা আমি পুনরায় স্মরণ করিতে পারিয়াছি।

জন বার্টনের "কোরান সংগ্রহ" নামক পুস্তক হইতে
আবদুল্লাহ আল আলুসির রুহুল মানী,
১ম খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা (কায়রো)।

Anas was unable to say whether ibn Adam was a Quran verse or not. He reports from Ubayy, "We supposed that ibn Adam was a Quran verse until surat al Takathur was revealed."

This report reduces ibn Adam from even having been a Quran verse, to being merely a Tafsir of Takathur.

(Bukhari K. Al Tafsir) J. Burton.

বঙ্গানুবাদ : "ইবনে আদম" বাক্যটি কোরানের বাক্য কি-না তাহা আনাস বলিতে পারিতেন না। উবাই হইতে তিনি বলিয়াছেন, "আমরা মনে করিতাম যে সূরা তাকাসুর নাজেল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'ইবনে আদম' বাক্যটি কোরানের বাক্য ছিল।"

এই রিপোর্ট দ্বারা ইবনে আদম বাক্য কখনও কোরানের বাক্য হিসাবে যে ছিল না তাহা প্রমাণ করিয়া ইহাকে কেবলমাত্র সূরা তাকাসুরের তফসীরে পরিণত করিতেছে।

(বোখারীর তফসীর বিষয়ক হাদিস হইতে জন বার্টন)

আমাদের বক্তব্য হইল : কোরানের বাক্যাংশের তফসীর উল্লেখ করিয়া বোখারী যত হাদিস প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রায় সবগুলি মিথ্যা রচনা। এমতাবস্থায় খৃষ্টান লেখকগণ যত যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যই ঐ সকল মিথ্যা দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া করুন না কেন তাহাও মিথ্যায় পরিণত হইতে বাধ্য। আমরা খৃষ্টান লেখকদের যুক্তিপূর্ণ কিছু পড়িলেই বিরক্ত হইয়া যাই, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখি না যে, তাহাদের যুক্তিমূলক সকল কথার মূল ভিত্তি আমাদের মুসলিম লেখকদের প্রতিষ্ঠিত কথার উপরেই স্থাপিত।

Ahzab was identified as the Sura originally containing the stoning verse, and, in addition to Ubayy and Abu Musa, Aisa report that Ahzab used to be recited in the life time of the Prophet, as having 200 verses, but when Othman wrote out the mushafs, all they could find was its present length.

(Itqan part 2, page 25)

From John Burton.

বঙ্গানুবাদ : পাথর মারিবার বাক্য প্রথমত আহজাব সূরায় ছিল বলিয়া শনাক্ত করা হইয়া থাকে। আবু মুসা এবং উবাই ব্যতীত আয়েশাও

বলিয়াছেনঃ দুইশত বাক্যবিশিষ্ট আহযাব রাসুলের জীবদ্দশায় পড়া হইত, কিন্তু ওসমানের মুসাফ লিখিবার কালে তাহারা বর্তমানে ইহা যতটুকু দীর্ঘ আছে তাহার বেশী আর খুঁজিয়া পান নাই।

(ইতকান দ্বিতীয় ভাগ, ২৫ পৃষ্ঠা)

জন বার্টন হইতে উদ্ধৃত।

A Variant of this hadith speaks of writing out mushafs with, however, no mention of date or of attribution, ibn al anbari concluded from Aisa's report that God withdrew from the Sura everything in excess of its present length, and Mekki reminds us that withdrawal is one of the modes of naskh.

(John Burton, p. 84)

from Baji F, 10.

বঙ্গানুবাদ : মুসাফ (অর্থাৎ কোরান) লেখা বিষয়ে তারিখ ও হাওলার উল্লেখ ছাড়াই এই হাদিসটির ভিন্নরূপ আর একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়েশার বর্ণনা হইতে ইবনে আল আশ্বরী এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, আল্লাহতা'লাই ইহার বর্তমান দৈর্ঘ্যের অতিরিক্ত যাহা ছিল তাহা এই সূরা হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ‘নসখ’ এর ধারার মধ্যে উঠাইয়া নেওয়া যে, অন্যতম একটি ধারা, এই কথাও মাক্কী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন।

(জন বার্টন, ৮৪ পৃষ্ঠা)

বাজী, ফলিও নং ১০ হইতে।

কোরানের মনসুখ সমূহকে মাক্কী ছয় প্রকারে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত দীর্ঘ এই বিবরণ জানিবার প্রয়োজন আমাদের নাই।

Aisa explains how the wording came to be omitted from the Mushaf. The stoning verse and another verse were revealed and recorded on a sheet (sahifa) which was placed for safe-keeping under her bedding. When the Prophet fell ill and the household were preoccupied with nursing him a domestic animal got in from the yard and gobbled up the sheet.

(John Burton, P. 86)

from Baji F. 15.

বঙ্গানুবাদ : মুসাফ হইতে কেমন করিয়া পাথর মারিবার বাক্য বাদ পড়িল আয়েশা তাহার বর্ণনা দিতেছেন : পাথর মারিবার বাক্য এবং অন্য আর একটি বাক্য নাজেল হইয়াছিল এবং তাহা একটি সহিফায় লিখিয়া সহিফাটি নিরাপদে রাখিবার জন্য তাঁহার বিছানার নীচে রাখা হইয়াছিল। রাসুলুল্লাহ যখন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং গৃহবাসীগণ তাঁহার শুশ্রূষার কাজে ব্যস্ত, একটি গৃহপালিত পশু আদিনা হইতে ঘরে ঢুকিয়া উক্ত সহিফাটি গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

(জন বার্টন, পৃষ্ঠা ৮৬)

বাজী, ফলিও ১৫ হইতে।

সৈয়দ মোহাম্মদ আসকারী জাফরী কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হযরত আলী (আ)-এর লিখিত “নাহজুল বালাগা” নামক পুস্তক হইতে একটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল :

KHUTBA-23

Remarks of hazrat (Hazrat Ali) on differences of opinions amongst the jurists and Quazis on one and the same question of Muslim Law.

The condition of these jurists and Quazis, who pretend to be well versed in the tenets of Muslim law is such that, if a decision is obtained from one of them on any proposition and if the very same proposition is submitted to another, this second jury will pass a judgement quite contrary to the first one. And if all such dissenting and disagreeing decisions are placed before the person who is their chief he will approve every one of them.

How could these diversions and differences of opinions arise? They believe in the same God, follow the same Prophet and accept the same Holy Book.

Has the Lord ordered for such wild differences and diversions and they are obeying His commands? Or has He prohibited them to play with Divine tenets and they are disobeying Him? Has His

revelations, to the holy Prophet (A.S) been incomplete and He wanted their help to complete them? Are they His copartners and have the right to say what they like and He has approved this arrangement? Or the God has revealed the divine Law in full but the Holy Prophet (A.S) has not done his duty in imparting and communicating them to world and these people are filling up the gaps?

Praise and Glorification be to God: His commands were revealed in full and were fully conveyed by the Holy prophet (A.S). He has affirmed and declared this in several places in His Holy Quran. At one instance He says, "We have not left anything in the Quran" and again "There is explanation of everything in the Quran."

At another place it is emphatically declared that "Various portions of this book confirm and verify each other and there is no discord and variance in them"; and then there is quite clear specification to the effect that "Had these revelations any other source than that of God you would have found considerable discord and disunity in their various parts."

Remember! that to a casual observer Quran appears to be a book very easy to understand and interesting but inner meaning of its passages are far extending, profound and hard to understand. For deep thinkers its fascinations will never cease and its wonders will never end.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-২৩

ইসলামী আইনের একই প্রশ্নের উপর আইন প্রণেতা এবং কাজীগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়ে হজরত আলীর (আ) মন্তব্য :

ইসলামী আইনের নীতির উপর এইসব আইন প্রণেতা ও কাজীগণ (বিচারকগণ) নিজদিগকে খুব অভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া দাবি করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের এমনই অবস্থা যে, কোন একটি প্রস্তাবিত বিষয়ের উপর তাহাদিগকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সেই একই সিদ্ধান্ত যদি অন্য আর একজনের নিকট পেশ করা হয় তখন এই দ্বিতীয় আইন প্রণেতা প্রথম ব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি অভিমত (বা রায়) দান করিয়া থাকে। এবং যদি এইরূপ বিপরীত এবং বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তসমূহ তাহাদের নেতার নিকট পেশ করা হয় তখন সে উহাদের প্রত্যেকটি অনুমোদন করিয়া লয়।

মতের এইরূপ ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি কেমন করিয়া উদয় হইতে পারে? তাহারা তো একই আল্লাহতে বিশ্বাসী, একই নবীর অনুসারী এবং একই ধর্মগ্রন্থ গ্রহণকারী।

এইরূপ প্রচণ্ড (বা দুর্দান্ত) মতভেদ এবং ব্যতিক্রম ব্যবস্থার আদেশ কি প্রভু দান করিয়াছেন? এবং এইরূপে তাহারা আল্লাহর আদেশই মানিয়া চলিতেছে? অথবা তিনি কি স্বর্গীয় নীতি লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন? রাসুলের নিকট তাঁহার অবতীর্ণ বাণী কি অসম্পূর্ণ ছিল? এবং তিনি উহা পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন? তাহারা কি তাঁহার অংশীদার? যাহার ফলে যাহা খুশী বলিবার অধিকার পাইয়াছে? এবং তিনি এইরূপ ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া লইতেছেন? অথবা আল্লাহ তাঁহার স্বর্গীয় বিধান পরিপূর্ণভাবেই অবতীর্ণ করিয়াছেন কিন্তু মহানবী উহা জগতকে জানাইয়া দেওয়ার এবং স্থাপন করিবার কর্তব্য পালন করেন নাই—যাহার ফলে এই ফাঁকা (বা অসম্পূর্ণতা) ইহারা পূরণ করিয়া লইতেছে?

সমস্ত প্রশংসা এবং গৌরব আল্লাহর। তাঁহার আদেশ পূর্ণভাবেই নাজেল হইয়াছিল এবং মহানবীর দ্বারা পরিপূর্ণভাবেই পরিবেশিত হইয়াছিল। ইহা কয়েক স্থানে তিনি তাঁহার পাক কোরানে প্রতিষ্ঠিত কথারূপে ঘোষণা করিয়াছেন : একটি উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন “আমরা কোন কিছুই

কোরানে বাদ দেই নাই।” এবং আবার বলিয়াছেন, “প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখাই কোরানে রহিয়াছে।”

অন্য আর এক জায়গায় তিনি ইহা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন, “এই পুস্তকের বিভিন্ন অংশের একটি অন্যটিকে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যায়িত করে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোথাও সুরের অমিল এবং অসঙ্গতি নাই।” তারপরেও তাহাতে সুস্পষ্ট বিশদ বিবরণ রহিয়াছে এই মর্মে যে, “এই নাজেলকৃত কথাসমূহের উৎস আল্লাহ ছাড়া অন্য আরও কোন উৎস থাকিলে তুমি তাহাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুরের অমিল এবং অনৈক্য অনেক খুঁজিয়া পাইতে।”

মনে রাখিও! আকস্মিক পর্যবেক্ষকের নিকট কোরান বুঝিবার পক্ষে অতি সহজ এবং চিত্তাকর্ষক একটি পুস্তক বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ইহার অংশগুলির অভ্যন্তরীণ অর্থ সুদূরপ্রসারী, গভীর এবং বুঝিয়া লওয়া কঠিন। গভীর চিন্তাশীলদের জন্য ইহার মনোমুগ্ধকর গুণের শেষ নাই এবং ইহার বিস্ময় অফুরন্ত।

শেষ মন্তব্য : কোরান জনসাধারণের জন্য সোজাসুজি দেওয়া হয় নাই। ইহা রাসুলদের জন্য (অর্থাৎ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল রাসুলদের জন্য) নির্দেশক বাণী যাহা সকল উম্মতের পরিচালনার জন্য মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর নিজের মধ্য হইতেই আল্লাহর অহিরূপে আলোড়িত বা উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে। কোরানের সূক্ষ্ম জ্ঞানের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় নিঃপ্রয়োজন। জনসাধারণ অনুসরণ করিবে রাসুলুল্লাহকে (আ) এবং তাঁহার মনোনীত নেতাগণকে। এই নেতাগণ হইলেন তাঁহার দুই নাতি এবং তাঁহাদের পিতা ও মাতা। তিনজন নেতা, একজন নেত্রী। ইহাদের মধ্যে হইতে তিনি আলীকে (আ) তাঁহার পরবর্তী প্রথম নেতা হিসাবে অভিষিক্ত করিয়া গেলেন জনগণের মাওলা হিসাবে। এইরূপে আলী হইলেন রাসুলুল্লাহর প্রথম অসি এবং খলিফা। ইমাম হাসান এবং হোসাইন তাঁহার পরবর্তী। হজরত হোসাইনের (আ) পরবর্তী ইমামগণ রাসুলুল্লাহ দ্বারাই মনোনীত, কিন্তু প্রত্যক্ষ নহে, তাঁহার এন্তেকালের পর-পরোক্ষ। জনগণ তাঁহার প্রত্যক্ষ মনোনয়ন অমান্য করিয়াছে। এইজন্য তাঁহার এন্তেকালের পরবর্তী পরোক্ষ মনোনয়নের কথা ভাবিয়া দেখিতেও রাজি নহে। এইজন্য ইমাম জয়নাল আবেদীন হইতে আরম্ভ করিয়া ইমাম মোহাম্মদ মেহেদী (আ) পর্যন্ত সকল ইমামগণ তাহাদের

দ্বারা অস্বীকৃত। অনিচ্ছাকৃত হইলেও পাঞ্জাতনের সদস্য ব্যক্তি হিসাবে ইমাম হাসান এবং হোসাইনকে (আ) ইমাম হিসাবে মৌখিক স্বীকৃতি দিয়া থাকে।

কোরানের অর্থ প্রকাশ করিবার অধিকার, রাসুল এবং তাহার মনোনীত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও নাই। তাঁহারা ব্যতীত অন্য লোকে কোরানের দর্শন প্রকাশ করিলেই ভুল হইবে। রাসুল বংশীয় ১২ জন ইমাম হইলেন রাসুলের প্রতিনিধি এবং মানুষের মাওলা। যাহারা রাসুলুল্লাহ অথবা কোন একজন ইমাম হইতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, কোরানের অর্থ প্রকাশের অধিকার সত্যিকারভাবে কেবল তাহাদিগের জন্যই রক্ষিত রাখা উচিত ছিল। এই শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যার বিস্তার অবশ্যই দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ইমামগণের দ্বারা প্রকাশিত মূল ভিত্তির উপর তাহাদের ব্যাখ্যার বিস্তারকে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য থাকিতে হইবে। ভিত্তি বদলাইয়া ব্যাখ্যা করিলে ভুল হইবে।

আফসোস, আমরা রাসুলের অথবা তাঁহার মনোনীত আলীর এবং তাঁহার বংশধরগণের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। শাসকবর্গের নির্দেশানুযায়ী আমরা সুন্নিগণ, পরবর্তী ইমামগণের প্রকাশিত ব্যাখ্যার বিরোধীতা করিয়াছি। তাঁহাদের দুষমন রাজশক্তি দ্বারা প্রণীত তফসীর যাহা আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, উহারই অনুসরণ করিয়া আজও চলিতেছি। ইহার ফলে মিথ্যা এমনইভাবে শিকড় গাড়িয়াছে যে, সত্য উদ্ধার করা এখন একেবারেই কঠিন হইয়া রহিয়াছে। আলেম সমাজ প্রায় সবাই মিথ্যাকেই সত্য মনে করিয়া কোরানের আলেম সাজিয়া আছেন।

ধর্মদ্রোহী আব্বাসী রাজাগণ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন বলিয়াই তাহারা মোহাম্মদেস নিয়োগ করিয়া তাহাদের দ্বারা মিথ্যা হাদিস, রাসুলের নামে রচনা করাইয়া কোরানের বিশেষ বিশেষ অংশগুলির ব্যাখ্যা, রাজাদের মনমত ধারায় বানাইয়া লইয়াছেন এবং সেই ধারার উপর কোরানের তফসীর সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

রাসুলের (আ) পর হযরত আলীর (আ) অবস্থা

গাদিরে খুমে পর আলী (আ)

গাদিরে খুমে মোমিনগণের মাওলারূপে আলীর (আ) অভিষেক ক্রিয়া মহা আনন্দ এবং উৎসাহের মধ্য দিয়ে রাসুলুল্লাহ যদিও উদ্যাপন করিলেন কিন্তু একদল লোক কিছুতেই উহা অন্তর হইতে মানিয়া লইতে পারে নাই। মোনাফেকগণ এই দলের সঙ্গে যোগদান করিয়া ইহাদের দলীয় শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং গোপনে গোপনে প্রচারণা চালাইতে থাকে যাহাতে আলীর (আ) মাওলাইয়াত প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে। রাসুলুল্লাহর পরে আলীর (আ) নেতৃত্ব তাহারা কিছুতেই মানিয়া লইতে রাজি ছিল না। এইজন্য মোনাফেকগণ মদিনা পৌছাইবার পূর্বেই উপত্যকার একটি অপ্রশস্ত স্থান অতিক্রম করিবার সময় রাসুলুল্লাহকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাসুলুল্লাহ উপত্যকার ঐ স্থান অতিক্রম করিবার সময় উপযুক্ত সাবধানতা গ্রহণের বিষয় পূর্বেই ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহার জন্য মোনাফেকদের প্রচেষ্টা কার্যকর হইতে পারে নাই।

আলী (আ) “খেলাফতের সমর্থনে নীরবে ২২টি বৎসর কাটাওয়া দিয়াছেন” ইহা প্রমাণের জন্য খলিফাদের সমর্থক জীবনী লেখকগণ যথাসম্ভব আলীকে (আ) খেলাফতের কার্যাবলীর সমর্থকরূপে উল্লেখ করিতে প্রয়াস পায়। আসলে তিনি খলিফাগণের কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু ধর্মের কারণে উহার সমর্থক হইতে পারিতেছিলেন না। ইসলামের নীতি হইতে ক্রমশ সরিয়া যাইতে থাকায় খেলাফতের শাসন পদ্ধতিকে কোন নীতিবান মুসলমানই সমর্থন দিতে পারে নাই। আলীর (আ) পক্ষে এইরূপ করা আরও কঠিন, কারণ রাসুলুল্লাহর পরে তিনি হইলেন ধর্ম বিধানকে ঠিক পথে চালনা করিবার জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

রাসুলুল্লাহ (আ) সর্বদ্রষ্টা। তিনি সবই জানেন। তিনি সংসার হইতে বিদায় গ্রহণকালে তাঁহার শিষ্যগণের বিদ্রোহী মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। তাই তিনি কাগজ-কলম লইয়া আসিতে বলিলেন, বিশেষ একটি

নির্দেশের কথা পুনরুক্তি করিয়া উহা অনুসরণের তাগিদ দিয়া যাইবার জন্য যাহাতে তাঁহার উম্মত আর কখনও বিভ্রান্তির পথে না যায়। শেষ নির্দেশ দানের মধ্যে প্রধান লিখিতব্য বিষয় ছিল আলীর মাওলাইয়াতকে মানিয়া চলিবার নির্দেশ। মাওলাইয়াত মানিয়া লইবার গুরুত্ব এবং উহা মানিয়া লইবার বিশেষ দুই একটি প্রয়োজনীয় তাগিদ দান করাই ছিল রাসুলের শেষ কথা “হাদিসে কেরতাস” এর লিখিতব্য বিষয়। বিরোধীগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াই উহা লিখার পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিল বল প্রয়োগের দ্বারা। পূর্বেই তাহারা শক্তভাবে দল পাকইয়া আসিয়াছিল। দেখা গেল উপস্থিত শিষ্যদের অধিকাংশই নবীর মতের বিরুদ্ধবাদী। অর্থাৎ আলীর মাওলাইয়াত মানিয়া চলিবার পক্ষপাতী নহে। তাহারা ক্ষমতার লোভে বিদ্রোহী হইয়া গেল। অধিকাংশ উম্মতের ধর্মদ্রোহী ভাবটি কুফরীর রূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই, বরং উহা ছিল মোনাফেকীরূপে। জনগণ কুফরীর স্বরূপ সহজেই বুঝিতে পারে এবং তাহার প্রতিকারও করিতে পারিত। কিন্তু বিষয়টি প্রতারণামূলক মোনাফেকী রূপ গ্রহণ করিয়া চলিতেছিল।

রাসুলের এন্তেকাল : অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে নবী এন্তেকাল করিতেছেন। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সত্যের যে বিজয়-মুকুট উম্মতের মাথায় পরাইয়া দিয়া তিনি ইহধাম ত্যাগ করিবেন তাহাকে ভুলুপ্তি দেখিতে পাইয়া তিনি যারপর নাই দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অন্তিম শয্যায় তাঁহারই উম্মতগণ তাঁহার মুখের উপর তাঁহার নির্দেশ অমান্য করিল। সত্যের বিজয়তরী বিশাল বিক্ষুব্ধ সাগর অতিকষ্টে পাড়ি দিয়া সবেমাত্র কূলে ভিড়িবার অবস্থায় আসিয়াছে তখনই আরম্ভ হইল অন্তর-বিপ্লব এবং উহার ভরাডুবি। উম্মত তাঁহার মুখের উপর তাঁহার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করিল।

বিরোধীদল অন্তর-বিপ্লব শুরু করিয়া দিল, যাহাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নবীর নিয়োজিত প্রতিনিধি মাওলা আলীর হস্তগত না হয়। বিরোধী দল সমস্ত মদিনায় ভিতরে ভিতরে দল পাকইয়া ফেলিল আলীর বিরুদ্ধে। এমনই পরিস্থিতির মধ্যে নবী এন্তেকাল করিলেন। এন্তেকালের সময় বিরোধী দলের নেতা ওমর নবীর পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না। আবু বকর এবং ওসমানও তথায় ছিলেন না। তাহারা দল সংগঠন করার ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাসুলুল্লাহর মৃত্যু সংবাদ তাহাদের দুইজনের নিকট পৌছান হইলে প্রথমত ওমর আসিয়া হাজির হইলেন এবং তরবারী উন্মুক্ত

করিয়া উন্মত্ত পাগলের মত তরবারী ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে লাগিলেন : রাসুলাল্লাহ (আ) এন্তেকাল করিতে পারেন, একথা আমি বিশ্বাস করিতেই পারি না, ইহা অসম্ভব ব্যাপার। যে বলিবে রাসুলাল্লাহ এন্তেকাল করিয়াছেন তাহাকেই আমি কতল করিয়া ফেলিব ইত্যাদি নানারূপ প্রলাপ করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা তাহার বাহ্যিক প্রেমের উন্মত্ত নাটকীয় ভঙ্গিই প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ইহা যেন শিশুর মত প্রেমের বিরহের সরল অভিব্যক্তি। এমন সময় খবর পাইয়া আবু বকর আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি অন্দর বাড়িতে যাইয়া মৃতদেহ দেখিয়া মসজিদের আঙ্গিনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ওমরের ঐরূপ মত্ততা দেখিয়া উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : যাহারা মোহাম্মদের পূজা করিতে তাহারা জানিয়া রাখ, মোহাম্মদ মরিয়া গিয়াছেন। আর যাহারা আল্লাহর পূজা কর, তাহারা জানিয়া রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব কখনও মরেন না। তারপর তিনি বলিলেন : মোহাম্মদ একজন রাসুল ব্যতীত নহেন। নিশ্চয় তাঁহার পূর্বে অনেক রাসুল অতীত হইয়া গিয়াছেন। তিনি যদি মরিয়া যান অথবা কতল হইয়া যান তবে কি তোমরা পশ্চাদপদ হইয়া ফিরিয়া যাইবে? এবং যদি কেহ পশ্চাদপদ হইয়া যায় তাহাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। এবং শীঘ্র আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কৃত করিবেন (৩ঃ১৪৪)।

পরবর্তীকালে এই বাক্যটি কোরানের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, যদিও সেই সময়ে মসজিদে উপস্থিত জনগণের কাহারও ইহা কোরানের বাক্য বলিয়া জানাই ছিল না। এইজন্য কোরানের ভাষ্যকারগণ বলেন যে, খলিফা আবু বকর ইহা কোরানে ঢুকাইয়া দিয়াছেন।

সেদিন মদিনায় গোলযোগের সৃষ্টি হইল। মাওলার বিরোধী দল মদিনা ত্যাগ করিয়া বনি সাকিফায় চলিয়া গেল এবং সেখানে উপস্থিত লোকজনেরা মিলিয়া এক প্রকার নির্বাচন করিয়া আবু বকরকে খলিফা নিয়োগ করিল। এই নির্বাচনের মধ্যে কিছুসংখ্যক আনসারও অংশগ্রহণ করিয়াছিল। নির্বাচন একেবারে নির্বিবাদে সম্পন্ন হয় নাই। কারণ এই নির্বাচন সম্পন্ন করিতে দীর্ঘ তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। যাহা হোক, রাসুলের দেহত্যাগের তৃতীয় দিবসে আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হইয়া দলবল লইয়া মদিনায় ফিরিতেছেন।

এদিকে হাসেমীগণ এবং মদিনার আনসারগণ নবীর বিয়োগে শোক-সন্তপ্ত অবস্থায় অভিভূত হইয়া পড়েন এবং তৃতীয় দিবসে আলীর নেতৃত্বে রাসুলাল্লাহর (আ) কাফন দাফন সম্পন্ন করেন। নির্বাচিত খলিফা তাহার দলবল লইয়া মদিনা প্রবেশের পূর্বেই জানিতে পারিলেন যে, রাসুলাল্লাহর দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়া গিয়াছে। তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন কবর হইতে উঠাইয়া রাসুলাল্লাহর দেহ পুনরায় তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত দাফন করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নহে। নেতার দাফন ক্রিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার এবং সর্ব প্রকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভাব নিহিত থাকে। তাহাদের এইরূপ সিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারিয়া আলী তাঁহার জুলফিকার লইয়া মাটির কবরের উপর বসিয়া পড়িলেন তাহাদিগকে এই কাজে বাধা দেওয়ার জন্য। তাহারা নিকটে আসিয়া একে অন্যের মুখ চাহিতে লাগিল। তখন ওমর আবু বকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : “আপনি আমাদের নির্বাচিত খলিফা, হুকুম করুন, আমরা আলীকে আক্রমণ করি।” আবু বকর খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন : আমি রাসুলাল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছি : “এমন সময় আসিবে যখন আলী মাটির ঘোড়ায় সওয়ার হইবেন তখন যে-ই তাঁহার মোকাবিলা করিবে সে কাফের হইয়া মারা যাইবে।” আমার মনে হয় ইহাই সেই মাটির ঘোড়া। এইরূপে তাহারা তাহাদের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিল।

খেলাফতের গদিতে বসিয়াই আবু বকর মদিনায় নারকীয় একটি পরিবেশ সৃষ্টি করল। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে আলী বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সমর্থক নিতান্তই অল্প। তাহাদের জোর প্রচারে ক্রমে ক্রমে প্রায় সবাই আসিয়া খলিফার নিকট বয়াত গ্রহণ করিতে লাগিল। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, তাহাদের জোর প্রচার সত্ত্বেও আবু বকরের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার বয়াত গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকে হাসেমীগণ, বিশিষ্ট সাহাবীগণ এবং কিছুসংখ্যক আনসার। তাহারা আল্লাহ ও তাহার রাসুলের নিয়োগ অনুযায়ী আলীকেই তাহাদের মাওলারূপে গাদিরে খুমে যে বয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উপরেই স্থির থাকিয়া গেলেন।

খেলাফত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থাৎ ওমর এবং ওসমানের রাজত্বকালে তাহাদের কেহ কেহ খলিফা কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া জনকল্যাণের আতিরে শাসনকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহারা আলীকেই তাহাদের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত শাসক বলিয়া মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন।

জনমনে ইসলামের রূপ কিছুটা রক্ষা করিয়া রাখার জন্যই তাহাদের আচরণ এইরূপ হইতে পারিয়াছিল। খেলাফতকালে আলীর রাজনৈতিক মনোভাব এবং আচরণ হইতে সম্ভবত তাহারা এই মনোভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য ইহাকে তাহারা প্রয়োজনরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খেলাফতের গদিতে বসিয়াই আবু বকর ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করেন। যাহারা তাহাদিগের খেলাফত মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না তাহাদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে শুরু করিয়া দিলেন যাহার কারণে আলী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন এই অন্তর-বিপ্লবে তাঁহার বিরোধীদল সংখ্যাগরিষ্ঠ। নবী বর্তমান থাকিতে যাহারা নবীর সঙ্গে একযোগে বাহিরের শত্রু হইতে মদিনা রাষ্ট্রকে রক্ষা করিয়াছে আজ তাহাদেরই এক বিরাট অংশ মাওলাইয়াতের বিরোধী হইয়া খেলাফতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে। আলী চিন্তা করিয়া দেখিলেন এমতাবস্থায় যদি খেলাফতের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করেন তাহা হইলে আত্মঘাতী ভয়ঙ্কর যে যুদ্ধ হইবে তাহাতে মদিনা তাহার কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিবে। মক্কার কোরেশগণ যাহারা বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাকৃত পরাজয় বরণ করিয়াছিল, তাহারা অন্তর হইতে মুসলমান হইতে পারে নাই। তাহারা পুনরায় মদিনা আক্রমণ করিয়া হাসেমী বংশ এবং মোমিনগণকে মদিনা হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। ইহা ছাড়া বাহিরের শত্রু তো ছিলই। এইসব চিন্তা করিয়া আলী খামোশ হইয়া গেলেন। ধর্ম বিষয়ে বল প্রয়োগের পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া মানুষের মনে ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সুযোগ গ্রহণ করা এক্ষেত্রে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এইরূপে তিনি রাষ্ট্রনীতি হইতে হস্ত উঠাইয়া নিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন মানুষের মনোবাস্তবিক ধর্ম বিস্তারের জন্য।

এইরূপে খেলাফতকালে মোসলেম রাষ্ট্রে একপ্রকার দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হইয়া গেল। রাষ্ট্র এবং ধর্ম এক হইতে অন্য আলাদা হইতে শুরু করিল। প্রথম তিন খলিফা এমন কি মাবিয়াও মালাইয়াতকে তথা ইমামগণকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে কাজ করিয়া চলিতে বাধ্য দান করেন নাই। এজিদ ক্ষমতায় আসিয়া ইমাম হোসাইনকে স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। মদিনার গভর্নরকে সম্রাট এজিদ হুকুম দিলেন ইমাম হোসাইনকে এজিদের রাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ করাইবার জন্য। এখন হইতে আর

তাঁহাকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইবে না। ইহার ফলে পরিণামে কারবালার শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল এবং ইহার ফলে মাওলাইয়াত অর্থাৎ ইমামত তাহার ধর্মীয় অধিকারও হারাইয়া ফেলিল। এ কারণে হোসাইন পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীন রাষ্ট্রনৈতিক সকল সংশ্লিষ্ট হইতে নিজেকে সরাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন—যাহার ফলে তাঁহার প্রতি এজিদের দয়ার দৃষ্টি পতিত হইল এবং তিনি পুনরায় রাজনীতি বিবর্জিত ধর্মনীতি প্রচারের অধিকারপ্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে দেখা গেল ইমামগণ তাঁহাদের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের কারণে এত বেশি জনপ্রিয় হইলেন যে, প্রতিটি রাজাই তাঁহাদিগকে ভয় করিতেন। পাছে তাঁহারা তাঁহাদের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শাসনযন্ত্র দখল করিয়া বসেন, এই ভয় সকল রাজাদেরই ছিল। এইজন্য কি উমাইয়া কি আব্বাসী, পরবর্তী সকল শাসকগণই ইমামগণকে হত্যা করিয়াছেন, হয় প্রকাশ্যে, নয়তো বিষ প্রয়োগ করিয়া গোপনে।

এখন আমরা আগের কথায় ফিরিয়া যাই, খেলাফত সবেমাত্র কর্মসূচী আরম্ভ করিয়াছে। আবু বকর “বাগে ফেদাক” রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়া লইলেন। রাসুলুল্লাহ ইহা দান করিয়াছিলেন তাঁহার কন্যা ফাতেমা জোহরাকে। তিনি স্বয়ং খলিফা আবু বকরের নিকট মসজিদে নববীতে যাইয়া হাজির হইলেন। খলিফা তখন সপরিষদ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বাগান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় খলিফা উত্তর দিলেন : “নবীগণের কোন উত্তরাধিকারী হয় না। উম্মতগণই নবীর সকল সম্পত্তির মালিক হইয়া থাকে।” ইহাতে নবীকন্যা বলিলেন : “আবু বকর, তুমি কি কোরান পড় নাই? ইহাতে কি লিখা নাই যে, সোলায়মান নবী তাঁহার পিতা দাউদ নবীর সকল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন?” ইহার জবাবে আবু বকর বলিলেন : “রাসুলুল্লাহ আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী হইবে না।” ইহা শুনিয়া নবীকন্যা বলিলেন : ইহা মিথ্যা কথা। এই বলিয়া তিনি মসজিদ হইতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। নবীদের কোন উত্তরাধিকারী না হওয়ার কথা হাদিসে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় আমরা কোনটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব?

ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, এই বাগান শুধু মৌখিক নহে রাসুলুল্লাহ দানপত্র লিখিয়াই ইহা আপন কন্যাকে দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রে দাতা হইলেন

রাসুলুল্লাহ, গ্রহীতা তাঁহার কন্যা। ইহার লেখক হইলেন আলী এবং সাক্ষী হইলেন তাঁহাদের দুই নাবালক পুত্র ইমাম হাসান ও হোসাইন।

রাসুলুল্লাহর এন্তেকালের পর ফাতেমা জোহরা বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। কথিত আছে বাগানের এই ঘটনার পর হইতে যখনই আবু বকর নবী কন্যার বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেন তখনই তিনি নবীর কন্যাকে “সালামুন আলাইকে ইয়া বিনতে রাসুলুল্লাহ” বলিয়া সালাম পেশ করিতেন। কিন্তু নবী কন্যা কখনও তাহার সালামের জবাব দিতেন না।

দ্বীন অথবা দুনিয়া সংক্রান্ত যে কোন বিষয়েই হউক না কেন নবী অথবা ইমাম কোন উম্মতের নিকট বয়াত গ্রহণ করিতেই পারেন না। এইরূপ করিলে নবীর নবুয়ত এবং ইমামের ইমামত থাকিতে পারে না। তাঁহারা সাধারণ মানব পর্যায়ে উর্ধ্বে। বিশেষ করিয়া ইমামগণ হইলেন “উলিল আমর” অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে সমাজের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং খেলাফত অথবা অন্য কোন প্রকার শাসন পদ্ধতির প্রতি কোন ইমাম কিছুটা সমর্থন কোনও কারণে দিতে চাহিলেও ইমাম কখনও গায়ের ইমামের নিকট অর্থাৎ সেই শাসকের নিকট বয়াত গ্রহণ করিতে পারেন না।

যদিও বেশির ভাগ লোক প্রথম হইতেই খেলাফতকে সমর্থন দিয়াছিল তথাপি আবু বকরের রাজত্বের প্রারম্ভে সকলে খেলাফতকে একবাক্যে ন্যায়সঙ্গত শাসন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই যাহার ফলে আবু বকরকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব জীবনপণ করিয়া লড়িতে হইয়াছিল। এমতাবস্থায় আলী যদি হাসেমীদের সাহচর্যে অধিক সমর্থিত খেলাফতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন তাহা হইলে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কাবাসীগণ পুনরায় মদিনা আক্রমণ করিত। ইহার ফলে ইসলামের বিকাশ সেখানেই শেষ হইয়া যাইত। তাই আলী তাঁহার দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া খামোশ রহিলেন। জনমনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় রহিলেন।

আবু সুফিয়ান আলীকে সাহায্য ও সমর্থন দানের প্রস্তাব করিলে তিনি যেইভাবে তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠে। হজরত আলী খেলাফতের নিকট যখন আনুগত্য গ্রহণ করিলেন না তখন আবু সুফিয়ান মদিনায় আসিয়া রাসুলুল্লাহর চাচা হজরত আব্বাসের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, “এইসব লোকেরা বনি হাসেম হইতে খেলাফত

ছিনাইয়া লইয়াছে। আপনি রাসুলুল্লাহর চাচা এবং কোরেশদের মধ্যে বয়সে যেমন সবার বড় তেমনই তাহাদের সবার প্রতি দয়ালুও বটে। তাহারা আপনার নেতৃত্ব মানিয়া লইবে। আসুন আপনি এবং আমি আলীর আনুগত্য গ্রহণ করি। যদি কেহ আমাদের বিরোধীতা করে আমরা তাহাকে হত্যা করিব।”

তাহারা উভয় আলীর নিকট আসিলেন এবং আবু সুফিয়ান বলিলেন, “আলী, তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা মদিনা ভরিয়া ফেলিব। আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ কর। তুমি হাত বাড়াত, আমরা তোমার নিকট আনুগত্যের বয়াত গ্রহণ করি।” ইহা শুনিয়া আলী বলিলেন, “হে আবু সুফিয়ান, আমি মহান আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি এই প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলমানগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর মতভেদ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছ। তুমি সর্বদাই ইসলামের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। অতএব, তোমার সহানুভূতি এবং সাহায্য আমি চাহি না।”

হযরত আলী স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, বর্তমান এই অবস্থায় যে কোন বড় রকমের মতভেদ ইসলামের স্বার্থ বিষমভাবে ব্যাহত করিবে। রাসুলের আদর্শ এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল তাঁহার সম্মুখে উদাহরণ স্বরূপ এবং পরবর্তীকালে যাহা কিছু ঘটিবে তাহার সকলই রাসুলুল্লাহ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

বর্ণিত আছে “রাসুলুল্লাহ হযরত আলীকে বলিয়াছিলেন : তোমার মর্যাদা এবং অবস্থান কাবার সমতুল্য। লোকেরা কাবার নিকট গমন করে কিন্তু মর্যাদাশীল কা'বা কাহারও নিকট গমন করে না। সুতরাং আমার এন্তেকালের পর লোকেরা তোমার নিকট আসিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ করিও, কিন্তু তাহারা তোমার নিকট না আসিলে তুমি তাহাদের নিকট যাইও না।”

ইহাও বর্ণিত আছে “রাসুলুল্লাহ হযরত আলীকে বলিয়াছিলেন : আমার পর যখন তুমি চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হইবে তখনকার জন্য আমার উপদেশ হইল-ধৈর্য রাখিও, নিরাশ হইও না। লোকেরা যখন জাগতিক ক্ষমতা এবং সম্পদের আকাজক্ষায় লোভী হইবে তখনও তুমি তাহাদের জন্য দুনিয়ামুখী সমাজ ব্যবস্থার ধারণা মনে না রাখিয়া পরকালমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করিও।”

হযরত আলী রাসুলুল্লাহর মতই ইসলামকে গভীরভাবে ভালবাসিতেন। তাই ইসলামের ক্ষতি হইতে পারে তেমন কোন জাগতিক ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা তিনি মনে আনিতেই পারেন নাই। তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে, সেই পর্যায়ে কোনরূপ গৃহযুদ্ধ হইলে, একদিকে বনি নাজির ও বনি খারিজা ইহুদী গোত্রদ্বয়, অপরদিকে সিরিয়া ও নজরানের খৃস্টানগণ পূর্ব রোমীয় সাম্রাজ্যের সহায়তায় এবং অন্য আর একদিকে নবদীক্ষিত কোরেশগণ ও মোনাফেকগণ সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবে। তাহারা মুসলমানগণকে পরস্পর হানাহানি করিতে দেখিলে মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ইসলামকে জগত হইতে মুছিয়া ফেলিত।

মাওলা চাহিলেন আরবগণ ক্ষমতা এবং ধনের অন্যায় অধিকারী থাকিয়াও যেন ইসলামের আওতাভুক্ত হইয়া থাকে যাহাতে ইসলামের শত্রুগণ অনুভব করিতে পারে যে, রাসুলের এস্তেকালের পরও মুসলমানগণ নিজদিগকে রক্ষা করিতে যথেষ্ট সমর্থ। এইজন্যই তিনি শুধু ইসলামের খাতিরে খেলাফতের সৃষ্ট সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায় বরদাস্ত করিয়াছিলেন এবং একই কারণে তিন খলিফার রাজত্বকাল পর্যন্ত গৃহবন্দীর মত নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করিলেন। এইজন্য নাহজুল বালাগাতে দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার চাচা হযরত আব্বাসকে কোনরূপ রাষ্ট্রীয় গোলযোগে অংশগ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

আলীকে (আ) খলিফার নিকট ধরিয়া আনা : আর একটি নাটকীয় ঘটনা হজরত ওমরের দ্বারাই ঘটান হইয়াছিল। খুব সম্ভব ইহা খলিফার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই ওমর এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। মদিনায় খেলাফতের রচিত প্রারম্ভিক গোলযোগ যখন থামিয়া গেল এবং পরিস্থিতি খেলাফতের আয়ত্তে আসিয়া গেল, তখন দেখা গেল হাসেমীগণ এবং কিছুসংখ্যক আনসার খেলাফতের নিকট বয়াত গ্রহণ করে নাই। তাহারা আলীকেই তাহাদের একমাত্র নেতারূপে গ্রহণ করিয়াই আছে। এমন অবস্থায় ওমরের নেতৃত্বে একটি “মশাল মিছিল” আলীর বাড়ির দিকে রওয়ানা হইল। ইহাকে খেলাফতের “যুব দল” বলা যাইতে পারে। ওমর ভাল করিয়াই জানিতেন যে, আলীকে বয়াত গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যাইবে না। তাঁহার রাজনৈতিক মর্যাদা লোকচক্ষে হয় প্রতিপন্ন করিয়া খেলাফতের জয় এবং মাওলাইয়াতের পরাজয় দেখাইয়া দিয়া জনমত প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যই ছিল এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের

একমাত্র লক্ষ্য। আলীর (আ) বাড়িতে উপস্থিত হইয়া যখন তাহারা আলীকে (আ) ধরিয়া খলিফার নিকট লইয়া যাওয়ার অভিপ্রায় জানাইল তখন দরজার আড়াল হইতে ফাতেমা জোহরা বলিলেন : তোমরা বাড়ি হইতে চলিয়া যাও, কত বড় আত্মসম্পর্ক যে, তোমরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে? এই বলিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ওমর এক লাথিতে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দরজার আঘাত খাইয়া ফাতেমা জোহরা মাটিতে পড়িয়া দৈহিক সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। ঘরে ঢুকিয়া তাহারা আলীকে এবং তাঁহার খাদেমকে জবরদস্তি ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং খলিফার নিকট লইয়া যাইতে লাগিল। বাঁধা অবস্থায় আগে আলী (আ), পিছনে বাঁধা অবস্থায় চলিতেছিলেন তাঁহার খাদেম।

এই জাতীয় রাজনৈতিক মিছিলে স্বাভাবিকভাবে যাহা হইয়া থাকে এখানেও তাহাই হইয়াছিল। বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা এবং অপমানজনক ঠেলাধাক্কা, এমন কি কিছু বিদ্রোহের চড়-চাপড়ও খাদেমের ভাগ্যে যে পড়ে নাই তাহা নহে। কথিত আছে খাদেম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন : যুদ্ধক্ষেত্রে মাওলার সিংহরূপ দেখিয়াছি কিন্তু এমন মেঘরূপ তো কখনও দেখি নাই। কেমন করিয়া ইহাও তাঁহার জন্য সম্ভবপর হইতে পারিল? আলী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন : “হে বৎস, জানিয়া রাখ ইহা পরিস্থিতির হেরফের। যে আলীকে তুমি দেখিয়া আসিতেছ এই আলী সেই আলী নহে।” যাহা হউক খলিফার নিকট আলীকে লইয়া গেলে খলিফা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন : তোমরা অনর্থক সম্মানিত ব্যক্তির এইরূপ অপমান করিয়াছ। তাঁহাকে বাঁধিয়া আনা তোমাদের অন্যায় হইয়াছে। তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও। দরজার আঘাত এত জোরে লাগিয়াছিল যে, কয়েকদিনের মধ্যেই ফাতেমা জোহরা সালামাল্লাহে আলাইহা এস্তেকাল করেন। এইজন্য শিয়াগণ তাঁহাকেও শহীদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

‘জেহাদ’ অর্থ আল্লাহর পক্ষ হইয়া আল্লাহর আদেশে যুদ্ধ করা। জেহাদের যে মহান আদর্শ রাসুলুল্লাহ শিখাইয়া গিয়াছেন, খেলাফত ক্ষমতা দখল করিয়া রাসুলের সেই জেহাদ নীতি ত্যাগ করিয়া জেহাদের নামে নূতন যুদ্ধনীতি গ্রহণ করিল—“জোর যার মুল্লুক তার।” জেহাদের একটি নীতি হইল আক্রান্ত না হইলে অথবা শত্রু যদি আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ না করে তাহা হইলে কোন দেশ আক্রমণ করা চলিবে না। তাহা ছাড়া রাসুলুল্লাহ অথবা তাঁহার মনোনীত

নেতা ব্যতীত অন্য লোকের দ্বারা যুদ্ধ চালিত হইলে তাহাকে জেহাদ বলা চলিবে না।

শত্রুর পরিত্যক্ত মালের এক-পঞ্চমাংশ নেতাকে পৌছাইয়া দিয়া বাকি চারি অংশ মোজাহেদ বাহিনী সমান ভাগ করিয়া লওয়ার যে ব্যবস্থা রাসুলুল্লাহ অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহা হইল 'জেহাদের খুমস'। খেলাফত জেহাদের খুমসের নীতি তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়াছিল, যদিও খুমসের সামগ্রিক ব্যবস্থা, নীতি হিসাবে খেলাফত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে খুমস নীতি অবলম্বন করার কারণে লুটপাটে অভ্যস্ত আরবগণ খেলাফতের পক্ষ হইয়া সৈন্যবৃ্ত্তি গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল।

ওমর শুধু যে দ্বিতীয় খলিফাই ছিলেন তেমন নহে। প্রথম খলিফা এবং তৃতীয় খলিফাও তাহারই সৃষ্টি। এক কথায় খেলাফত তাহারই হাতে গড়া এক প্রকার নববিধান।

আলীকে (আ) যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলে জেহাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন যুদ্ধনীতি গ্রহণ করা যায় না। তাহা ছাড়া আলীকে পাঠাইলে আলীর গুরুত্ব এবং প্রতিপত্তি বাড়িয়াই যাইবে। এইরূপ হইলে মাওলাইয়াত বাতিল করিয়া উহারই বিরুদ্ধ ব্যবস্থা হিসাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সুযোগ রক্ষিত হইতে পারে না।

একটি মন্তব্য : প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত খেলাফত জেহাদ নীতি ত্যাগ করিয়াই চলিয়াছিল। ইহা খেলাফতকালের সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে বাস্তবরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে জাতীয় নীতিবোধ পরবর্তী সকল কালের জন্য ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছিল। যেইরূপ সিদ্ধান্ত বা মনোভাব গ্রহণ করিয়া মানুষের মন হইতে জেহাদ নীতি উচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা খলিফাগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সেই মনোভাবের একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

(২২ঃ৭৮) অজাহেদু ফিল্লাহে হাক্ক জেহাদেহী অর্থাৎ এবং আল্লাহর পথে জেহাদ কর, যেন জেহাদের হক পূর্ণ হয়।

ইবনে মারদুইয়া আব্দুর রহমান ইবনে আউফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমাকে হযরত ওমর বলিয়াছেন : আমরা কি এই আয়াত কোরানে পাঠ করিতাম না? আমি বলিলাম : “নিশ্চয় পাঠ করিতাম। তবে সে জামানা শেষ

হইবে কখন?” হযরত ওমর বলিলেন : “যখন বনি উমাইয়া শাসনকর্তা হইবে এবং মুগিরার সন্তান মন্ত্রী হইবে।” বাইহাকীও এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

(দ্রষ্টব্য: দূরে মনসুর, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা : আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ওমরের বিশিষ্ট একজন দলীয় ব্যক্তি। তিনি ওমর কর্তৃক রচিত খলিফা মনোনয়নকারী ছয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটির একজন সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন এবং আরও পরবর্তীকালে ওসমানের নিয়োজিত কোরান বোর্ডের একজন সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। এক সময় হযরত ওমর মুচকা হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : আমরা কি জেহাদ বিষয়ে উল্লেখিত এই বাক্য কোরানে পাঠ করিতাম না? এখন কেমন হইল? তাহার জবাবে আব্দুর রহমান বলিয়াছিলেন : হ্যাঁ আমরা তো ইহা পাঠ করিতাম, কিন্তু যদিও জেহাদ আমরা দেশ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছি তথাপি জনমন হইতে জেহাদের ভাবধারা একেবারে উচ্ছেদ করিয়া ফেলা যায় নাই। এখনও জেহাদের মনোভাব কিছু লোকের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। জেহাদ বলিতে কিছুই থাকিবে না এমন অবস্থা কবে আসিবে? তাহার উত্তরে ওমর বলিলেন : জেহাদ সেই সময় একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে যখন উমাইয়্যাগণ শাসন ক্ষমতায় আসিবে এবং কূটবুদ্ধির অধিকারী মুগিরার সন্তানগণ রাষ্ট্র চালনায় মন্ত্রণাদাতা হইবে। ভবিষ্যতে তাহাই হইয়াছিল।

কয়েকটি প্রশ্ন এবং উত্তর : রাসুলুল্লাহর প্রথম জেহাদ বদর। এই জেহাদের অনুমতি দানের সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ হইতে জেহাদের অনুমতি ও বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ আল্লাহতা'লা আলীকে জুলফিকার নামক তরবারী রাসুলুল্লাহর মারফত জেহাদের হাতিয়ার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। জুলফিকার মানুষের হাতের তৈয়ারী তরবারী নহে। ইহা জেহাদের প্রতীক আল্লাহর প্রেরিত তরবারী। খেলাফতের দিগ্বিজয়ের যুদ্ধগুলি যদি জেহাদ হইয়া থাকে, তবে আলী আল্লাহর তরবারীর অধিকারী হইয়া চুপ করিয়া থাকেন কেন? তিনি কি এতকাল অসুস্থ ছিলেন? অথবা তিনি কি কাপুরুষ হইয়া গিয়াছিলেন? অথবা তিনি কি কাফের বা মোনাফেক হইয়া গিয়াছিলেন?

* শারাল্লাহ Avenger of blood for Allah, on behalf of Allah against his enemies is called 'Shar Allah' আল্লাহ তাঁহার যে প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁহার দুশমনদিগ হইতে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন সেইরূপ যোদ্ধা প্রতিনিধিকে শার-আল্লাহ বলা হয়। আলীর ইহা অন্যতম একটি খেতাব।

এইরূপ কিছুই যদি না হইয়া থাকেন তবে আল্লাহর তরবারী রাসুলের এন্তেকালের পর জেহাদের মাঠে চমকায় না কেন? অন্য আর একজন বীর সেনাপতিকে মিথ্যা সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী খেতাব দিয়া খেলাফতকালের যুদ্ধগুলিকে জেহাদ বলিয়া আখ্যায়িত করিবার এত প্রয়োজন হইয়া পড়ে কেন?

জুলফিকারের অধিকারী হইয়া জেহাদে যোগদান না করিলে কাফের প্রমাণিত হয়। বিনা কারণে কেহ জেহাদে যোগদান না করিলে কোরান মতে সেও কাফের হইয়া যায়। আর মহাবীর 'শার-আল্লাহ'* আলী, আল্লাহর তরবারী হাতে লইয়া নিশ্চিন্তে গৃহ-সুখের মায়ায় আবদ্ধ? ইহাও কি সম্ভব? দুই চারি দিন নহে। তিন খলিফার দীর্ঘ তেইশ বৎসর রাজত্বকাল পর্যন্ত।

আসলে খেলাফত ছিল তাঁহারই বিরুদ্ধে রচিত রাজনৈতিক আন্দোলন, যাহার নেতাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মোহাম্মদী ইসলামকে তাহার মূলনীতি হইতে ক্রমশ তাহাদের শক্তিবলে দূরে সরাইয়া দিয়া উহাকেই মূলধন করিয়া আরব সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

পারস্য ও রোমীয় সাম্রাজ্যের পরিবর্তে তথায় উহাদিগ হইতে উন্নত পর্যায়ের আরব সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামের এমনই একটি প্রাণবন্ত জেহাদধর্মী শিক্ষা ও দীক্ষায় আরব জাতিকে রাসুলুল্লাহ অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন যাহাকে মূলধন করিয়া খেলাফত অতি সহজেই দ্বিধিজয় করিতে পারিয়াছে। তদুপরি সেই যুগের সাম্রাজ্যবাদ ছিল খেলাফতের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ হইতে নিম্নমানের। বিজীত দেশের জনগণ আরব শাসনে আসিয়া অনেকখানি মুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল। এইজন্য তাহারা আরবদের শাসন সহজে মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের সকল আন্দোলন ও মূলনীতি আলীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল উহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত। সেইজন্য খেলাফতের সমর্থক লেখকগণ মাওলা আলীকেও তাঁহার উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন নীতিমালা হইতে নামাইয়া খেলাফতের নিম্ন পর্যায়ভুক্ত করিয়া দেখাইবার জন্য তাঁহাকেও একজন 'খলিফা' অর্থাৎ 'চতুর্থ খলিফা'রূপে অঙ্কিত করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। উমাইয়া এবং আব্বাসী রাজতন্ত্রের দীর্ঘকালের অপপ্রচারের দ্বারা সমাজে ইহা সাধারণভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আলী চতুর্থ খলিফায় পর্যবসিত হইয়া গিয়াছেন। এইজন্য ধর্মীয় লেখকগণ খেলাফতের ধর্মদ্রোহিতাকে সমর্থন দেওয়ার জন্য তিন খলিফার রাজত্বকালের ঘটনাসমূহের সঙ্গে মাঝে মাঝেই খেলাফতের প্রতি আলীর সমর্থনের মিথ্যা

উল্লেখ করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। আসলে আলী ছিলেন খেলাফতের ঘোর বিরোধী।

তিন খলিফাও প্রত্যেকে ভাল করিয়াই আলীর বিরোধী মনোভাব অবগত ছিলেন। এইজন্য তাহারা আলীর গতিবিধি এবং কার্যকলাপ সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিয়া যাইতেন। আলীর আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদার প্রতি খলিফাগণের সম্মান প্রদর্শনের ব্যতিক্রম কখনও ঘটে নাই। তাহারা ক্ষমতাচ্যুত আলীকে তাঁহার উচ্চতম পর্যায়ে জ্ঞান-গরিমার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাহ্যিক মর্যাদা দানে কখনও কসুর করিতেন না যদিও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হইতে তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার সকল ব্যবস্থা অবলম্বনে যত্নবান থাকিতেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতিকে নূতন পদ্ধতিতে ধর্মদ্রোহিতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্বপ্রকার পর্যায়ে নববিধান প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইতে লাগিল। তাই ওমর তাহার রাজত্বকালে শতাধিক নববিধান (বেদাত) জারি করিয়াছিলেন; যাহার প্রত্যেকটি ছিল রাসুলের প্রবর্তিত বিধান হইতে ব্যতিক্রমধর্মী।

এক শতের উপরে নববিধান জারি করিলে মোহাম্মদী ধর্ম তাহার মূলের উপর কতটুকু প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে তাহা অবশ্যই বিচার্য ও চিন্তা করিবার বিষয়। কিন্তু হাজার বৎসরের প্রচারযন্ত্র উহাকে জাতির গা-সহা করিয়া তুলিয়াছে, যাহার ফলে এই যুগের মানুষ চিন্তা করিয়াও দেখে না যে, বর্তমানে সমাজে প্রচলিত ইসলাম ধর্মের মধ্যে মোহাম্মদী ইসলাম আদৌ আছে কিনা। খেলাফতের ইতিহাস এবং খলিফাদের জীবনী লেখকগণ যাহা কিছু লিখিয়া থাকেন তাহার বেশিরভাগ কথাই মিথ্যা হইয়া থাকে। ইহার কারণ, তাহারা তথাকথিত বিশিষ্ট মোহম্মদেসগণের লিখিত হাদিস গ্রন্থগুলিকে প্রামাণ্য দলিলরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেমন : 'মোসলেম' ও 'সহি বোখারী' ইত্যাদি। অথচ তাহারা ঐ সকল হাদিস গ্রন্থের সত্যাসত্য বিচারে একেবারেই অক্ষম। খেলাফতের সমর্থনে, মাওলা আলীর বিপক্ষে শত শত মিথ্যা হাদিস বোখারী ও মোসলেম রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং সেইগুলি আব্বাসী রাজাদের ছত্রছায়ায় সহি হাদিস বলিয়া প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার কোন্দলের চাপে "ইসলাম ধর্ম" তাহার সত্য রূপটি হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইকথা ঠিক মত না বুঝিলে ইসলামের সত্য ধর্ম

এবং তাহার সত্য ইতিহাস উদ্ধার করা আধুনিক লেখকগণের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হইবে না।

শিয়া, সুন্নি এবং খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু লেখক “নাহজুল বালাগা” সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন : মর্যাদার বিচারে আল্লাহর বাণীর পরেই আলীর (আ) বাণী। তাঁহার বাণীসমূহ এত উন্নতমানের যে, সেইগুলিকে কোরানের প্রতিফলন বা ব্যাখ্যা বলা চলে। এহেন একটি মূল্যবান পুস্তক আমাদের সুন্নি সমাজে অনাদৃত। সত্য বলিতে কি আজ আমার ৬৪ বৎসর বয়সে নাহজুল বালাগা নামক পুস্তকটির ইংরেজী একটি অনুবাদ সর্বপ্রথম দেখিবার সৌভাগ্য হইল। ইহা আমার জন্য একটি কলঙ্কের কথা বলিয়াই আমি মনে করি। পুস্তকটির ভাণ্ডে এইরূপ দুর্দশা ঘটিবার একমাত্র কারণ ইহা খেলাফতের কলঙ্ক এবং অন্যায় পরিকল্পনাভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তিন খলিফা সম্বন্ধে আমাদের সমাজের যেইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অধুনা চারজন প্রখ্যাত লেখক খলিফাগণের জীবনী লিখিয়াছেন। যথা : গোলাম মোস্তফা সাহেব, মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ সাহেব, জাস্টিস আবদুল মওদুদ সাহেব এবং অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেব। তাহাদের লেখা তাহারা রাজকীয় মিথ্যা ইতিহাস এবং মিথ্যা হাদিসের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিয়াছেন। ইহাতে সমরাদার পাঠকের জন্য দুঃখিত এবং ব্যথিত হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। সুতরাং, উক্ত চারটি পুস্তকের অপপ্রচার সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য করাই বৃথা।

আলীর (আ) রচিত ‘নাহজুল বালাগা’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তাঁহারই উল্লেখিত ভাষণসমূহে তাঁহার মনের এই তীব্র বেদনা সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে। সৈয়দ মোহাম্মদ আসকারী জাফরী কর্তৃক, ‘নাহজুল বালাগা’ পুস্তক হইতে ইংরেজীতে অনূদিত পুস্তকে তিনি মাওলা আলীর ছোট-বড় ২৪৫টি খোৎবা এবং তাঁহার অফিসারদের নিকট এবং বিদ্রোহী মাযিয়্যার নিকট লিখিত মোট ৭৯টি চিঠি এবং ২১০টি উপদেশ বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজীতে অনূদিত জাফরী সাহেবের এই পুস্তক হইতে আমরা মাত্র ১২টি খোৎবা নমুনাস্বরূপ পেশ করিলাম। এই পুস্তকের অনুবাদক মাওলা আলীর (আ) নাম উল্লেখের পরিবর্তে শুধু ‘হজরত’ লিখিয়াছেন, আমরাও অনুবাদে তাহাই লিখিলাম।

KHUTBA-7

..... By God! That man snatched the caliphate as if it was an insignia which could be put on by him, all the while he knew very well that I was indispensable to the caliphate as a pivot to the grinding stone upon which its revolutions depend.

The eminence of my position among those men was such that I was like a fountain head from which the rivers of wisdom flow and nobody could aspire to rise to the heights of my knowledge. But I was forced to close my eyes to this usurpation and turn my face away from the calamity. I was in great straits, there were two alternatives before me, either to fight for my rights without the help of supporters, or to patiently endure the bereavement, the endurance was going to be of such a sad and long duration that during this period youngmen would become old, the old would lose their vitalities and the faithful would end their days unsuccessfull trying to improve the situation.

After having weighed the situation carefully I came to the conclusion that the wisest course for me was to face the disaster with patience and courage. I therefore, bore it all patiently, though the very thought, of having my just rights usurped, was extremely painful and saddening to me.

At last, the first caliph died, but while going he appointed another to fill his vacancy. Here Hazrat cited a verse of the poet Asha, in which the poet draws a comparison between the days when he was leading with his brother a happy and carefree life and again when he had to face difficulties alone.

It is not astonishing that during his life time he was always badly in need of the help of others to compensate for his imperfections and defects and to cover his faults and failures, but

(that of kharijites) became apostates and the third adopted an equally wrong course and coveting the power and wealth which are part of such a rulership they started tyrannizing the people and oppressing them into subjugation.

All the three groups, behaved as if they have never heard the Quran saying, "Heaven is meant for those who do not covet, do not create dissensions and do not oppress human beings, the Eternal Peace and Happiness is for those who lead a pious and holy life," I swear by God that they were made to hear these words of God repeatedly and their meanings were explained to them completely and fully. But the vicious ways of ungodly life fascinated them and its luxuries, its pomp and glory, as well as its power and wealth enchanted them.

I swear by the creator of this universe that had they not sworn unconditional allegiance to me, had they not manifested unbounded thankfulness in my accepting their rulership, had not the presence of helpers and supporters made it incumbent upon me to defend the faith, and had God the Almighty not taken a promise from the learned doctors of theology to put a check upon the luxurious and vicious lives of oppressors and tyrants as well as to try to reduce the pangs of poverty and starvation of the oppressed and downtrodden, and had He not made it incumbent upon them to secure back the usurped rights of the weak from the mighty and powerful, I would even now have left the rulership of this state and would have allowed to sink into anarchy and chaos as I did during the early days. The pomp and glory of a vicious life is to me worthless even than the sneeze of a goat.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-৭

আল্লাহর কসম! সেই লোকটি খেলাফত ছিনাইয়া লইয়াছিল এবং তাহা প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ পরিধান করিয়াছিল। খেলাফত যেন একটি প্রতীক চিহ্ন যাহা ধারণ করিলেই সে খলিফা হইয়া যাইতে পারিবে। সর্বদাই সে ভালরূপেই ইহা অবগত ছিল যে, আমি খেলাফতের জন্য এমন অপরিহার্য যেমন যাঁতার কেন্দ্রীয় শলাকাটি, যাহার উপর যাঁতার ঘূর্ণন নির্ভর করে।

সেই লোকদের মধ্যে আমার পদ মর্যাদা এত উন্নতমানের যে, আমি একটি নির্বাকের মত, যাহা হইতে জ্ঞানের নদীসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং আমার জ্ঞানের উচ্চতায় পৌঁছবার আশাও কেহ করিতে পারিত না। কিন্তু এই জবরদখলের প্রতি আমাকে বাধ্য করা হইয়াছিল চক্ষু বুঁজিয়া থাকিতে এবং সেই দুর্যোগ হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমার সম্মুখে দুইটি মাত্র বিকল্প ব্যবস্থা ছিল : সমর্থকগণের সাহায্য ছাড়াই আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা, আর তাহা না করিলে ধৈর্য সহকারে সকল দুঃখ-শোক সহ্য করিয়া যাওয়া। সহিষ্ণুতা এবং সহ্য করার বিষয় এত দুঃখজনক এবং দীর্ঘস্থায়ী হইতেছিল যে, যুবকেরা বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বৃদ্ধেরা শক্তি হারায়া ফেলিয়াছিল এবং মোমিনগণ অবস্থার উন্নতি সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া জীবন শেষ করিয়া দিয়াছিল।

অবস্থার গুরুত্ব সাবধানতা সহকারে বিচার করিয়া ধৈর্য ও বীরত্ব সহকারে এই বিপদসঙ্কুল অবস্থার মোকাবিলা করার সিদ্ধান্তই আমার পক্ষে সর্বোত্তম পথ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এইজন্য আমি ইহার সবটুকুই ধৈর্য সহকারে সহ্য করিয়াছিলাম যদিও আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে বলপূর্বক দখল করিয়া রাখার বিষয়টি সর্বদাই আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিত।

অবশেষে প্রথম খলিফা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কিন্তু মরার আগে এই শূন্য স্থানে অন্য একজনকে নিয়োগ করিয়া গেল। হজরত এখানে আশা নামক একজন কবির একটি কবিতার উল্লেখ করিলেন যাহাতে কবি তাহার জীবনের দুইটি পর্যায়ের তুলনামূলক ছবি আঁকিয়াছিলেন : একটি হইল তাহার ভাইয়ের সঙ্গে নির্বিকার সুখে জীবন যাপন করার বিষয় এবং অপরটি হইল বাধ্য হইয়া একলা জীবনের বহু দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করিয়া জীবন যাপন করার কথা।

ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, যে ব্যক্তি তাহার জীবদ্দশায় আপন ক্রটি ও ব্যর্থতা ঢাকিয়া আপন অযোগ্যতাকে সাহায্য করিবার জন্য সব সময় অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইত সে ব্যক্তি কেমন করিয়া তাহার মৃত্যুকালে অন্য একজনকে নিয়োগ করা বিষয়ে নিজেকে যথেষ্ট জ্ঞানী-গুণী মনে করিল? এবং সে মৃত্যুকালে অন্য একজনকে সে কাজে নিয়োগ করিয়া গেল যে কাজে নিজেই সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। ইহাও কি আশ্চর্যের বিষয় নহে?

নির্ভীকতার সহিত এবং নীতি জ্ঞানহীনতার সহিত সে এবং তাহার পরবর্তীজন সমাজের ধন-সম্পদ ধ্বংস এবং লুটপাট করিয়া রাষ্ট্রকে এমন নৈরাশ্যজনক ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ফেলিয়াছিল যে, কালের প্রবাহ এই ক্ষতিকে আরও বর্ধিত করিয়াই চলিয়াছিল। এই ক্ষতি পূরণ করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল। নীতিহীন শোষণ আরও অধিককাল চলিতে থাকার বিপদ সুস্পষ্ট ছিল। নীতিহীন শোষণের বিপদ আরও অধিককাল পুনরাবৃত্ত হইয়াই চলিতে থাকিবে ইহাই ছিল সুস্পষ্ট অবস্থা। কিন্তু ইহা আইন-শৃঙ্খলার নামেই চলিতেছিল। এই সকল অন্যায় ব্যতিক্রমগুলিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণের জন্য বহু অন্যায় ওজর পেশ করা হইয়াছে। খোদাদোহী অন্যায় দাবি এবং আরও অনেক কিছু ভবিষ্যৎকালে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকিবে।

এমনি করিয়া অবস্থাটি এমন একটি চূড়ায় লইয়া আসিয়াছিল যে, যে কেহ রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অথবা খেলাফতের ভার গ্রহণ করুক না কেন তাহাকেই অশিক্ষিত এবং অবাধ্য উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হওয়ার মত দুঃখজনক সংকটাবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। পশুটিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য সে উহার লাগাম জোরে টানিয়া ধরিলে উহার নাক কাটিয়া জখম করিয়া ফেলিবে এবং যদি উহাকে স্বাধীনভাবে চলিতে দেয় তবে পশুটি সওয়ারীসহ ধ্বংস এবং মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইয়া পড়িবে। আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি : জনগণকে বিপথে চালিত করিয়া বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। তাহারা ধর্মের সঠিক পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। অসম্ভব না হইয়া এবং (তাহাদের কর্মকাণ্ড হইতে) সরিয়া থাকিয়া আমি ভবিতব্যকে গ্রহণ করিয়া বেদনাদায়ক দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মৃত্যু পর্যন্ত ইহা ছিল মানবাধিকার এবং ধর্ম ধ্বংস করার কাল। কিন্তু সে তাহার মৃত্যুর পূর্বে খেলাফতের প্রশ্ন একটি পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর রাখিয়া গেল। এবং (যেহেতু সে নিজেই মনোনীত করিয়াছে তাই) সে মনে করিয়াছিল আমিও উক্ত কমিটির সদস্যরূপে তাহাদেরই একজন হইয়া থাকিব।

হে আল্লাহ! এই মনোনয়ন বোর্ড দ্বারা আমি কি করিব? (ইহার সদস্যদের কাহারও সঙ্গে আমার কোন বিষয়ে মিল হইবার মত কিছুই ছিল না)। প্রথম ব্যক্তির তুলনায় আমার প্রাধান্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে কখনও আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল কি? যাহার ফলে আমি এই পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করিতে যাইব? যেই পরিষদের ব্যক্তিগণ আমা হইতে বহু নিম্নমানের? কিন্তু মানবতা ও ধর্মের খাতিরে এই মনোনয়ন বোর্ডের পর্যায়ের সদস্য হইতে সম্মত হইয়াছিলাম। তাহাদের নিকট হইতে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য আমার নিজেকে তাহাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইয়াছিল; যেমন পূর্বেও আমি এইরূপ করিয়াছিলাম তাহাদের সময়ে, যাহারা ইহাদের চাইতে উন্নত ছিল।^১

এই কমিটির একজন সদস্য আমার বিরোধী হইয়া গেল, কারণ সে আমাকে অত্যন্ত হিংসা করিত (হজরত ইহা দ্বারা সাদ অথবা তালহাকে বুঝাইয়াছেন), অন্য জন (আবদুর রহমান ইবনে আউফ), তাহার ছিল স্পষ্ট গোত্রীয় কারণ। তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি কারণ ছিল—জগত তাহা পরে জানিতে পারিয়াছিল (সে ছিল ওসমানের বৈবাহিক সম্বন্ধের ভাই)। ফলতঃ তৃতীয় ব্যক্তিটি সগর্বে ব্যক্তিগত চারণভূমির মত খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। এবং সে তাহার গোত্রীয় (উমাইয়া গোত্রীয়) লোকদের লইয়া মোসলেম জাহানের সম্পদ এমন বেপরোয়াভাবে লুটিয়া খাইতে লাগিল যেমন পেটুক উট কর্তিত ঘাস গিলিয়া থাকে। যাহা হোক, এই লোকটির অকাল মৃত্যু হইল। এই গোত্রের লালসা তাহার বিফলতার কারণ হইল।

তাহার মৃত্যুর পর খেলাফতের ভার গ্রহণ করার অনুরোধ লইয়া লোকেরা আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহারা এমন অধিক সংখ্যায় ঘিরিয়া ধরিল এবং তাহাদের আন্তরিকতা প্রকাশে তাহারা এত অস্থির হইয়া উঠিল যে, উহাতে আমার পুত্রদ্বয় পদদলিত হওয়ার অবস্থায় পড়িয়াছিল এবং আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের শাসনভার এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য তাহারা সোজাসুজি আমার উপর জবরদস্তি চালাইতে লাগিল। আমি তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতাম কিন্তু আমি এই আশঙ্কা করিলাম যে, আমার প্রত্যাখ্যানের দ্বারা তাহারা সত্য এবং ধর্মের সংস্পর্শ সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিত।

১। নবী যেমন কোন সাহাবীর দলভুক্ত হইতে পারেন না, ইমামও তেমনই কোন সাহাবীর দলভুক্ত হইতে পারেন না। কাজেই মাওলার পক্ষে এইরূপ করা কত যে কষ্টকর হইয়াছিল তাহা আল্লাহ ও তাহার রাসুল ব্যতীত কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

কিন্তু আমি যখন তাহাদের শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করিলাম এবং আল্লাহর পথে তাহাদিগকে চালিত করিতে লাগিলাম, অর্থাৎ সেই একই পথ, যে পথে চলিবার জন্য রাসুলুল্লাহ (আ) তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তখন তাহারা বিদ্রোহ করিল। একদল (হজরত আয়েশার দল) আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করিল। দ্বিতীয় দল (খারিজী দল) ধর্মত্যাগী হইল এবং তৃতীয় দল সেই একই প্রকার ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করিল : শক্তি এবং সম্পদের লোভে তাহারা লোকদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অধীন করিবার জন্য অত্যাচার শুরু করিয়া দিল যাহা হইল তাহাদের শাসন পদ্ধতির একটি অঙ্গ।

তিনটি দলই এমন ব্যবহার করিল যেন তাহারা কোরানের এই বাণী কখনও শুনে নাই, “স্বর্গ তাহাদের জন্যই যাহারা নির্লোভ, ভাঙ্গন সৃষ্টি করে না দলের মধ্যে এবং অত্যাচার করে না কোন মানুষকে। চির সুখ-শান্তি তাহাদের জন্য যাহারা ধর্মীয় এবং পবিত্র জীবন যাপন করে।” আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি তাহাদিগকে আল্লাহর এই কথাগুলি বার বার শুনাইয়াছিলাম এবং তাহার অর্থও পরিষ্কারভাবে তাহাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়াছিলাম। কিন্তু ধর্মহীন জীবনের পক্ষিল পথ, উহার জাঁকজমক ও বিলাসিতা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। উহার ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ করিয়াছিল তাহাদিগকে উল্লসিত (বা সম্মোহিত)।

আমি বিশ্বস্রষ্টার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তাহারা যদি আমার নিকট বিনাশর্তে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ না করিত, তাহারা যদি আমাকে শাসন কর্তারূপে গ্রহণ করতে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করিত, উপস্থিত সাহায্যকারী এবং সমর্থকগণ যদি আমাকে ধর্ম রক্ষার কর্তব্য ন্যস্ত করিয়া কর্তব্য পালনে আমাকে বাধ্য না করিত, এবং যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’লা অত্যাচারী এবং নির্যাতনকারীর পাপ-পক্ষিল জীবনের বিলাসিতার প্রতিরোধ করিবার জন্য ধর্মবিজ্ঞানীদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করিতেন, এবং অত্যাচারিত এবং পদদলিত দরিদ্রের দুঃখ নিরসনের চেষ্টা করিতে না বলিতেন, এবং যদি তিনি শক্তিশালী ক্ষমতাবানদের নিকট হইতে দুর্বলদিগের হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে নির্দেশ না করিতেন তাহা হইলে আজও আমি এই রাষ্ট্র শাসকের পদ ত্যাগ করিতাম এবং প্রথম দিকে যেমন করিয়াছিলাম তেমনই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে দিতাম। পাপ-পক্ষিল জীবনের জাঁকজমক আমার নিকট ছাগলের একটি হাঁচি হইতেও তুচ্ছতর।

KHUTBA-20

Most of the commentators regard this khutba as the first to be delivered by Hazrat on the occasion when the people flocked round him to induce him to accept the rulership of the Islamic state after the death of Caliph Osman. In it Hazrat has advised the people as what to expect; the cruel times ahead, minority of the followers of truth and justice: perils, disasters and death which they will have to face; and the ascendancy of vice over virtue and falsehood over truth.

I hold myself responsible for what I say and I guarantee the truth of my assertions. Those who remember well the hardships, trials and distresses of the early days of Islam and those who can correctly anticipate and foresee the cruel times ahead-times fraught with uncertainties, perils and disasters to them fear of God can restrain from rashly and nervously doubting the teachings of Islam and can help to stand up to unknown and undreamt of ordeals in the way of accepting the principles of truth and justice.

Beware that you are being spiritually tried at this hour and you will find hardships, perils and calamities appearing in the same forms as befell upon you at the time when God first ordered our Holy Prophet (A.S) to deliver His Message and to propagate Islam.

I swear by Him who appointed Mohammed (A.S) as His Messenger and as an apostle worthy of His Trust that the existing order and form of your society will be subjected to satanical destruction, its major parts will be vehemently disturbed and its various sections will be violently mixed up, till the lowest and the meanest amongst you will find themselves in lofty places, and exalted persons will find themselves humiliated and persecuted.

those who from the time of the rise of Islam were very advanced in the service of religion will be pushed back, and those hypocrites who then had been lagging behind and waiting for favorable opportunities will be raised to proud ranks.

I swear by God that I do not keep back anything which deserve disclosure and I have never spoken a lie. Believe me when I tell you that the developments of the grim events ending in the present situation and happenings of the day have long ago been revealed to me.

Remember that sins are unmanageable and rebellious stallions ridden by sinners having no hold on the bridles, and these uncontrollable beasts are rushing along with their riders madly towards the hell; while fear of God is like trained and submissive horses under full control of their riders pacing with fast but gentle steps towards the Heaven.

Remember that there are two ways of life, the right and the wrong. And there are two kinds of people: those who follow the right path and those who adopt the wrong ways. If you find the evil doers in majority or in ascendancy and followers of religion and truth in minority and downtrodden, a world full of apparent contradictions, do not feel surprised or disappointed; it has often happened like that. But truth and justice will conquer in the end, though it may not appear possible that those fallen low will ever rise to great heights.

বঙ্গানুবাদ ৪

খোৎবা-২০

খলিফা ওসমানের মৃত্যুর পর মোসলেম রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত (বা বাধ্য) করিবার জন্য লোকেরা যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল তখনকার খোৎবার মধ্যে ইহাই হযরতের সর্বপ্রথম খোৎবা বলিয়া টীকাকারগণ (ভাষ্যকারগণ) মনে করেন। ভবিষ্যতের কি আশা করা যাইতে পারে তাহার উপর হজরত ইহাতে জনগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সম্মুখে অতি নির্মম সময় আসিতেছে, সত্য এবং সুবিচার অনুসরণকারীর সংখ্যা হইতেছে অল্প, বিপদ, ধ্বংস এবং মৃত্যুর মোকাবিলা তাহাদিগকে করিতে হইবে; পুণ্যের উপরে পাপ এবং সত্যের উপর মিথ্যার রাজত্ব হইবে।

আমি যাহা বলিতেছি তাহার উপর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই বলিতেছি। আমার ঘোষণা যে সত্য, তাহা দৃঢ়তার সহিত নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি। ইসলামের প্রাথমিক যুগের দুঃখকষ্ট, পরীক্ষা এবং বিপদের কথা যাহাদের ভালভাবে মনে আছে; এবং যাহারা সঠিক পূর্ব ধারণা করিতে পারে এবং নিষ্ঠুর আগামী দিনগুলির ভবিষ্যত দেখিতে পারে তাহারা দেখিবে যে, ভবিষ্যতের দিনগুলি অনিশ্চয়তা, বিপদ এবং ধ্বংসে পরিপূর্ণ। তাহাদের খোদাভীতি তাহাদিগকে বিপদের মুখে ও স্নায়বিক দুর্বলতায় অভিভূত হইয়া ইসলামের সত্য শিক্ষার উপর সন্দেহের বেসামাল ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইতে বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে। এবং (তাহাদের এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি) তাহাদিগকে সত্য ও ন্যায়নীতি গ্রহণ করিবার পথে অজানা অগ্নি পরীক্ষায় দাঁড়াইতে সাহায্যে করিতে পারিবে।

সাবধান! তোমাদিগকে আত্মিকভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে। তোমরা একই প্রকার দুঃখ-বিপদের কঠোরতার সম্মুখীন হইবে যেইরূপ দুঃখ-বিপদ রাসুলের সময় তোমাদের উপর পতিত হইয়াছিল, প্রথম যখন আল্লাহ আমাদের রাসুলান্নাহকে (আ) তাঁহার বাণী এবং ইসলাম প্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন।

যিনি মোহাম্মদকে (আ) নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহার নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিরূপে, আমি তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদের সামাজিক নিয়ম-কানূনের বর্তমান রূপটি, শয়তানী ধ্বংসলীলার অধীন হইয়া পড়িবে। ইহার বেশিরভাগ প্রচণ্ডভাবে বিশৃঙ্খলিত হইয়া পড়িবে। ইহার (অর্থাৎ

সমাজের) বিভিন্ন প্রকার দলগুলি প্রচণ্ডভাবে (অর্থাৎ বল প্রয়োগের দ্বারা) মিশিয়া যাইতে থাকিবে। অবশেষে তোমাদের মধ্যে যাহারা নিম্নতম এবং হীনতম প্রকৃতির লোক তাহারা উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হইবে এবং মহান ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইবে যে, তাহারা অপমানিত এবং নির্যাতিত হইতেছেন। ইসলামের অভ্যুত্থানকালে যাহারা ধর্মের খেদমতে অত্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলেন তাহাদিগকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলা হইবে এবং সেইসব মোনাফেকগণ যাহারা তখন পশ্চাদপদ ছিল এবং অনুকূল সুযোগের সন্ধানে ছিল তাহাদিগকে উচ্চ মর্যাদাশীল পদে উন্নীত করা হইবে।

আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি : প্রকাশযোগ্য কোন বিষয় আমি লুকাইয়া রাখি না এবং আমি মিথ্যা কখনও বলি নাই। আমায় বিশ্বাস করিও যখন আমি তোমাদিগকে বলি যে, ভয়ানক ঘটনাসমূহের ক্রমবর্ধন, যাহা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পরিণত হইয়াছে এবং এখনকার ঘটনাবলীর বিষয় সকলই বহু পূর্বেই আমার নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল।

মনে রাখিও, পাপ হইল (যেন) অপরিচালনীয় অবাধ্য ঘোড়া, যাহাদের উপর পাপীরা আরোহণ করিয়া থাকে, যাহার লাগামের উপর তাহাদের কোন হাত নাই এবং এই অদম্য পশুগুলি তাহাদের আরোহীকে লইয়া পাগলের মত জাহান্নামের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অপরপক্ষে, আল্লাহ-ভীতি হইল শিক্ষিত এবং বাধ্য ঘোড়ার মত, আরোহীর পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকিয়া দ্রুতগতি কিন্তু শান্ত পদক্ষেপে জান্নাতের দিকে চলিতে থাকে।

মনে রাখিও, জীবনের গতিপথ দুইটি : সঠিক এবং বেঠিক। এবং মানুষ হইল, দুই প্রকার : সৎপথ অবলম্বনকারী এবং অসৎপথ অবলম্বনকারী। যদি তোমরা অন্যায়কারীর সংখ্যা অধিক দেখ অথবা তাহাদিগকে কর্তৃত্বের মধ্যে দেখিতে পাও; এবং ধর্ম ও সত্যের অনুসারীগণকে সংখ্যালঘু অথবা পদদলিত দেখিতে পাও, যদি দেখিতে পাও স্পষ্ট আত্মবিরোধীতায় জগত পরিপূর্ণ, তবে আশ্চর্য অথবা হতাশ হইও না, প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া চলিতেছে। সত্য ও ন্যায় বিচার পরিণামে জয়ী হইবে—যদিও ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না যে, যাহারা নীচে পড়িয়া গিয়াছে তাহারা আর কখনও মহান উচ্চে উঠিতে পারিবে।

KHUTBA-46

Hazrat has given reasons why he does not appreciate diplomacy and deceit. His teaching is that end and means both should be above every kind of vice and wickedness, He says that he knows how to cheat, how to dissimulate or how to be diplomatic and he has power and command over ways to do it, but fear of God restrains him, Therefore, the guiding factor of your life should not be success but "fear of God."

SINCERITY AND OBSERVATION OF FAITH

Faithfulness is, in fact a human attribute akin to truth and veracity, and I know of no better protection to mankind from evil and harm.

One who believes in life hereafter will never resort to deception and duplicity. But unfortunately we are passing through times when majority of worldly people think that hypocrisy means wisdom and they lead the uneducated masses to believe that dissimulation is the best form of sagacity.

I have enough knowledge and wisdom to know what diplomacy and dissimulation mean and have enough aptitude and authority to make use of them but before me are commands and interdictions of God the Almighty which protect me from sin; yet a man who has no respect for religion jumps at every opportunity to profit through deceit, dissimulation and diplomacy.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-৪৬

হজরত কেন কূটনীতি এবং প্রতারণার তারিফ করেন না (অর্থাৎ ইহা তিনি পছন্দ করেন না) তাহার কারণ তিনি দিয়াছেন। তাহার শিক্ষা হইল :

পরিণতি এবং উপায় এই উভয় থাকিবে সর্বপ্রকার পাপ এবং ধূর্তামির উর্ধ্বে। তিনি বলেন : কেমন করিয়া প্রতারণা করিতে হয়, কেমন করিয়া কপটতা বা ভান করিতে হয় অথবা কূটনৈতিক হইতে হয়, তাহা তিনি জানেন এবং ইহা করিবার পদ্ধতির উপর তাহার শক্তি এবং অধিকার আছে, কিন্তু আল্লাহ তীতি তাহাকে (ঐরূপ করিতে) বাধা দেয়। সুতরাং 'বিজয়' তোমাদের জীবন পরিচালনার উদ্দীপনাদাতা না হইয়া 'আল্লাহ তীতি' হওয়া উচিত।

অকপটতা এবং ঈমান পালন করা : প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্ততা হইল মানবীয় একটি গুণ (সেফাত) যাহা সত্য এবং সত্যনিষ্ঠার সমগোত্রীয়, এবং আমার জানা নাই, মন্দ ও অপকার হইতে অন্য কোন উত্তম আশ্রয় মানুষের আছে কি না।

যে ব্যক্তি পরকালের জীবনে বিশ্বাসী সে কখনও প্রতারণা ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা যে সময় অতিক্রম করিতেছি মোনাফেকীকেই অধিকাংশ দুনিয়াবাসী বুদ্ধিমত্তা বলিয়া মনে করে এবং তাহারা তাহাদের পরিচালনা দ্বারা অশিক্ষিত জনগণের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছে যে, প্রতারণাই হইল বিচক্ষণতার আসল রূপ।

কূটনীতি এবং কপটতা বলিতে কি বুঝায় তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি ও জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে, এবং উহা ব্যবহারে লাগাইবার স্বাভাবিক যোগ্যতা এবং ক্ষমতাও আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমার সম্মুখে রহিয়াছে আল্লাহ তা'লার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা যাহা আমাকে পাপ হইতে সুরক্ষিত রাখে। তথাপি ধর্মের জন্য যে মানুষটির (অর্থাৎ মাবিয়ার) কোন শ্রদ্ধা নাই সেই মানুষ প্রতারণা, কপটতা ও কূটনীতির মাধ্যমে প্রতিটি সুযোগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

KHUTBA-59

Just before the battle of siffeen Hazrat was trying his best to abstain from the war and the resulting bloodshed but Moavia was keen to measure his army's strength with that of the army of Hazrat and on the side of Hazrat not only the officers but rank and file of his army were also so anxious for an all out encounter with the enemy that they madly crowded round him beseeching his

permission for a strife, on that occasion Hazrat delivered the following khutba.

These people crowded round me like thirsty camels crowding round a watering place when released for drink. they were anxiously and repeatedly demanding my permission for the battle till I became apprehensive lest either they may try to kill me or start fighting amongst themselves and killing each other. I fully considered over the apparent and inherent consequences of a war and came to the conclusion that only two alternatives were left for me: either to fight the rebles or to forsake the teachings of the Holy Prophet (A.S). I adopted the first course because I felt that it was wiser than to face punishment in the next. and that death to end this life was far better than eternal damnation.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-৫৯

সিফফিনের লড়াইয়ে পূর্বক্ষেণে যুদ্ধ এবং উহার রক্তপাত হইতে বিরত থাকার জন্য হযরত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাবিয়া তাহার আপন সেনাবাহিনীর শক্তি হযরতের সেনাবাহিনীর শক্তির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এদিকে হযরতের পক্ষীয়, শুধু অফিসারগণই নহে, সাধারণ সৈন্যগণ শত্রুর সঙ্গে পূর্ণ মোকাবিলার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা তাহাকে পাগলের মত চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। সংঘর্ষ শুরু করার অনুমতি লাভের জন্য সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত এই খোৎবা দিয়াছিলেন।

তৃষ্ণার্ত উটদিগকে জলপানের জন্য ছাড়িয়া দিলে তাহারা যেমন জলাশয়ের চারিদিকে ভিড় করিয়া থাকে এই লোকেরাও তেমনইভাবে আমার চারিদিকে ভিড় করিয়াছিল। তাহারা বার বার ব্যস্তভাবে আমার নিকট হইতে যুদ্ধের অনুমতি দাবি করিতে লাগিল। ইহা এতদূর গড়াইল যে, অবশেষে আমি শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম, হয় তাহারা আমাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবে নতুবা পরস্পর হানাহানি করিয়া নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু করিয়া দিবে। যুদ্ধের

বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ফলাফলের উপর পূর্ণভাবে বিবেচনা করিলাম এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আমার নিকট মাত্র দুইটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে : হয় বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধ করা, নয়তো রাসুলের শিক্ষা ত্যাগ করা। আমি প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করিলাম, কারণ আমি অনুভব করিলাম পরকালের শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে ইহাই উত্তম। মৃত্যু দ্বারা জীবনের অবসান করা চিরন্তন অভিশাপ হইতে শ্রেয়।

KHUTBA-60

Hazrat was always averse to shed human blood and with this reason in view he was delaying to commence the battle in siffeen. Contrary to this his companions were very anxious for a fight and getting tired of the delay they started saying that he was felling nervous and timid. He replied them in the following words.

It is not right for you to say that I am hesitating to start the war because I am afraid of death. I bear God as my witness that I never cared whether I approach death or death approaches me; and you are equally wrong to say that my delaying the war is due to the fact that I am not fully convinced of the righteousness of my cause and falsity of the claims of Moavia and his Assyrian hordes. By God I never delayed war even for a day but with the hope that some of the rebels may come back to me and through me they may be guided towards religion and seeking the Divine light may try to illuminate their lives with it. I like this better than massacring them or leaving them in darkness of sin and vice, because their present condition of faith is such that even death is not going to bring them peace and comfort.

বঙ্গানুবাদ :

খোত্বা-৬০

মানুষের রক্তপাত করিতে হযরত সব সময় অনিচ্ছুক থাকিতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি সিফফিনের মাঠে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। এই মতের বিপক্ষে (অর্থাৎ বিলম্ব করার বিপক্ষে) তাহার অনুচরগণ যুদ্ধ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। বিলম্বে অস্থির হইয়া তাহারা বলিতে শুরু করিল যে, তিনি নাকি স্নায়ুবিক দুর্বলতা এবং ভীর্ণতা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত কথায় তাহাদিগকে ইহার জবাব দান করিলেন :

আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি এই কথা তোমাদের বলা ঠিক নহে। আল্লাহকে আমি সাক্ষীরূপে বহন করিয়া বলিতেছি যে, আমি মৃত্যুর দিকে ছুটিয়া যাই, অথবা মৃত্যু আমার দিকে ছুটিয়া আসে সেই পরোয়া আমি কখনও করি নাই। ইহাতেও সমান ভুল করিবে যদি বল : যুদ্ধ শুরু করিতে আমি এইজন্য বিলম্ব করিতেছি যে, আমার পক্ষের ন্যায়সঙ্গত কারণের উপর এবং মাযিয়া ও তাহার এশিরীয় দলের দাবি যে প্রকৃতই মিথ্যা তাহার উপর আমি সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান নই। শপথ আল্লাহর, আমি একটি দিনের জন্যও এই আশা ব্যতীত যুদ্ধ করা বিলম্ব করি নাই যে, বিদ্রোহীদের কিছু লোক আমার পক্ষে ফিরিয়া চলিয়া আসিতেও পারে এবং আমা দ্বারা তাহারা ধর্মপথে পরিচালিত হইয়া স্বর্গীয় আলোর সন্ধান করিয়া উহাতে জীবন আলোকিত করিবার চেষ্টা করিতেও পারে। তাহাদিগকে ধ্বংস করা কিংবা পাপ ও অপরাধের অন্ধকারে ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা ইহা আমি অধিক পছন্দ করি; এর কারণ, তাহাদের ধর্মের বর্তমান অবস্থা এমন যে, মৃত্যুও তাহাদিগকে সুখ-শান্তি আনিয়া দিতে পারিবে না।

KHUTBA-16

After the battle of Basra one of the Arabs came and congratulated Hazrat on this success wishing that his brother was also present there to witness the victory. Hazrat asked him whether his brother was friend and follower of Hazrat, and getting the reply in affirmative he said:

"Then he was with us, was in our army, not only he but even those of our friends and followers who are yet to be born in times to come were with me in this battle and in them the true Islam will find its power."

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-১৬

বসরার যুদ্ধের পর একজন আরব হযরতের নিকট আসিয়া এই বিজয়ের জন্য তাঁহাকে মোবারকবাদ জানাইল এবং ইহাও জানাইল যে, তাহার ভাই এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিলে সেও এই বিজয় প্রত্যক্ষ করিতে পারিত, এইরূপ আশাব্যঞ্জক কথা সে ব্যক্ত করিতেছিল। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার ভাই হযরতের মিত্রপক্ষীয় একজন অনুসারী কি-না? ইহার হ্যাঁ-বাচক জবাব শুনিয়া হযরত বলিলেন :

তবে তো সে আমাদের সঙ্গেই ছিল, আমাদের বাহিনীর মধ্যেই ছিল—কেবলমাত্র সে একাই নহে, বরং আমাদের মিত্র এবং অনুসারীগণ যাহারা এখনও জন্মায় নাই, ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারাও এই যুদ্ধে আমার সঙ্গে ছিল এবং খাঁটি ইসলাম তার শক্তির সন্ধান তাহাদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইবে।

মাওলা আলী ছিলেন অসীম ধৈর্যশীল। তিনি কেমন করিয়া একে একে তিনজন খলিফার অন্যায় রাজত্ব এবং ধর্মহীনতা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। ইহা আমাদেরও কল্পনার অতীত। খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মরিয়া যাওয়া ইহা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে ছিল সহজতর। আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুল যাহাকে ধর্ম এবং ধর্মীয় রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন তাঁহার চোখের সামনে অধর্ম ও অন্যায় রাজত্ব চলিতে থাকিলে ইহা অন্যান্য মোমিনের পক্ষে যত না বেদনাদায়ক তাহা হইতে হাজার গুণ বেদনাদায়ক হইয়াছিল আলীর (আ) জন্য, যেহেতু তিনি ছিলেন উক্ত কাজের ভারপ্রাপ্ত এবং মোমিনগণের জন্য অভিযুক্ত মাওলা। আলী (আ) চক্ষুশ্রাব্য ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। খেলাফতের কালের পাপ এবং বিভ্রান্তি পরবর্তীকালের অসীম অন্যায় ও ধর্মদ্রোহীতার যে সকল ভিত্তি রচনা করিতেছিল তাহা সত্য-দ্রষ্টা

মাওলার পক্ষে সহ্য করা কত যে কষ্টকর ছিল তাহা সাধারণ অন্ধ মানুষ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

ইসলামের রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি এবং অর্থনীতির ভিত্তিমূল একেবারে বিনষ্ট করিয়া নতুন অন্য আর একটি রূপ দেওয়া হইতে লাগিল যাহার কুফল তখনও সকলের চোখে পড়ে নাই, কিন্তু সর্বদ্রষ্টা আলী তাহা বুঝিতে পারিয়া যেভাবে অসহায় এবং মর্মান্বহত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তখন উপলব্ধি করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই ছিল। খেলাফত ইসলামের উপর ব্যাপক ও বিরাট একটি অপকীর্তি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু উন্মত্ত লুটেরা জনগণ ইহাকে একটি বিশেষ সুযোগরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাপক সমর্থন দিতে শুরু করিল। ইসলামের নীতির দিকে তাহাদের কোন পরোয়াই রহিল না। খেলাফতের রচিত নিয়মই তাহাদের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইল।

KHUTBA-222

About Quraish.

O God I seek Thy help and protection against Quraish. They have disregarded my relation with the Holy Prophet (A.S). and with them. They have tried to humiliate and insult me. They have united to fight against me for the right and place which I deserve more than they. They say that Caliphate is my right if I take it. But it is proper that I should be deprived of it. They tell me that either I should bear the loss and the grief patiently or may die sadly and sorrowfully.

Finding them in this mood I considered over the situation and found none but Ahley Baith (Progeny of the Holy Prophet) who would come to my help. But I did not like that they should be killed fighting against the enemy. I did not like to lose them. I patiently bore the insult and the injury. However bitter it was I drank the cup and however painful it was I allowed the dagger to pierce my breast.

(Syed Razi—may he rest in peace—the original compiler of these khutbas says that Hazrat has complained of Quraish on more than one occasion but the style and the way of expression is different in each sermon therefore he has carefully noted down as many of these sermons as he can find) A greater part of this speech is lost. What Syed Razi could get was the above passage and following sentences which are about the party of Talha and Zubair. Apparently Hazrat delivered this sermon before he went to Basra to fight Talha & Zubair.

They attacked the public treasury and the government officers who were appointed by me, and who were faithful and obedient to me. They created disunity and disloyalty among my officers and lured many of them away from the government side and when they found my side thus thinned and weakend they attacked it during my absence. Some of my followers were killed through treachery and deceit while others fought bravely, boldly and desperately and became martyrs.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা -২২২

(কোরেশদের বিষয়ে)

হে আল্লাহ! কোরাইশদের থেকে আমি তোমার নিকট সাহায্য এবং আশ্রয় ভিক্ষা করি। তাহারা আমার সঙ্গে রাসুলুল্লাহর সম্বন্ধের অমর্যাদা করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গে (রাসুলুল্লাহর সম্বন্ধের অমর্যাদা করিয়াছে) তাহারা আমাকে তাচ্ছিল্য এবং অপমান করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছে। সেই অধিকার লাভের জন্য যে অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে আমি তাহাদিগ হইতে অধিক যোগ্য। তাহারা বলে খেলাফত আমারই ন্যায়সঙ্গত অধিকার কিন্তু ইহা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইবে। তাহারা আমাকে বলে সৈর্য সহকারে ক্ষতি এবং দুঃখ

আমাকে সহ্য করিতে হইবে আর তাহা না করিলে দুঃখিত হইয়া দুঃখের মরণ মরিতে হইবে।

তাহাদিগকে এইরূপ মানসিক অবস্থায় দেখিয়া আমি পরিস্থিতি বিচার করিয়া দেখিলাম যে, “আহলে বাইত” ছাড়া কেহই আমাকে সাহায্য করিতে আসিবে না। কিন্তু তাহারা (অর্থাৎ রাসুল বংশীয়গণ) শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মরিয়া যাক ইহা আমি পছন্দ করিলাম না। তাহাদিগকে হারাইয়া ফেলা আমি পছন্দ করি নাই। এই অপমান ও বিনাশ ধৈর্যের সহিত আমি সহ্য করিয়াছিলাম। ইহা যতই বিষাক্ত হইয়া থাকুক আমি ইহার পেয়ালা পান করিয়াছিলাম এবং ইহা যতই বেদনাদায়ক হইয়া থাকুক আমি এই ছুরি আমার বুকে বিদ্ধ হইতে দিয়াছিলাম।

(এই খোৎবাগুলির আদি সংকলক সৈয়দ রাজি বলিয়াছেন যে, হযরত কোরেশদিগের বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগমূলক কথা উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু পদ্ধতি এবং বলার প্রকাশভঙ্গি উহাদের প্রত্যেকটিতে ভিন্নরূপ। তাই তিনি এই জাতীয় যতগুলি খোৎবা পাইয়াছেন, যত্ন সহকারে লিখিয়া রাখিয়াছেন।)

(এই খোৎবাটির বেশির ভাগ হারাইয়া গিয়াছে। সৈয়দ রাজি যতটুকু পাইয়াছেন তাহা হইল উপরে উল্লেখিত অংশ। এবং নিম্নোক্ত বাক্যগুলি হইল তালহা এবং জোবায়েরের দল সম্বন্ধে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হযরত এই খোৎবা দিয়াছিলেন তালহা এবং জোবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বসরা যাইবার পূর্বে।)

তাহারা পাবলিক ট্রেজারী আক্রমণ করিয়াছিল এবং আমার নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণকে আক্রমণ করিয়াছিল—তাহারা ছিল আমার প্রতি বিশ্বস্ত ও বাধ্যগত। আমার অফিসারদের মধ্যে তাহারা বিভেদ এবং অবাধ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের অনেককেই লোভ দেখাইয়া সরকার পক্ষের সমর্থন হইতে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। এবং এইরূপ করিয়া যখন দেখিতে পাইল আমার পক্ষ কমিয়া গিয়াছে এবং দুর্বল হইয়া গিয়াছে তখন তাহারা আমার অনুপস্থিতকালেই ইহা আক্রমণ করিল। বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণার সাহায্যে আমার কিছু অফিসারকে নিহত করিল। বাকী যাহারা রহিল তাহারা সাহসের সহিত এবং মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া গেল।

developed into tears and they flowed on his white beard. And in front of thousands of people gathered there to hear him he was not ashamed to weep for them and to mourn over their loss. The great soldier and the great orator could not continue his speech and wept like a bereaved woman, showing how tender was his heart and how dear and loving their memory. After a few moments Hazrat continued his sermon).

How sadly I feel the loss of those brothers of mine who read Quran and understood it. Who pondered deeply over their obligations and did their duties, who kept alive the traditions of the Holy Prophet (A.S) and fought stubbornly against innovations and when called upon to defend Islam who came forward willingly having complete faith in their leader and Imam and followed him faithfully.

(Hazrat then loudly proclaimed) Jihad, Jihad, Jihad. O creatures of God! Learn and beware that today I am mobilizing an army of volunteers to defend Islam, whoever wants to achieve the favour of God may step forward.

(Nauf says that more than forty thousand people gathered around Hazrat. He divided them into many divisions. The first division of ten thousand soldiers was given under the command of Imam Hussain, another division of the same strength under Quais Ibne Abbada, a third similar unit under Aboo Ayoob-e Ansary, a companion of the Holy Prophet, and many smaller units under other petty officers, He was thus organising a big force and had resolved to march towards Syria once again. The response to his call was marvelous people in thousands were gathering under his flag when within a week of the delivery of the above sermon Hazrat received the death blow from the sword of Ibne Muljim while Hazrat was kneeling in prayers in the mosque of Koofa.

This was the month of Ramazan. After his death the armies which had gathered around him dispersed and our conditions became that of a herd of goats who had no pastor and who are attacked by wolves on all sides.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা -১৮৭

(মধ্যাংশ)

ইমাম মেহেদী (আ) সম্বন্ধে নিম্নে যে উদ্ধৃতি আছে তাহা এই খোৎবার অংশ বলিয়াই মনে করা হয়। শেষ ইমাম-যিনি বিশ্বজগত শাসন করিতে আসিবেন তাহার বিষয় হযরত ইহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি হইবেন মানব জাতির প্রতিশ্রুত রক্ষক এবং বিশ্বরাজ্যের কল্যাণদাতা শাসনকর্তা।

বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা এবং চরম জ্ঞানের সাহায্যে তিনি নিজের আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবেন। এইসব সম্পদের উপর থাকিবে তাহার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে যে কত উচ্চত্তরের এবং তাহা কত সাবধানতার সহিত যে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা তিনি জ্ঞাত থাকিবেন। মানব জাতির ক্ষয়ক্ষতির মনোভাব হইতে তাহার অন্তর থাকিবে মুক্ত। তাহার এই রকম জ্ঞান (বিজ্ঞানের জ্ঞান) তাহার নিকট সম্বলস্বরূপ হইবে-যাহা অন্যেরা (তাহার পুনরাগমনের পূর্ব পর্যন্ত) অন্যায়ভাবে অধিকার করিয়াছিল-যাহার পুনরাধিকার এবং ব্যবহারের জন্য (তিনি) অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন।

প্রথমত, তিনি একজন অপরিচিতি, তুচ্ছ এবং দরিদ্র আগন্তকের মত থাকিবেন। ইসলামের অবস্থা তখন পরিশ্রান্ত উটের মত নিরাশ এবং অসহায় হইয়া পড়িবে যেন উহা মাথা নোয়াইয়া দিয়া লেজ নাড়িতেছে। এইরূপ অবস্থা হইতে শুরু করিয়া তিনি এই বিশ্বে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন। মানুষকে তাহার জীবনের সঠিক পথসমূহের সন্ধান দিবার জন্য আল্লাহর সদয় ইচ্ছার শেষ অভিব্যক্তি এবং প্রমাণ হইবেন তিনি।

(তৎপর হযরত খোৎবাটি নিম্নরূপে শেষ করিলেন)

হে জনগণ, আমি তোমাদিগকে তেমনইভাবে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াছি, যেমন নবীগণ তাঁহাদের অনুসারীদিগকে দিয়াছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়া পূর্বকালে নবীগণ যেমন যেমনভাবে উহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন আমিও তেমনইভাবে আল্লাহর ইচ্ছা বিশ্লেষণ করিয়া দিবার যে ভার আমার উপর অর্পিত ছিল তাহার সকলই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি। আমি তোমাদিগকে জীবনযাত্রার নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তোমরা আমার শিক্ষার প্রতি অল্পই মনোযোগ দিয়াছ। তারপর আমি বলপূর্বক তোমাদিগকে ইসলামী জীবন বিধানের দিকে হাঁকাইয়া নিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তোমরা সে সব গ্রহণ করিবার পরোয়াই কর নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করুক। তোমরা কি অন্য কোন নেতার (ইমামের) আশা করিতেছ। আল্লাহর পথের এই জাতীয় জীবন বিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তোমাদিগকে আল্লাহর পথে চালনা করার জন্য?

সাবধান! তোমরা স্বর্গীয় নির্দেশের সুযোগ গ্রহণ করা ত্যাগ করিয়াছ। এবং প্রাণ-ইসলামী ভাবধারা তোমাদের মনকে অভিভূত (বা দখল) করিয়া লইয়াছে।

তোমাদের মধ্যে আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ যাহারা এই দুনিয়া ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহারা পরকালের চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভের জন্যই জীবনের ক্ষণস্থায়ী এবং তুচ্ছ সুখ বিনিময় করিয়াছে। সফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাহারা শাহাদাত বরণ করিয়াছেন তাহাদের (কোন) ক্ষতি হইয়াছে এমন দেখাইয়া দিতে পার? আজ তাহারা আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু তাহাদের অবস্থা আমাদের হইতে অধিকতর সুখের। তাহারা যদি আজ জীবিত থাকিত তাহা হইলে আমাদের মত একইরূপ হতাশা, হীনতা, দুর্ভোগ এবং ফেৎনার মোকাবিলা করিতে হইত।

আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি তাহাদের পরিণতি হইয়াছে সুখের। তাহারা তাহাদের রবের নিকটে রহিয়াছে। তাহারা স্বর্গীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। লাঞ্ছনা, ফেৎনা এবং বিপদপূর্ণ জীবনের অবসানের পর তাহারা তাহাদের স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে নিজেদের লইয়া শান্তিতে রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে হারাইয়া আমরা দুঃখিত। তাহাদিগকে হারাইয়া আমরা তাহাদিগের অনুপস্থিতির ক্ষতি অনুভব করিতেছি। আহা! কোথায় আমার ভাইয়েরা যাহারা ধর্মীয় জীবন যাপন করিল এবং স্বল্পতার সৌরভের মধ্যে

জীবন ত্যাগ করিয়া গেল? আহা! কোথায় ইয়াসিরের পুত্র আম্মার? কোথায় ইবনে শেহান? আহা! কোথায় দুই শাহাদাতের অধিকারী খাজিমা? (রাসুল্লাহ হযরত খাজিমাকে “দুই শাহাদাতের অধিকারী” উপাধী দিয়াছিলেন) তাহাদের মত আরো, যাহারা ইসলামের জন্য বাঁচিতে ও মরিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, যাহারা পাপাচারী সীমা লঙ্ঘনকারীগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় প্রথম সারিভুক্ত ছিল।

(এই খোৎবার বর্ণনাকারী নাউফ বলেন : হযরত যখন এই সকল বন্ধু এবং অনুসারীগণের নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন তখন তাহাদের স্মৃতি তাঁহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ স্বচ্ছ ঈগল চক্ষুতে একটি ছবি জাগিয়া উঠিল এবং তাহা অশ্রুতে পরিণত হইয়া তাঁহার সাদা দাড়ির উপর গড়াইয়া পড়িল। উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতার সামনে তিনি তাহাদের জন্য কাঁদিতে এবং তাহাদিগকে হারাইয়া ফেলিবার বেদনায় বিলাপ করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। মহান সৈনিক এবং বক্তা আর কথা বলিতে পারিলেন না—শোকাতুর মেয়ে মানুষের মত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় যে কতখানি কোমল এবং তাহাদের স্মৃতি তাঁহার নিকট কত যে প্রিয় এবং মধুর তাহার প্রকাশ দেখা গেল। কিছুক্ষণ পর হযরত তাঁহার খোৎবা বলিয়া যাইতে লাগিলেন।)

আমার এইসব হারান ভাইদের স্মরণে কত যে দুঃখ অনুভব করি, যাহারা কোরান পাঠ করিত এবং বুঝিত, যাহারা তাহাদের কর্তব্য বিষয়াদির উপর গভীরভাবে মনোনিবেশ করিত এবং তাহাদের কর্তব্য পালন করিত, যাহারা রাসুলের (আ) সুন্যাহকে জীবন্ত রাখিয়াছিল এবং দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল বেদাতের বিরুদ্ধে, এবং যখন ইসলাম রক্ষার জন্য ডাকা হইত যাহারা স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া আসিত, তাহাদের নেতার উপর এবং ইসলামের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া এবং বিশ্বস্ততার সহিত তাহাকে অনুসরণ করিত।

(তারপর হযরত উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করিলেন) জেহাদ, জেহাদ, জেহাদ। হে আল্লাহর জনগণ, জানিয়া রাখ এবং সজাগ থাক যে, ইসলাম রক্ষার জন্য আমি একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন করিতেছি। যে কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জন করিতে ইচ্ছা রাখে অগ্রসর হইতে পারে। (নাউফ বলেন : ৪০ হাজারেরও বেশি লোক হযরতের নিকট সমবেত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করিলেন। হযরত ইমাম হোসাইনের (আ)

অধীনে দেওয়া হইল ১০ হাজার সৈন্যের প্রথম ডিভিশন। সমপরিমাণ সৈন্যের আর একটি ডিভিশন দেওয়া হইল কায়েশ ইবনে আব্বাদার অধীনে। তদরূপ তৃতীয় একটি বাহিনী দেওয়া হইল রাসুলের একজন সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারীর অধীনে। এবং অনেক ছোট ছোট বাহিনী ছোট অফিসারদের অধীনে দেওয়া হইল। এইরূপে তিনি একটি বিরাট বাহিনী সংগঠন করিতেছিলেন এবং আর একবার সিরিয়া অভিযানের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ডাকে চমৎকার সাড়া পড়িয়াছিল। হাজারে হাজারে লোক তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হইতে লাগিল। এমন সময় উক্ত খোৎবা দানের এক সপ্তাহের মধ্যে হযরত যখন কুফার মসজিদে সালাতের রুকু অবস্থায় ছিলেন তখন ইবনে মলজিমের তরবারির মরণ আঘাত খাইলেন। ইহা ছিল রমজান মাস। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল বাহিনী সমবেত হইয়াছিল তাহা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং আমাদের অবস্থা ছাগলের একটি দলের মত হইয়া গেল, যাহাদের নাই কোন চারণভূমি এবং যাহারা চারিদিক হইতে নেকড়ে বাঘের দ্বারা আক্রান্ত।)

KHUTBA-153

In this sermon there is a Prophecy about the future and about the twelfth Imam of the Progeny of the Holy Prophet (A.S)

These are the people who having given up the straight path of religion are wandering in the wilderness of error and delusion. Do not make haste in inviting the future nor try to put it off; wait for it, it is inevitable and is bound to come. There are many people who often eagerly desire for something and when it reaches them, they wish that it had not come at all. Today is so near tomorrow (that it is not necessary either to wish for it or try to avoid it). The future is the inevitable result of the present and is inseparably connected with it.

O people! remember that the present time is the time when something which has been promised will happen and event which you do not know or cannot foresee or forecast will take place.

During the days of trials and temptations those who recognise the significance and worth of Ahl-bait (Progeny of the Holy Prophet, may the peace of God be upon him and his descendants) will, like a person walking in the dark with a lamp in his hand, not only go safely through the times, but will be of help to others and will act like pious people. This will continue till the true Imam of the time will clear the doubts created by heresy & schism. will free the people from oppression and tyranny will educate the ill-informed and ignorant. will introduce reforms in the society and will cement the gaps which wickedness and impiety may have created in the true teaching of Islam. For sometime he will be hidden from the eyes of man in such a way that the greatest searcher of the day will not be able to find a trace of him however he may try. But when he will appear, he will educate mankind in such a way that human will expand through the teaching of the Quran, men will be able to acquire true wisdom and then minds will be able to rise to higher planes of science and philosophy.

Nahj-ul-Balagha. page No. 112- sermons of Hazrat Ali, by Syed Mohd. Askari Jafry.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-১৫৩

এই ভাষণে অনাগতকাল সম্বন্ধে এবং রাসুল বংশের ১২নং ইমাম সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে।

ঐ সকল লোকেরা ধর্মের সঠিক পথ ত্যাগ করিয়া ভুল এবং বিভ্রান্তির বিজনভূমিতে পথ হারাইয়া ঘুরিতেছে। ভবিষ্যতের আগমন অবশ্যস্বাবী, উহা আসিবেই, উহার জন্য অপেক্ষা কর, উহাকে দূরে সরাইয়া রাখিও না এবং উহার জন্য ত্বরাও করিও না। এমন অনেক লোক আছে যাহারা কোন কিছু জন্য ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা রাখে, কিন্তু যখন উহা তাহাদের নিকটে আসে তখন তাহারা ইচ্ছা করে যে, উহা একেবারে না আসাই ভাল ছিল। আগামী দিনি

আজকের এত নিকটে। (উহার জন্য চাহিদা থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং উহা এড়াইবার চেষ্টা করারও প্রয়োজন নাই)। ভবিষ্যৎ বর্তমানের অপরিহার্য প্রতিফল এবং ইহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

হে লোকসকল, মনে রাখিও যে, এই বর্তমান সময়টি এমন একটি সময়, যাহা ইহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া রহিয়াছে তাহা ঘটিবে; এমন সব ঘটনা ঘটিবে যাহা তোমরা জান না অথবা যাহা ঘটিবার পূর্বে তোমরা জানিতে পারিবে না অথবা পূর্বাভাস দিতেও পারিবে না। ফেৎনা এবং প্রলোভনের যুগসমূহে যাহারা আহলে বাইতের গুরুত্ব এবং যোগ্যতা মানিয়া লইবে তাহারা অন্ধকারে প্রদীপ হাতে ব্যক্তির ন্যায় নিরাপদে কাল অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে। তাহারা হইবে অন্যদের জন্যও সহায়ক এবং তাহারা ধার্মিক লোকের ন্যায় কাজ করিতে পারিবে। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিবে, তারপর যুগের সত্যিকার ইমাম আসিয়া ধর্মদ্রোহিতা এবং ফেরকা-বন্দির সৃষ্ট সকল সন্দেহ দূর করিয়া অত্যাচার এবং নির্যাতন হইতে মানুষকে মুক্ত করিবেন, কুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতগণকে শিক্ষা দিবেন, সমাজ সংস্কার আনয়ন করিবেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে ধৃষ্টতা এবং অধার্মিকতার সৃষ্ট সকল শূন্যতা পূরণ করিবেন। কিছুকাল তিনি মানব চক্ষুর অন্তরালে এমনভাবে লুকাইয়া থাকিবেন যে, তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ধানকারীও তাঁহার সন্ধান করিতে পারিবে না, যতই সে চেষ্টা করুক। কিন্তু যখন তিনি আবির্ভূত হইবেন মানুষকে এমনভাবে শিক্ষা দিবেন যে, কোরানের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হইবে, মানুষ সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবে এবং তাহাদের মন উচ্চতর বিজ্ঞান এবং দর্শনের স্তরে উন্নীত হইতে পারিবে।

KHUTBA-154

Something about those who opposed Islam during the days of the Holy Prophet (may the peace of God be upon him and his descendants) and those who turned apostates after him, and about his companions who nobly and bravely suffered with him.

The sway of tyrants was long. So that their tyranny and oppression could be fully exposed and their infamy and disgrace

could be disclosed. They deserved the revolution which over took them. They were destroyed and annihilated and the people were rescued from calamities and destruction and were relieved of war and bloodshed which were brought about by the tyrants. The pious people, who bravely passed through those days, patiently bore the suffering and gave their lives for the cause of justice and Islam. They humbled themselves before God, they never for a moment magnified their patience and bravery and never imagined that they were obliging God and His religion. Then God ordained that the time of trials and afflictions should come to an end. They were given permission to defend their faith with the help of their swords and they obeyed the orders of God according to the teaching of the Holy Prophet (may the peace of God be upon him and his descendants).

Things continued like that till God called the Holy Prophet (may peace of God upon him and his descendants) back. Then many became apostate and turned towards heathenism, they were damned by the perversity of their minds and way-wardness. They put faith in their relatives who were misguided or instigators who were heathens. They discarded the medium (the progeny of the Holy Prophet (A.S) whom they were ordered to love, to respect and to follow and who would have kept them within the limits of the true religion. Thus they undermined the foundation of the true religion and tried to introduce schism and heresy in Islam. They became mines and fountain heads of sins, and sources of all vices. they were wayward and drunk with power, arrogance and wickedness. They adopted the ways of pharoas and his people, were attached to worldly power and pleasure and drifted away from the true religion.

-Page No. 112 of Nahj-ul-Balagha of Hazrat Ali by Syed Mohd. Askari Jafry.

বঙ্গানুবাদ :

খোত্বা -১৫৪

(নবী পাকের সময়ের কিছু বিষয় এবং তাঁহার যে সকল সাহাবীগণ মর্যাদা ও নির্ভীকতার সহিত তাঁহার সঙ্গে দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন তাহাদের বিষয় এবং তাঁহার এতেকালের পর যাহারা ধর্মত্যাগী হইয়াছিল তাহাদের বিষয়ে কিছু বয়ান)

স্বচ্ছাচারী শাসকদের প্রভাব দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের নির্যাতন ও অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল এবং তাহাদের কুখ্যাতি এবং লজ্জা উন্মুক্ত হইতে পারিয়াছিল। যে বিপ্লব তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছিল তাহা ছিল তাহাদের প্রাপ্য। তাহারা ধ্বংস হইয়াছিল এবং পরাভূত হইয়াছিল এবং জনগণ বিপদ ও ধ্বংস হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অত্যাচারী শাসকগণ যে যুদ্ধ এবং রক্তপাত আনয়ন করিয়াছিল তাহা হইতে জনগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিল। যে সকল ধর্মিক লোকেরা নির্ভীকতার সহিত ঐ সকল যুগ অতিক্রম করিয়াছে তাহারা বিশেষভাবে দুঃখের বোঝা বহন করিয়াছে এবং ন্যায় ও ইসলামের জন্য জীবনপাত করিয়াছে। তাহারা নিজদিগকে আল্লাহর নিকট প্রণত করিয়াছিল। তাহারা মুহূর্তের জন্যও নিজেদের ধৈর্য এবং নির্ভীকতাকে বড় করিয়া দেখায় নাই এবং কখনও এইরূপ মনে করে নাই যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার ধর্মকেই ধন্য করিয়াছে।

তারপর আল্লাহ পরীক্ষা এবং উৎপীড়নের যুগ শেষ হওয়ার নির্দেশ দান করিলেন। তরবারির সাহায্যে ধর্ম রক্ষার অনুমতি তাহাদিগকে দান করিলেন এবং তাহারা রাসুলের (তাঁহার উপরে এবং তাঁহার বংশের উপরে আল্লাহর সালাত হউক) শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহর আদেশ পালন করিল।

রাসুলাল্লাহকে (আ) ডাকিয়া (পরপারে) ফেরত লইয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিষয়াদি এইভাবেই চলিতেছিল। তারপর (অর্থাৎ তাঁহার পরলোকগমনের পর) অনেকেই ধর্মদ্রোহী হইয়া গেল এবং অধর্মিকতার দিকে ফিরিয়া গেল। মনের বিকৃতি এবং একগুঁয়েমি দ্বারা তাহারা (সত্য হইতে) বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রহিল। তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিল তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর যাহারা

ছিল অধর্মিক, বিপথে চালিত অথবা কুপ্ররোচনা দাতা। তাহারা মাধ্যমকে (অর্থাৎ রাসুলের বংশধরগণকে) প্রত্যাখ্যান করিল—যাহাদিগকে ভালবাসিতে, সম্মান এবং অনুসরণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহারা তাহাদিগকে সত্য ধর্মের সীমার মধ্যে রাখিতে পারিত (তাহাদিগকে করিল প্রত্যাখ্যান)। এইরূপে তাহারা সত্য ধর্মের ভিত্তির গোড়া কাটিয়া দিয়াছিল এবং ইসলামে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা পাপের খনি এবং উৎসমুখ হইয়াছিল এবং সকল অপরাধের উৎস হইয়াছিল। তাহারা ছিল একগুঁয়ে এবং মত্ত হইয়াছিল ক্ষমতা ঔদ্ধত্য এবং ধূর্তামিতে। তাহারা ফেরাউন ও তাহার দলবলের পথ অবলম্বন করিয়াছিল, আকৃষ্ট হইয়াছিল দুনিয়ার ক্ষমতা এবং সুখের দিকে এবং সত্য ধর্ম হইতে দূরে ভাসিয়া যাইতেছিল।

KHUTBA-4

(Last two para)

When the Holy Prophet (A.S) first started preaching Islam, society was in such a sinful state that no true form of religion was followed, convictions and believes about truth and justice were disrespected, basic principles of life had become very divergent; commands of God were set at naught; a way out of this vicious chaos seemed impossible, and the road to the realm of God appeared closed.

Conditions have now taken a similar turn, teachings of the true religion are forgotten, blind faith is the order of the day; commands of the God are disobeyed; the satan is appreciated and religion is ignored in such a way that its tenets are falling apart, its dogmas are being altered, its precepts are being effaced and eclipsed, and its paths are decaying. Satan is being obeyed, its ways are being followed; and it is filling their minds with satanic ideas, these ideas have become its army and are raising its standard to promote vicious and sinful disorders. The slaves of

satan in their turn have become masters of situation crushing the society, subjugating everybody, and holding the country under its way. The masses, being uneducated, have fallen easy prey and are now standing confused. Such is the condition of the best country of the world which is now populated with the worst type of human beings, who waste their working hours and weep over the losses, it is a country where the learned have to keep their mouths tight shut and where un-educated and ignorants rule.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-৪

(শেষ দুই প্যারা)

রাসুলুল্লাহ যখন প্রথম ইসলাম প্রচার শুরু করেন সমাজ তখন এত পাপপূর্ণ অবস্থায় ছিল যে, ধর্মের কোন একটি সত্যিকার ধারাও অনুসৃত হইত না। সত্য ও ন্যায়বিচারের উপর দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাসকে অমর্যাদা করা হইত। জীবনের মূল নীতি বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহর আদেশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এইরূপ পক্ষিল বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে একটি পথ বাহির করা অসম্ভব মনে হইয়াছিল এবং আল্লাহর রাজ্যের দিকের পথটি বন্ধ মনে হইয়াছিল।

অবস্থানসমূহের বর্তমান গতিও তদরূপ পাল্টাইয়া গিয়াছে, সত্য ধর্মের শিক্ষাসমূহ ভুলিয়া গিয়াছে। অন্ধ বিশ্বাস যুগধর্ম হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হইতেছে। শয়তানের তারিফ করা হইতেছে এবং ধর্ম এমনভাবে অস্বীকার করা হইতেছে যে, ধর্মনীতি দূরে সরিয়া পড়িতেছে। ইহার মতবাদ পরিবর্তন করা হইতেছে। ইহার উপদেশাবলী মুছিয়া ফেলা হইতেছে এবং প্রচ্ছন্ন করিয়া তোলা হইতেছে এবং ইহার গতিপথ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। শয়তানকে মান্য করা হইতেছে, ইহার পথসমূহ অনুসরণ করা হইতেছে। এবং ইহা শয়তানী ভাবধারায় মানুষের মনকে ভরিয়া তুলিতেছে। এই ভাবগুলি হইয়াছে ইহার সেনাবাহিনী এবং ইহার বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিতেছে অবাধ্য এবং পাপ-পক্ষিল বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করার জন্য। শয়তানের দাসগণ নিজেরাই এখন সমাজ ধ্বংস করিয়া, সবাইকে পরাভূত

করিয়া রাখিয়া অবস্থার প্রভু হইয়া রহিয়াছে। জনগণ অশিক্ষিত হওয়ার কারণে সহজেই তাহাদের শিকারে পরিণত হইয়া সংঘমহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর সর্বোত্তম দেশের এমনই অবস্থা যে, বর্তমানে ইহা নিকৃষ্টতম মনুষ্য দ্বারা অধ্যুষিত-যাহারা তাহাদের কার্যকালের অপচয় করে এবং ক্ষতির জন্য ক্রন্দন করে। ইহা এমন একটি দেশ যেখানে জ্ঞানীগণকে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হয় এবং অশিক্ষিত ও মূর্খেরা রাজত্ব করে।

KHUTBA-5

In praise of Ahlay Baith, some commentators consider this as a part of previous sermon.

The Almighty God has placed His trust in Aale Mohammed (Descendants of Mohammed, may the peace of God be upon them). They are strongholds where His commandments receive protection and from which they are expounded and interpreted, they are fountain heads of knowledge created by Him, shelters for His teachings, refuges for Heavenly Books and mountain-like citadels to defend His religion. Islam in its beginning was weak and helpless, they came to its help and defence. Islam was nervous of the infidels around it, they made it strong and powerful.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-৫

ইহা আহলে বাইতের প্রশংসায়। কিছু সংখ্যক ভাষ্যকার ইহাকে পূর্ববর্তী খোৎবার একটি অংশ মনে করেন।

আল্লাহতা'লা আলে-মোহাম্মদকে তাঁহার (অর্থাৎ আল্লাহর) জিম্মাদাররূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন দুর্গ যেখানে আল্লাহর অনুশাসন নিরাপত্তা লাভ করে এবং সেখান হইতে উহার বিস্তার ও বিশদভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা হইলেন আল্লাহর সৃষ্ট জ্ঞানের উৎসমুখ, আল্লাহর দেওয়া শিক্ষার আশ্রয়স্থল, স্বর্গীয় কেতাবের আশ্রয়দাতা এবং তাঁহার ধর্ম রক্ষার জন্য পর্বতের

তাহারা পাপ এবং দোষের বীজ বপন করিয়াছিল। তাহাতে অহঙ্কার, প্রতারণা এবং ফাঁকিবাজির জল সিঞ্চন করিয়াছিল। তারপর তাহারা উহার ফলস্বরূপ আত্ম-প্রতারণা এবং আপন ধ্বংসের ফসল কাটিয়াছিল। রাসুল পাকের কোন সাহাবীকেই রাসুল বংশীয়দের সঙ্গে তুলনা করা যায় না এবং কাহাকেও তাঁহাদের সমতুল্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। যাহারা আল্লাহর দান বিতরণ করেন এবং যাহারা তাহা গ্রহণ করে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। আহলে-বায়েতগণ হইলেন ধর্মের ভিত্তি এবং বিশ্বাসের স্তম্ভ। তাঁহাদের নিকট চরম ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণ হেদায়েত ও মুক্তির জন্য যেমন উপস্থিত হইতে পারেন তেমনই পারেন সত্য ও ধর্ম পথের মোজাহেদগণ। ইমামত এবং খেলাফতের স্থান এবং বিশেষ অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা দক্ষতার সহিত সমর্থ এবং প্রখ্যাতভাবে যোগ্য। তাঁহারা নবী পাকের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীরূপেই চলিয়া আসিতেছেন এবং এখনও তেমনই রহিয়াছেন; তাঁহাদের ইমামতি (অর্থাৎ সার্বিক নেতৃত্ব) তাঁহারা উইল করিয়া লইয়াছেন।

খেলাফত এখন তাহার আপন যথাযোগ্য মর্যাদার স্থানে স্বর্গের দেওয়া মর্যাদায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ফাতেমা সালামাল্লাহে আলাইহার এন্তেকাল

ইহা দুঃখের বিষয়, তাঁহার (অর্থাৎ আলীর) অনুভূতির সাড়া (সমাজ) দেয় নাই। সাকিফার সিদ্ধান্ত হযরত আলী মানিয়া লইতে অস্বীকার করার কারণে যে সকল গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার একটি বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহে উল্লেখিত হইয়াছে।

১। তাবারী, ২য় খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

২। ইবনে আদে রাব্বাহ লিখিত “আকদুল ফরিদ”, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, মিশরে মুদ্রিত।

৩। আবুল ফিদার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, মিশরে মুদ্রিত।

১। এখানে ‘উইল’ অর্থে শুধু পার্থিব দলিলপত্রের কোনরূপ অধিকার নহে, বরং বংশগতভাবে যোগ্যতার অধিকার। এইরূপ শক্তিশালী যোগ্যতার অধিকারের উপর রাসুল্লাহ (আ) তাঁহার বংশের ইমামত নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন সার্বিক জনকল্যাণের জন্য।

৪। আল্লামা ইবনে কাতিবা লিখিত কিতাবুল ইমামত ওয়া সিয়াসাত ১ম খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা, মিশরে মুদ্রিত (এই পুস্তক এই বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তৃত একটি বর্ণনা দিয়াছে)।

৫। মোরাভেজ-উল যাহাব মাসুদ, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

৬। শাহরিস্তানীর লিখিত মিল্লাল ওয়া নাহাল, ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, (মুদ্রিত বোম্বাই, ভারত)।

৭। শিবলী নোমানীর “আল ফারুক” ভারতে মুদ্রিত।

৮। ইবনে আবিল হাদিদের নাহজুল বালাগার ভাষ্য।

এই সকল পুস্তকের বিভিন্ন প্রকার বিবরণ হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইল একটি দুঃখজনক এবং বিষাদময় ঘটনা। ইহাতে দেখা যায় : যদিও হযরত আলী অবসর গ্রহণ করিয়া নিভৃত গৃহ-জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতার রাজনীতির কোনরূপ অংশগ্রহণ করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার পরিবার ঘরে থাকা অবস্থায় ঘরে আগুন লাগান হইয়াছিল। এবং জুলন্ত দরজা অথবা তরবারির বাঁটের শক্ত আঘাত অথবা ভীষণ একটা ধাক্কা লাগিয়া (রাসুল পাকের কন্যা) হযরত ফাতেমার পঁজর এবং হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার এমন মারাত্মক আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান মরিয়া গিয়াছিলেন।

আল্লামা শাহরিস্তানীর লিখিত মিল্লাল ওয়া নাহাল নামক পুস্তকে (১ম খণ্ড ২৫ পৃষ্ঠায়) তিনি বলেন যে, আলী, ফাতেমা এবং তাঁহাদের সন্তানগণ ব্যতীত (যাহাদের বয়স ছিল ৪ হইতে ৮ বৎসর পর্যন্ত) বাড়িতে অন্য কেহই ছিল না। দৃশ্যত এই প্রচণ্ড আক্রমণ ছিল আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত। কেহই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলতঃ যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা দেওয়া অপেক্ষা ধারণাই অধিক করা যাইতে পারে। গৃহকর্ত্রী মারাত্মকভাবে আহত হইয়া মূর্ছিত হইয়া গিয়াছিলেন, ঘর ধুঁয়ায় ভরিয়া গিয়াছিল এবং ছেলেমেয়েরা ভয় পাইয়াছিল। আলী তাঁহার আহত স্ত্রী এবং শ্বাসরুদ্ধ সন্তানদের প্রতি যখন মনোযোগ দিতেছিলেন তখন তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিল। হযরত ফাতেমার উত্তরাধিকার অস্বীকৃত হইয়াছিল।

১। শতাব্দিক উন্মত্ত জনতার উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের মধ্যে কেমন করিয়া বা কাহার আঘাতে বা কাহার নিষ্ঠুর ধাক্কা মা ফাতেমার উপর মরণ আঘাত হানিয়াছিল তাহা বলা যায় না।

দৈহিক এবং মানসিক আঘাতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং অল্পকাল অসুস্থ থাকিয়া ১১ হিজরীর ১৪ই জমাদিউল আউয়াল ইহধাম ত্যাগ করেন।^২

গভীর রাত্রে তাঁহাকে দাফন করা হয়। বনি হাসেমগণ ব্যতীত রাসুল পাকের সাহাবীগণের মধ্যে শুধুমাত্র এই কয়জন তাঁহার জানাজায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন : সালমান, আবুজার, আম্মার এবং মিকদাদ। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি কবিতায় তাঁহার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন—যাহার একটি ছত্র আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্যরূপে স্থান পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন “আমার উপর এত দুঃখ নামিয়া আসিয়াছে যে, সেগুলি যদি উজ্জ্বল দিনের উপর পতিত হইত তাহা হইলে দিনগুলিও রাত্রিতে পরিণত হইয়া যাইত।”

নবী পাকের এই কন্যাটি যে কেমন একজন মহিলা ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনের শেষ দিনের বিবরণ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছে। তিনি বাড়ির লোকদিগকে বলিলেন যে, তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ অনুভব করিতেছেন, তাঁহার পাজর এবং হাড়ের ব্যথা আগের মত তীব্র নহে এবং তাঁহার জ্বরও নামিয়া আসিয়াছে। তারপর তিনি তাঁহার সন্তানগণকে গোছল করাইতে আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আলী এবং ফিজ্জা তাঁহার সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি তাঁহার সন্তানগণকে গোসল করাইলেন, পোশাক পরাইয়া খাওয়াইলেন, তারপর তাহাদিগকে তাঁহার চাচাত বোনের নিকট পাঠাইলেন। তারপর হজরত আলীকে তাঁহার পাশে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার প্রিয় স্বামী আলী, তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ আমি কেন এইরূপ করিলাম। (এইসব) সাধারণ বিষয়ে আমার অতি বাড়াবাড়ি দয়া করিয়া ক্ষমা করিও।

“আমার জীবনের শেষ দিনে আমি তাহাদিগকে সুখী দেখিতে চাই, কারণ তাহারা আমার সঙ্গে এবং আমার অসুস্থ থাকাকালে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। হ্যাঁ আলী, তুমি ইহাও জান যে, ইহা আমার জীবনের শেষ দিন, আমি (আজ) সুখী এবং দুঃখীও। আমি সুখী এইজন্য যে, শীঘ্রই আমার দুঃখের অবসান হইবে এবং আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিব, এবং আমি দুঃখিত যে, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে।

২। তাহার মৃত্যু তারিখ পরবর্তী রাজশক্তি এমনভাবে পাল্টাইয়াছে যেন কেহ সঠিক মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন না করিতে পারে। তাই দেখা যায় কোন কোন ঐতিহাসিক ওরা রমজান অথবা তারা জমাদিউস সানিও রিখিয়া থাকেন।

আলী, অনুগ্রহ করিয়া আমি যাহা বলি তাহা লক্ষ্য কর এবং তোমাকে যাহা করিতে বলি তাহা কর। আমার পরে তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পার তবে অবশ্য আমার চাচাত বোন ইয়ামামাকে বিবাহ করিও। সে আমার সন্তানদিগকে স্নেহ করে এবং হোসাইন তাহার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। বিবাহ হইবার পরেও ফিজ্জা যদি চাহে তবে তাহাকে তোমার সঙ্গেই রাখিও। সে আমার নিকট একজন সাধারণ চাকরানী নহে। আমি তাহাকে আমার মেয়ের মতই দেখি। আলী, রাত্রিতেই আমাকে দাফন করিও এবং যাহারা আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর তাহারা যেন আমার দাফনে শরিক না হয়। আমার মৃত্যু যেন তোমাকে নিরুৎসাহ করিয়া না তুলে, তোমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইসলাম এবং মানবতার খেদমত করিতে হইবে। আমার দুঃখ যেন তোমাকে ব্যথিত না করে, আলী, এই প্রতিশ্রুতি আমায় দাও।” হযরত আলী বলিলেন, “হ্যাঁ ফাতেমা, আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি।” তিনি আবার বলিলেন, “আলী, আমি জানি তুমি আমার সন্তানগণকে কত যে স্নেহ কর, কিন্তু হোসাইনের প্রতি খুব যত্ন নিও। সে যে আমাকে কত ভালবাসে এবং কত দুঃখের সঙ্গে আমায় হারাইবে, তাহার প্রতি মায়ের মততা রাখিও। আমার অসুস্থ অবস্থায়ও সে আমার বুকের উপর ঘুমাইত, সে ইহা হইতে এখনই বঞ্চিত হইল।” আলী তাঁহার ভাঙ্গা হাত মালিশ করিতেছিলেন! তাঁহার তপ্ত অশ্রু ফোঁটায় ফোঁটায় তাঁহার হাতের উপর পড়িতেছিল। তিনি লক্ষ্য করিলেন চোখ তুলিয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, “আলী তুমি কাঁদিও না, বাহিরের রক্ষা চেহারার অন্তরালে তুমি যে কতখানি কোমল হৃদয়ের অধিকারী তাহা আমি জানি। তুমি অত্যধিক সহ্য করিয়াছ, তোমাকে আরও সহ্য করিতে হইবে। বিদায় আমার প্রভু, বিদায় আমার প্রিয় স্বামী, বিদায় আলী। আমাকে বিদায় সম্ভাষণ দাও।” দুঃখে আলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অশ্রুমিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন, “বিদায় ফাতেমা।” ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, “এই সকল দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যের সহিত সহ্য করিবার শক্তি দয়াল রব তোমায় দান করুন। এখন আমার রবের সহিত আমাকে একা থাকিতে দাও।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রার্থনার কার্পেটের উপরে উপস্থিত হইলেন এবং আল্লাহর নিকট সেজদায় পড়িয়া রহিলেন। ইহার একটু পরেই হযরত আলী যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন তখনও তাঁহাকে সেজদায় দেখিতে পাইলেন কিন্তু নফস তাঁহার পাক পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আল্লাহর রহমত, করুণা এবং শান্তির দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই পরলোকগমন করেন, যেমন হযরত আলী বলেনঃ “একটি ফুল কলি অবস্থায় ছিঁড়িয়া ফেলা হইল। ইহা যেন জান্নাত হইতে আসিয়াছিল এবং জান্নাতেই চলিয়া গেল কিন্তু ইহার সুবাস রাখিয়া গেল আমার মনের মধ্যে।”

KHUTBA-207

This is the saddest discourse that has ever been recorded of Hazrat. He had delivered it on a really very sad occasion of his life. He was burying his dearest companion, his partner in life, who was the daughter of the Holy Prophet (A.S) and whom he loved as dearly as he had loved her father. Nobody was dearer to him in this world, than these two, not his own life nor even his two famous sons. And these two beloved ones had left him, one after another, at very short interval. The edge of pathos was keener on this occasion because Fatima (A.S) his dearest spouse, had died in the prime of her life, barely twenty years old. Her death was actually martyrdom. Her house was burnt down upon her head, the burning door was flung upon her, which broke her ribs and her left hand. This cruelty has caused the premature birth and death of a baby that she was carrying, and had ultimately ended in her death. All this had happened within two or three months of death of the Holy prophet (may the peace of God be upon him and his descendants). Hazrat had tried his best to ward all this off but was helpless against the heavy odds working. Her heirloom was also forcibly taken away from her and even the grant (Hiba) was refused to be taken into consideration. The insult and the injury had killed her and Hazrat was burying her when he could not resist the outburst. Not one can really translate and depict the pathos which words of Hazrat carried in them.

O Prophet of God please accept my Salams and those of your daughter who is being burried not far from you, and who is to meet you so quickly. O the chosen Apostle! The death of your dear daughter has left me without patience and solace. I have lost my self-restrain and power of endurance.

After having endured the separation from you I shall have to bear this catastrophe patiently O Prophet of God! I laid you down in the grave with my own hands, your soul departed from your body while you were resting upon my breast and your head was lying between my neck and my heart. "Surely we belong to Allah and towards Him is our return." (2:156) Your trust (Your daughter) which was entrusted to me is taken back from me. Sorrow now abides with me and happiness has taken leave. This grief is so overbearing that it engulfs and swallows other sorrow, and it has left me with sleepless night and joyless days. From now onwards my life will be a continued heartache till God gathers me with you both in the realm of His Favour and Peace.

O apostle of God! Your dear daughter will tell you how your followers have behaved with her and how they have illtreated her. You please ask her the details of what all has happened to her during such a short period (barely three months) after your departure to the Heaven. This period of separation from you was so short that people still remember you and were still talking about you.

Please both of you accept my parting salams and goodbye. It is the wish of a sincere heart which loved and will always love you both, a heart which will cherish and will carry your tender and loving memories to its grave. Goodbye O daughter of the chosen apostle of God! May you rest in peace which mankind has refused to you in this world. If I leave your grave to go to my place, it is not because I am tired of your company. I wish I had it to the end of my life. And if I make a permanent abode on your

grave it will not be because I doubt the reward that God has reserved for those who bear sorrows patiently. Goodbye! May God's peace and blessing be with you.

বঙ্গানুবাদ :

খোৎবা-২০৭

হযরতের যত বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ইহা তাহার মধ্যে সবচেয়ে মর্মাস্তিক। তিনি তাঁহার জীবনের প্রকৃতই অতি দুঃখময় একটি ঘটনার উপর এই ভাষণ দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীকে দাফন করিতেছিলেন, যিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহর (আ) কন্যা এবং যাহাকে তিনি তেমনই ভালবাসিতেন যেমন ভালবাসিতেন তাঁহার পিতাকে (রাসুলকে)। এই দুইজন ব্যতীত জগতে আর কেহই তাঁহার নিকট এত অধিক প্রিয় ছিলেন না-এমন কি নিজের জীবন অথবা তাঁহার বিখ্যাত পুত্র দুইটিও নহে। এবং এই দুই প্রিয়জন অল্পকালের ব্যবধানে একের পর এক তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। এক্ষেত্রে দুঃখ ছিল তীব্রতর, কারণ ইহা ছিল তাঁহার প্রিয়তম স্ত্রী ফাতেমার বিশেষ কোঠায় বয়সে যৌবন বসন্তেই জীবনের অবসান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যু ছিল শাহাদাত। তিনি ঘরে থাকিতেই ঘরে আগুন দেওয়া হইয়াছিল। জ্বলন্ত দরজা তাঁহার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যাহাতে তাঁহার বাম হাত ও পাজরের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। এই নিষ্ঠুরতায় তাঁহার গর্ভের সন্তান অকালে গর্ভপাতে মৃত্যু হয় এবং ইহার পরিণামে অবশেষে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। রাসুলুল্লাহর ওফাতের দুই-তিন মাসের মধ্যেই এইসব সংঘটিত হয়। হজরত ইহার সব কিছু মোকাবেলা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির কর্মকাণ্ড প্রতিহত করিতে অপারগ হইয়াছিলেন। তাঁহার (ফাতেমার) উত্তরাধিকারী স্বত্ব জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া হয়, এমন কি তাঁহার হেবা দলিলও অগ্রাহ্য করা হয়। অপমান এবং আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং হযরত তাঁহাকে দাফন করিবার কালে আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই। হযরতের ভাষায় যে করুণ সুর বহন করে তাহার প্রকৃত অনুবাদ করা এবং তাহা চিত্রিত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

হে আল্লাহর রাসুল, দয়া করিয়া আমার সালাম এবং আপনার কন্যার সালাম গ্রহণ করুন, যাহাকে আপনার নিকট হইতে অনতিদূরে দাফন করা হইতেছে এবং অতি শীঘ্রই তিনি আপনার সঙ্গে মিলিত হইতেছেন। হে নবী

মোসুফা, আপনার প্রিয় কন্যার মৃত্যু আমাকে ধৈর্য ও সান্ত্বনাহারা করিয়াছে। আমি আমার আত্ম-সংযম এবং ধৈর্যশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি।

হে আল্লাহর রাসুল, আপনার বিচ্ছেদ ভোগ করিবার পর আমাকে আবার ধৈর্যের সহিত আকস্মিক এই মহা দুর্ঘটনা সহ্য করিতে হইবে। আমি আপনাকে আমার নিজ হাতে কবরে স্থাপন করিয়াছিলাম। আমার বুকের উপর বিশ্রাম অবস্থায়, আমার গ্রীবা এবং বুকের মধ্যখানে আপনার মস্তক অবস্থিত থাকা অবস্থায় আপনার দেহ হইতে নফস বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। “নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।” (২৪:১৫৬) আপনার জিম্মা (আপনার কন্যা) যাহাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল তাহা আমার নিকট হইতে ফেরত নেওয়া হইল। এখন দুঃখ আমার সাথী হইয়াছে এবং সুখ আমা হইতে বিদায় লইয়াছে। এই দুঃখ এত তীব্র যে, অন্য সকল দুঃখকে ইহা অভিভূত ও গ্রাস করিয়া ফেলে এবং ইহা আমাকে বিন্দ্র রজনী এবং নিরানন্দ দিনের মধ্যে ফেলিয়া গেল। যতকাল আল্লাহ আমাকে তাঁহার রহমত এবং শান্তির রাজ্যে আপনাদের উভয়ের সঙ্গে মিলিত না করেন, এখন হইতে ততকাল আমার জীবন বিরামহীন একটি হৃদয় বেদনায় পরিণত হইল।

হে আল্লাহর রাসুল, আপনার সাহাবীগণ আপনার কন্যার প্রতি কি আচরণ করিয়াছে এবং কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে তাহা তিনিই বলিবেন। আপনার পরলোকগমনের পর অল্পকালের মধ্যেই (প্রায় তিন মাস) তাঁহার উপর যাহা কিছু ঘটয়াছে উহার বিস্তারিত বিষয়াদি দয়া করিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনার নিকট হইতে এই ব্যবধান এত অল্পকালের যে, লোকেরা এখনও আপনাকে স্মরণ করে এবং আপনার বিষয় বলাবলিও করে।

দয়া করিয়া আমার বিদায় সম্ভাষণ এবং সালাম আপনারা উভয়ে গ্রহণ করুন। এই বিদায় সম্ভাষণ এবং সালাম এমন একটি সরল হৃদয়ের ইচ্ছা (বা উৎসর্গ), যে হৃদয়, আপনাদের উভয়কে ভালবাসিয়াছে এবং চিরদিন ভালবাসিবে-যে হৃদয়, আপনাদের উভয়ের কোমল স্নেহের স্মৃতি তাহার কবরের দিকে সানন্দে বহন করিবে (অথবা তাহার মৃত্যু পর্যন্ত সানন্দে বহন করিবে)।

হে আল্লাহর মনোনীত নবীর কন্যা, বিদায়। তুমি শান্তিতে বিশ্রাম কর, যে শান্তি হইতে লোকেরা ইহজগতে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে। তোমার

কবর ছাড়িয়া আমার স্বস্থানে যাওয়া দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, আমি তোমার সঙ্গ লাভের দ্বারা শান্ত হইয়া গিয়াছি। আহা! যদি আমি আজীবন তোমার সঙ্গ লাভ করিতাম ইহাই আমার আশা। যাহারা ধৈর্যের সহিত দুঃখ সহ্য করে তাহাদের জন্য আল্লাহ পুরস্কার সংরক্ষিত রাখিয়াছেন—এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যাহার কারণে আমি তোমার কবরের উপর স্থায়ী একটি বাসস্থান তৈয়ারী করিয়া থাকিব। বিদায়! তোমার থাকুক আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ।

রাসুলের সময়ের অবস্থা এবং মাওলা আলী'র (আ) সময়ে অবস্থার মধ্যে মৌলিক একটি প্রভেদ

তৌহিদের নীতির উপর তথা অদ্বৈতবাদের নীতির উপর মহা এক অদৃশ্য শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম ধর্ম। এই আত্মসমর্পণ কোন একজন রাসুলের মাধ্যমে করিতে হয়। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তৌহিদ বিরোধী। পার্থিব জীবনে মৌলিক প্রয়োজনীয় অসংখ্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল দেহ ও মন স্বভাবতই তৌহিদ হইতে বিকেন্দ্রিক ভাব বহন করিবে। স্বভাবগত এই বস্তুবাদী বিকেন্দ্রিক মনকে কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট করিয়া তোলা একটি দুরূহ ব্যাপার। অদ্বৈত তৌহিদ-ধর্ম প্রকাশের পথে সর্বপ্রথম যে সকল বিরোধী ভাব চোখে ধরা পড়ে তাহা হইল মূর্তিপূজা অর্থাৎ স্থূলভাবে বহুর পূজা। মূর্তিপূজা এবং তৎসংলগ্ন কয়েকটি সামাজিক কদাচার বাদ দিলে উহাকেই আমরা তৌহিদ ধর্ম বলি। মোহাম্মদী ইসলাম এইরূপ একটি মামুলী তৌহিদ ধর্ম নহে, যদিও ইহা তাহার বাহ্যিক রূপ।

(ক) যাহারা স্থূলভাবে মূর্তিপূজা এবং বস্তুপূজা করিত এইরূপ অংশীবাদীগণের বিরুদ্ধেই রাসুলুল্লাহর প্রচার চলিয়াছিল এবং তাঁহার জীবনের সকল জেহাদগুলি মূলত অংশীবাদীগণের বিরুদ্ধেই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। সেইক্ষেত্রে জনগণ অতি সহজেই সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করিয়া সত্যের পক্ষ এবং মিথ্যার বিপক্ষ গ্রহণ করিতে

পারিয়াছিল। এইজন্য দেখা গিয়াছে কোন মুসলমান একবার ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহর দল ত্যাগ করে নাই। তাহাদের সাধারণ বিবেক সত্য ও মিথ্যার দিক নির্ণয় করিয়া লইতে পারিত। এই কারণে মদিনার দশ বৎসর রাজত্বকালে বা প্রচারকালে যাহারা ছিল মোনাফেক তাহারা জনমনে ভাঙ্গন লাগাইবার চেষ্টা করিয়াও তেমন একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। এইজন্য মোনাফেকগণ যাহা কিছু অপপ্রচার করিয়াছিল তাহা অতি গোপনে সাবধানে করিয়াছিল। ইহাদের প্রতি জনগণের কোনরূপ সমর্থন ছিল না। ইহাই ছিল রাসুলের সময়ে জনসমর্থনের অবস্থা।

(খ) হযরত আলীর (আ) রাজত্বকালে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নরূপ। তৌহিদ ধর্মের স্বরূপ হইয়াছিল জটিল। মানুষ মূর্তিপূজা ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল মনোভাব রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া বিরাট একটি আসুরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এবং এই আসুরিক শক্তি গুটিকতক লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়াই উহার প্রকৃত দোষত্রুটি সাধারণের চোখে বিসাদৃশ্য হইয়া উঠে নাই। উহাই ঐক্যবদ্ধ সামাজিক ধর্মরূপে স্বাভাবিক ও সচ্ছল গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। খলিফা ওসমানের খেলাফত ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর এই রূপটি সমাজে স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ লাভ করিল।

যদিও মাওলা আলী রাসুলের দ্বারা প্রচারিত একই ধর্মের উপরে এবং একই নীতির উপরে সমাজ ও রাষ্ট্রকে গঠন করিবার পদ্ধতি গ্রহণ করিলেন তথাপি জনগণ উহাকে তেমনভাবে সমর্থন দেয় নাই এবং গ্রহণও করে নাই যেমন করিয়াছিল রাসুলের সময়। কয়েকটি লোক ছাড়া মাওলা আলীকে (আ) বুঝিবার মত লোকও ছিল না। মাওলার যুদ্ধ সত্যিকারভাবে কাফের এবং মোনাফেকের বিরুদ্ধেই যে চলিতেছিল এইকথা লোকেরা ঠিকমত বুঝিতেই পারে নাই। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তাহারা বুঝিতে চাহে নাই, কারণ বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান তাহারাও পালন করিয়াই চলিতেছিল। বিরোধী দলগুলিকে তাহারা তাহাদের মতই মুসলমান মনে করিতে লাগিল যেহেতু তাহারাও ছিল নামাজী এবং মূর্তিপূজা ত্যাগী।

অংশীবাদী সমাজ আসলে তৌহিদের নামে সাম্রাজ্যবাদ ও বস্তুবাদের পূজা করিতে শুরু করিয়া দিল। মোশরেকগণের অংশীবাদ মূর্তিপূজা ছাড়িয়া ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিল মাত্র। বাঁপাইয়া পড়িল দ্বীনের নামে দুনিয়া উপার্জন করিবার জন্য। অংশীবাদী সমাজ তাহার খোলস অর্থাৎ স্থূল রূপটি পরিবর্তন করিল মাত্র। অতএব স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণের ইহা বুঝিবার উপায় ছিল না যে, মাবিয়া, আমর বিন আস, মারওয়ান, তালহা, জুবাইর ইত্যাদি নেতৃস্থানীয় লোকেরা কাফের এবং মোনাফেক হইয়া গিয়াছিল।

এই কারণে মাওলা আলী (আ) সর্বগুণে গুণান্বিত হইয়াও বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্মদ্রোহিতা এবং লুটতরাজ করার মনোবৃত্তি হইতে বিরোধী জনগণকে রাখিয়া রাখিতে পারেন নাই। নেতৃস্থানীয় যোগ্য ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে প্রায় সবাই তাঁহার দল ত্যাগ করিতে লাগিল। সমর্থনের অভাবে তাহার অনিবার্য পতন ঘটিল। তিনি শুধু রাখিয়া গেলেন আদর্শের একটি রূপরেখা যাহা সমাজে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ইতিহাসে বিরাজ করিতে লাগিল।

মাওলার জীবনের তিন পর্যায় আমরা দেখিতে পাই :- একটি হইল, রাসুলের (আ) জীবদ্দশায়। এই সময়ে তিনি নিশ্চিত মনে একগ্রন্থভাবে রাসুলের নেতৃত্বের অধীনে ইসলামের খেদমত করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার জীবনের যে উদ্দাম গতি প্রবাহ, সংকল্পকে বাস্তবায়িত করার যে উৎসাহ এবং উহার অলৌকিক প্রকাশ তাহা সকলকে মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তোলে।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায় হইল, খেলাফতকালের তেইশটি বৎসর। এ দিনগুলি ছিল ধৈর্য ও সহ্যের। এখানে আমরা দেখিতে পাই তিনি ধৈর্য ও সহ্যের একটি হিমালয়ের মত। খেলাফতকালীন রাষ্ট্রীয় সকল অবিচার, অন্যায় এবং নিয়মতান্ত্রিক ধর্মদ্রোহিতা সহ্য করিয়া যাইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে ধর্মশিক্ষা, কোরান শিক্ষা, সদুপদেশ দান ইত্যাদি কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া অরণ্যরোদনের মত গুটিকতক ভক্তবৃন্দের মধ্যে ইসলামের বীজ বপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। খেলাফতকালে লোকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালবাসিত, কিন্তু অনুসরণ করিত না। অনুসরণীয় ছিল রাষ্ট্রীয় বিধান।

তৃতীয় পর্যায় হইল তাঁহার আপন শাসনকাল। খলিফা ওসমানের মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা আলী অবস্থার বেগতিক রূপ দেখিয়া স্বেচ্ছায় ও সানন্দে খেলাফতের ভার গ্রহণ করিলেন না। লোকেরা তাঁহাকে বাধ্য করিল এমনকি প্রাণের ভয় দেখাইয়া বাধ্য করিল খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার জন্য এবং তিনি তাহা এইজন্য গ্রহণ করিলেন যে, তিনি ইহা গ্রহণ না করিলে ইসলাম চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিত। তিনি ইহাও দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার স্বল্পকালের শাসনের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে ইসলামের আদর্শ জগতের বুকে স্মরণীয় করিয়া রাখা কিছুটা সম্ভবপর হইবে। তাহা না করিলে সেখানেই ইসলামের ইতি হইয়া যাইত। পরবর্তী রাজতন্ত্রের যুগেও ইসলামের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল ব্যর্থ অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহাও আর হইতে পারিত না। মাওলা সেইগুলির বীজ বপন করিয়াছিলেন।

মাওলা কোন বিষয়েই দুর্বল ছিলেন না। মুসলমানের রক্তক্ষয় করা বিষয়ে তিনি ছিলেন দুর্বল। সরলভাবে সত্যের ভিত্তির উপর বিরোধের মীমাংসা করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। লোকেরা ইহাকে তাঁহার দুর্বলতারূপে গ্রহণ করিয়াছিল। শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি কাহারও উপর নিজের মতামত বলপূর্বক চাপাইয়া দেন নাই। তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হইলেন। এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ ছিল অপরপক্ষীয় ক্ষমতালোভী লোকদের ধূর্তামি এবং ধর্মহীন মিথ্যা চালবাজি। ধর্মের নামে তাহারা ছিল ইসলাম বিরোধী। তাই ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল করাই ছিল তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য! এই লক্ষ্য অর্জনে তাহাদের বেশী বেগ পাইতে হয় নাই, কারণ খেলাফতের দীর্ঘ তেইশ বৎসরের শিক্ষার কারণে সত্যের প্রতি জনগণের নিষ্ঠা একেবারেই শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

মাওলার জীবনীকারগণ মাওলাকে তাঁহার শাসনামলে রাজ্যশাসন এবং শত্রুদমনে দুর্বলরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কোনদিক দিয়াই দুর্বল বা হীন ছিলেন না। তার প্রমাণ পাই হযরত আবু বকরের এবং হযরত ওমরের রাজত্বকালে তাহাদের রাজ্য পরিচালনায় এবং বিচারকার্যের জটিল অবস্থায় যখনই তাহারা মাওলার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল তখনই তিনি

যেইরূপ উন্নতমানের সমাধান পদ্ধতি দিয়া থাকিতেন যাহা দ্বারা উক্ত দুই খলিফার শাসন আমলের বহু সংকটের উত্তরণ ঘটয়াছিল। অপরপক্ষে তাঁহার যুদ্ধজয়ের এবং শত্রু দমনের যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ দেখিতে পাই ইসলামের প্রতিষ্ঠাকালীন যুদ্ধের বর্ণনাতে। তাঁহার দুর্বলতা ছিল শুধু মুসলমানের রক্তক্ষয় করা বিষয়ে। তাঁহার তরবারি ‘জুলফিকার’ কখনও কোন মোমিনের এক ফোঁটা রক্ত ক্ষয় করে নাই। উহা ছিল আল্লাহর তরবারি। আল্লাহর তরবারি তাহা করিতেও পারে না।

ইসলামী জমহুরিয়াত

(বা ইসলামী গণতন্ত্র)

ইসলামে গণতন্ত্র নাই। ইসলামে রহিয়াছে আল্লাহতন্ত্র বা নবীতন্ত্র যাহা রূপায়িত হইবে ‘মোমিনতন্ত্রে’ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রে কিন্তু কখনও তাহা জনতন্ত্রে হইতে পারিবে না। ইহাকে রবতন্ত্রও বলা যাইতে পারে। এইরূপ সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র বা মোমিনতন্ত্রের নেতা থাকিবেন আল্লাহর তথা নবীর একজন প্রতিনিধি যাহাকে বলা হয় ‘ইমাম’। মোমিনতন্ত্রের শীর্ষস্থানে আল্লাহর মনোনীত ইমাম (বা নেতা) নিযুক্ত থাকিবেন। ইমামের নির্দেশের কারণেই এই মোমিনতন্ত্র সত্যিকার মোমিনতন্ত্র রূপে সুদৃঢ় থাকিতে পারিবে। মোমিনগণের মহান নেতার নির্দেশ ব্যতীত এইরূপ মোমিনতন্ত্রে ক্রমে ক্রমে গায়ের মোমিনতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে অতি স্বাভাবিকভাবেই। মোমিনগণের মধ্যকার স্বল্প মতভেদ ইমামের দ্বারা অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষিত হইয়া সকলকে অবগত করাইবে এবং ইহার ফলে সকলকে সত্যের সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে।

মহানবী ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হাতে-কলমে এবং কথায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এতেকালের পরেই উহা আর টিকিয়া থাকিতে পারিল না। তাঁহার দেওয়া সেই আদর্শ শুধুমাত্র তাঁহার জীবদ্দশায় পর্যন্ত মোসলিম রাষ্ট্রে বহু বিরোধীতার মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিয়াছিলেন। উহার আদর্শ পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দিয়া যে গুটিকতক মনের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া যাইতে

পারিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হইলেন মাওলা আলী (আ)।

মাওলা হইতে নিম্নমানের, উল্লেখযোগ্য যে সকল মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁহারা হইলেন সালমান ফারসী, আবুজর গিফ্ফারী, আম্মার বিন ইয়াসির, মেকদার, হোজায়ফা ইয়ামানী, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, হযরত আব্বাস ইত্যাদি আরও বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবী। রাষ্ট্রীয় আদর্শ বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা এক কুড়ির বেশি হইবে না। খেলাফতের রাজত্বকালে তাঁহারা লাঞ্চিত, অপমানিত এবং কেহবা সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। খেলাফতের ২৩ বৎসরের রাজত্বকালে তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে সমাজকে যথাসাধ্য সুশিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্যকলাপ শাসকগণ মোটেই পছন্দ করিতেন না। অবশ্য তাঁহাদের কার্যকলাপের প্রতি সরাসরিভাবে বিরোধীতা করাও রাষ্ট্রের নীতি ছিল না। রাষ্ট্র নেতাগণ ইহাই ধরিয়া লইয়াছিল যে এই দলকে ক্রমে হীন ও দুর্বল হইয়া স্বাভাবিকভাবে নিশ্চিহ্ন হইতে দেওয়াই তাহাদের মতে উত্তম বিবেচিত হইয়াছিল। তাহাদের এইরূপ ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলদায়ক হইতে পারিয়াছিল। বিশিষ্ট সাহাবীগণের এইরূপ শিক্ষা ও দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া অল্প সংখ্যক লোক বিক্ষিপ্তভাবে রাষ্ট্রে বিরাজিত ছিল। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের যুগে তাহাদিগকে নির্যাতন ও হত্যা করিয়া শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে খেলাফতের ব্যবস্থাও ধ্বংস করিয়া দিয়া সরাসরি রাজতন্ত্র মজবুত হইয়া গেল। খেলাফত যদিও ‘মোমিনতন্ত্র’ ছিল না ইহা ছিল গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী এক প্রকার ‘প্রজাতন্ত্র’। নীতির অভাবে ইহাও বেশিদিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত মোমিন নেতা না হইলে ‘মোমিনতন্ত্র’ টিকিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা অর্থাৎ ইমাম আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুলের হাতেগড়া ব্যক্তি হইতেই হইবে। মানবীয় চিন্তা এবং প্রবৃত্তির সমষ্টিকে ‘দুনিয়া’ বলে। দুনিয়া এত সূক্ষ্মভাবে ধর্মদ্রোহী যে, আল্লাহর মনোনীত শাসক ব্যতীত অন্য কাহারও নিয়ন্ত্রণে তাহা সমাজ ব্যবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। এইজন্য আল্লাহর মনোনীত শাসকগণকে কোরানে “উলিল আমর” নামে উল্লেখিত করিয়াছেন। ইহার অর্থ সেইরূপ রাষ্ট্রপরিচালক যিনি আল্লাহতা’লা হইতে “অধিকার প্রাপ্ত পরিচালক।”

রাসুল বংশের ১২জন ইমাম হইলেন রাসুলুল্লাহর পরবর্তী “উলিল আমর।” পূর্ববর্তী অনেক নবীও উলিল আমর হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন নাই। ইহার একটি প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই নবী ইব্রাহীমের (আ) প্রার্থনার মধ্যে। নবী হইয়াও তিনি ইমাম অর্থাৎ উলিল আমর হইবার জন্য আপন রবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। পরে অবশ্য আল্লাহ তাঁহাকে ইমাম অর্থাৎ উলিল আমর বানাইয়াছিলেন। (২ঃ১২৪)

জনগণ কখনও ‘আল্লাহতত্ত্ব’ পরিচালনার জ্ঞান নিজ হইতে লাভ করিতে পারে না। এই তত্ত্ব আল্লাহতা’লা হইতে মনোনীত এবং প্রবর্তিত হইয়া আসিবে। মানুষ আল্লাহতত্ত্বের অবাধ্য হইলে উহার প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। বিশেষত ধর্মের নামে ধর্মকে সঙ্গে লইয়া যাহারা আল্লাহতত্ত্বের বিরোধীতা করে তাহাদের চক্রান্তে জনগণ অতি সহজেই বিভ্রান্ত হইয়া আল্লাহতত্ত্বের সুফল লাভে চির বঞ্চিত হইয়া থাকে। উলিল আমর কথাটির উল্লেখ কোরানে বহুবার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— কোরানে বলিতেছেন : আতিউল্লাহা আতিউর রাসুল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম (৪ঃ৫৯)। অর্থাৎ (হে মানুষ) অনুসরণ কর আল্লাহর, আল্লাহর রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা উলিল আমর নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের।

মহানবীর পরে প্রথম উলিল আমর হইলেন মাওলা আলী (আ)। রাসুলুল্লাহর এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিরুদ্ধে দল পাকাইয়া “বনি সাকিফা” নামক বন্ডিতে যাইয়া যেইরূপ নীতিহীন এবং ধর্মদ্রোহী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হইল তাহাকেই ইসলামের জমহুরিয়াত বা গণতন্ত্র বলা হয়। আরও দুঃখের বিষয় এই অবাস্তিত গণতন্ত্র মাত্র দুই বৎসর চারমাস টিকিয়াছিল। তারপরই খেলাফত রাজতন্ত্রের রূপ ধারণ করিল। খলিফা আবু বকর একাই ওমরকে পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করিয়া গেলেন। তথাকথিত গণতন্ত্র স্বৈচ্ছাতন্ত্রে পরিণত হইল এবং তাহা পরবর্তী পূর্ণ রাজতন্ত্রের বীজ বপন করিল।

কোনকালে ইসলামে গণতন্ত্র ছিল না এবং আল্লাহর বিধানে কখনও তাহা থাকিবে না। আদম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত আল্লাহর মনোনীত সকল দ্বীনকেই “দ্বীন ইসলাম” বলিয়া কোরানে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কোন যুগের কোন ইসলাম ধর্মের মধ্যেই গণতন্ত্রকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কোরানে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়

না। আল্লাহর মনোনীত “উলিল আমর” ব্যক্তিগণই কেবল এই কার্যের জন্য আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হইয়া আসিতেছেন। অপরপক্ষে গণতন্ত্রকেই অধিকাংশ মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বলিয়া মনে করে এবং সেই গণতন্ত্র “খেলাফতী গণতন্ত্র।”

উপরে উল্লেখিত প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, ইসলামে রাজতন্ত্র অথবা কোনরূপ গণতন্ত্র নাই। তাহা হইলে ইসলামী রাষ্ট্রীয়তন্ত্র কিরূপ হইবে? আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের মনোনীত সত্যদ্রষ্টা একজন নেতা ইহার প্রধান পরিচালক হইবেন যিনি আল্লাহর দেওয়া কোরান এবং রাসুলের সুন্নার প্রকৃত একজন সমবাদার। তাঁহার দেওয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী মোমিন জনগণ কোরান ও সুন্নার ভিত্তিতে জীবন যাপন করিবে এবং তাহারাই সমাজ পরিচালনা করিবে। প্রতিটি মানুষ থাকিবে কোরান ও সুন্নার ভিত্তিতে স্বাধীন। স্বাধীন অর্থ প্রবৃত্তির স্বৈচ্ছাচারীতা প্রকাশের স্বাধীনতা নহে বরং মোমিন ব্যক্তিগণের প্রকৃতিগত পূর্ণ স্বাধীনতা।

ইসলামী রাষ্ট্রে কাফেরগণ অর্থাৎ বামপন্থীগণও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বাধীন জীবন যাপন করিবার অধিকার পাইবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত সকল স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার এবং সামাজিক নেতৃত্ব দানের অধিকার পাইবে না। কারণ ইহা মোমিনের রাজত্ব। কাফেরদিগকে এই সুযোগ দিলে কোরান ও সুন্নার ভিত্তি হইতে সমাজের আদর্শ তাহারা সরাইয়া ফেলিবে, যেইরূপভাবে রাসুলের এন্তেকালের পরে উহা সরাইয়া ফেলিতে পারিয়াছিল। ইহা এইজন্য হইতে পারিয়াছিল যে রাসুলের মনোনীত মাওলাকে ক্ষমতায় আসিতে দেওয়া হয় নাই। যাহার ফলে তেইশ বৎসর পরে ক্ষমতায় আসিয়াও তিনি মানুষের স্বভাবকে স্বৈচ্ছাচারীতা হইতে সরাইয়া আনিতে পারিলেন না। কাফেরগণ রাষ্ট্রের কর্মচারী হইতে পারিবে কিন্তু নীতি নির্ধারণকারী কর্মচারীর পদে নিয়োজিত হইতে পারিবে না। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাহারা একপ্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হইয়া থাকিবে। কাফের বলিতে ইহুদী, খৃষ্টান এবং অন্যান্য আহলে কেতাবগণকে বুঝাইবে না। যাহারা কোরান ও সুন্না বিরোধী কেবল তাহারাই কাফের বলিয়া চিহ্নিত থাকিবে। ইহা দলগত বা জন্মগত বিভেদ নহে। ইহা আদর্শগত বিভেদ। কাফের ব্যতীত সবাই অবাধে যে কোন পরিমাণ অস্ত্র ঘরে রাখিতে পারিবে। এই ব্যাপারে স্বাধীনতা হরণ করিবার অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে না।

কাফেরগণ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য সীমিত পরিমাণ অস্ত্র গৃহে রাখিতে পারিবে।

রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী থাকিবে না। শুধুমাত্র যুদ্ধ শিক্ষাদানকারী সামরিক কর্মচারী এবং কিছু সংখ্যক সামরিক অফিসার স্থায়ীভাবে নিয়োজিত থাকিবে, যাহারা হইবেন সামরিক বিভাগের পরিচালক। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভ করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক থাকিবে। যখন যে মোজাহেদ বাহিনী উত্তোলিত হইবে তাহা হইবে স্বেচ্ছাসেবক মোজাহেদ বাহিনী। যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে যে যাহার আপন কর্মে ফিরিয়া যাইবে। যতকাল যুদ্ধ কর্মে নিয়োজিত থাকিবে ততকাল সে ও তাহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করিবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ঠিকমত প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে রাষ্ট্রপতির প্রতি হিংসা করিবার কিছুই থাকিবে না। দায়িত্বের প্রভেদ ব্যতীত আর্থিক কোনরূপ প্রভেদ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এবং সাধারণ একজন নাগরিকের সঙ্গে মোটেই থাকিবে না। চালক এবং চালিত প্রত্যেকেই সাধারণ একজন সৈনিকের মত সমান অর্থ বন্টন লাভ করিবে। আল্লাহর নীতি ব্যতীত মানুষের উপর কেহই শাসক নহে এবং কেহ শাসিতও নহে। নবী আসিয়াছিলেন মানুষকে শুধু আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে পূর্ণভাবে দাস বানাইয়া সৃষ্টি হইতে স্বাধীন করিয়া দেওয়ার জন্য। আর ইসলামী জমহুরিয়াত আসিয়াছিল উহাকে বিনষ্ট করিয়া মানুষকে আরব সাম্রাজ্যবাদের অধীন করিয়া তোলার জন্য। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উহার প্রধান পরিচালক রাষ্ট্রপতি নিজেও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন নহে। ইসলামী রাষ্ট্রে সবাই সমপরিমাণ স্বাধীন।

রাসুলুল্লাহর পরে সত্যিকার একটি ইসলামী রাষ্ট্র কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মাওলা আলী তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া শেষ পর্যন্ত সমর্থনের অভাবে নিজেই শহীদ হইয়া ব্যর্থ হইয়া গেলেন, রাখিয়া গেলেন উহার অল্প একটু আদর্শের রূপ রেখা মাত্র।

ইসলামী অর্থনীতি আলাদা একটি বিষয় এবং উহা সর্বাপেক্ষ সুন্দর একটি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ রূপ লইয়া সমাজে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। রাসুলুল্লাহ যেমন জেহাদ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন মাওলা আলীও (আ) তেমনই সারাজীবন জেহাদ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। স্থিতিমান শান্ত এবং

শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই যাহাতে ইসলামের অর্থনীতি মূর্ত হইয়া উঠিতে পারিত।

মোহাম্মদী সমাজ ব্যবস্থা মূলত সমাজতান্ত্রিক এবং তাহা হইল : আধুনিককালের সমাজতন্ত্র হইতে বহুগুণে উন্নতমানের একটি ব্যবস্থা। কিন্তু সেই ব্যবস্থা জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মহানবী উহার মূলনীতি এবং আদর্শের শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। যাহারা উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে একেবারে সরাইয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছিল খেলাফত এবং পরবর্তী রাজতন্ত্র।

আধুনিককালে সমাজতন্ত্রের অনেকখানি বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ বস্তুভিত্তিক বৈশিষ্ট্য) মোহাম্মদী সমাজতন্ত্রে উল্লেখিত ছিল যদিও তাহা মূলত আধুনিক সমাজতন্ত্রের মত নহে। আধুনিক সমাজতন্ত্র ধর্মহীন, অপরপক্ষে মোহাম্মদী সমাজতন্ত্র ধর্ম সহকারে প্রকৃতিগত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর বস্তুর সমবন্টন ব্যবস্থা রক্ষা করে এবং উহার বস্তু বন্টন ব্যবস্থাটি আধুনিক সমাজতন্ত্র হইতে অধিক উন্নতমানের। কোরান ও সুন্নাহর ভাবধারা এমনভাবে পরিবর্তিত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, আধুনিককালের লোকের জন্য ইসলামী অর্থনীতি এবং সমাজনীতির পরিচয় লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে আলাদা একটি পুস্তিকা রচনা ব্যতীত উহার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। মোট কথা, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল বিশেষ এক প্রকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাহার মূলনীতিসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া কোরানে উল্লেখিত উত্তরাধিকার আইন হইতে এমন একটি কথা বাদ দেওয়া হইয়াছে যাহা রক্ষা করিলে ব্যক্তি মালিকানা একেবারেই খণ্ডিত হইয়া সামাজিক অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বাধ্য হইত।

“এবং যখন (সম্পত্তি) বন্টন হইবে তখন যে সকল নিকটবর্তীগণ এবং এতিমগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে উহা হইতে রেজেক দাও (অর্থাৎ খোরপোষ দাও) এবং তাহাদিগকে সদয় প্রিয় বাক্য বলিবে।” (৪৪৮)

অর্থাৎ এমনভাবে বন্টন কর যেন তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া যায়। শেষ কথাটি বলিবার যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। মৃত ব্যক্তি দরিদ্র হইলে তাহার কয়েকটি সন্তান থাকিলে ঐ সম্পত্তি হইতে কিছু অংশ বাহিরের এই তিন জাতীয়

লোকদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে গেলে মৃত ব্যক্তির সন্তানগণ কষ্টে পতিত হইতে পারে। এমন অবস্থায় সমাজপতিগণ সুব্যাক্য বলিয়া তাহাদিগকে সদয়ভাবে বুঝাইয়া খুশি করিয়া বিদায় দিবেন। যেহেতু তাহারাও আল্লাহর আইন অনুযায়ী সম্পত্তি অল্প হইলেও উহার হকদার।

এই বাক্যে মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তীজনদিগকে এবং সমাজের এতিমদিগকে এবং দরিদ্রদিগকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি এমনভাবে ভাগ করিয়া দিতে বলা হইতেছে যেন তাহারাও সন্তুষ্ট হইয়া যায়। 'নিকটবর্তীজন' বলিতে অংশীদার আত্মীয় ছাড়া অন্যান্য প্রকারের নিকটবর্তী বুঝায় অর্থাৎ পাড়া-প্রতিবেশী, অধীনস্ত কর্মচারী, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সর্বপ্রকার নিকটবর্তীজন বুঝায়। উপস্থিত এই জাতীয় সকল লোকের সহিত সৎ ব্যবহার এবং বন্টন বিষয়ে সদয় কথা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সমাজপতিগণ সবাইকে ন্যায্য অংশদানে বিদায় করিবেন। এইরূপ করিলে মৃত্যুর পর ধনী ব্যক্তির ধন কিছুই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিতে পারে না। অংশীদার ব্যতীত এই তিন জাতীয় ও উপস্থিত দাবিদার লোকেরা মোট সম্পত্তির কত অংশ পাইবে তাহাও কোরানে উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বন্টন ব্যবস্থাটির স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) সমাজপতিদের ন্যায্য বিচারের উপর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

উপসংহার

মাওলা আলী (আ) ছিলেন অসীম ধৈর্যশীল। তিনি কেমন করিয়া একে একে তিনজন খলিফার অন্যায়ে রাজত্ব এবং ধর্মহীনতা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সত্যি আশ্চর্যের বিষয়। ইহা আমাদেরও কল্পনার অতীত। খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মরিয়া যাওয়া ইহা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে ছিল সহজতর। আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুল যাহাকে ধর্ম এবং ধর্মীয় রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন তাঁহার চোখের সামনে অধর্ম ও অন্যায়ে রাজত্ব চলিতে থাকিলে উহা অন্যান্য মোমিনের পক্ষে যত না বেদনাদায়ক তাহা হইতে হাজার গুণ বেদনাদায়ক হইয়াছিল আলীর (আ) জন্য, যেহেতু তিনি ছিলেন উক্ত কাজের ভারপ্রাপ্ত এবং মোমিনগণের জন্য অভিষিক্ত মাওলা। আলী (আ) চক্ষুস্পর্শ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। খেলাফত কালের পাপ এবং বিভ্রান্তি পরবর্তীকালের অসীম অন্যায়ে ও ধর্মদ্রোহীতার যে সকল ভিত্তি রচনা

করিতেছিল তাহা সত্যদ্রষ্টা মাওলার পক্ষে সহ্য করা কত যে কষ্টকর ছিল তাহা সাধারণ অন্ধ মানুষ আমরা কল্পনা করিতেও পারি না।

ইসলামের রাজনীতি, ধর্মনীতি এবং অর্থনীতির ভিত্তিমূল একেবারে বিনষ্ট করিয়া নতুন অন্য আর একটি রূপ দেওয়া হইতে লাগিল যাহার কুফল তখনও সকলের চোখে পড়ে নাই, কিন্তু সর্বদ্রষ্টা আলী তাহা বুঝিতে পারিয়া যেভাবে অসহায় এবং মর্মান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তখন উপলব্ধি করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই ছিল। খেলাফত ইসলামের উপর ব্যাপক ও বিরাট একটি অপকীর্তি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু উন্মুক্ত লুটেরা জনগণ ইহাকে একটি বিশেষ সুযোগরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাপক সমর্থন দিতে শুরু করিল। ইসলামের নীতির দিকে তাহাদের কোন পরোয়াই রহিল না। খেলাফতের রচিত নিয়মই তাহাদের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইল।

তিন খলিফার রাজত্বকালে মাওলা আলী ধর্মীয় নিয়মানুবর্তিতার উপদেশ দান করিতেন কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ব্যতীত লোকেরা তাহা গ্রহণ করিত না। প্রচলিত স্বেচ্ছাচারী সামাজিক ধারার উপরেই তাহারা আমল করিয়া থাকিত। ২৩ বৎসর পর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া মুসলমানগণের সামাজিক জীবন ইসলামী জীবন বিধানের উপর চালাইবার জন্য তিনি যখন বল প্রয়োগ করিতে শুরু করিলেন তখন দেখা গেল স্বেচ্ছাচারীতায় অভ্যস্ত জাতি তাঁহার নির্দেশ অমান্য করিতে লাগিল। বেশির ভাগ লোক তাহা হইতে সরিয়া রহিল আর কতক অংশ দলত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগ দিল।

আশুশারে মোবাশ্শারা

নিম্নে বর্ণিত যে দশজন সাহাবীকে তাহাদের মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতের সুসংবাদ রাসুল (আ) কর্তৃক দান করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকে তাঁহাদের নাম যথাক্রমে :

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| ১। আবুবকর (রা) | ২। ওমর (রা) | ৩। ওসমান (রা) |
| ৪। আলী (আ) | ৫। তালহা (রা) | ৬। জোবাইর (রা) |
| ৭। সায়াদ ইবনে আবি অয়াক্কাস (রা) | ৮। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) | |
| ৯। ওবায়দা ইবনে জারাহ (রা) | এবং ১০। সাইদ ইবনে জাইদ (রা)। | |

রাসুল্লাহ (আ) কর্তৃক উক্ত দশজনকে যে সুসংবাদ দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে তাহা একেবারেই মিথ্যা। ইহার দুই প্রকার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রকার দলিলগত প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রকার প্রমাণ যুক্তিগত। দলিলগত প্রমাণ কাহাকেও বুঝাইতে হইলে অন্তত দুই তিন বৎসর শিক্ষা দানের প্রয়োজন হইবে দলিলগত মৌলিক জ্ঞান দান করার জন্য। ধর্মের উপর মিথ্যার হিমালয় চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, লিখিয়া উহা অল্প কথায় সহজে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বিধায় শুধুমাত্র যুক্তিমূলক কয়েকটি প্রমাণ পেশ করিতে চেষ্টা করিলাম এবং আশা করি বুঝিবার পক্ষে ইহা পাঠকের জন্য যথেষ্ট হইবে।

১। কোন বুদ্ধিমান নেতা শিষ্যগণের কার্যাবলীর ফলাফল অগ্রিম প্রকাশ করিতে চাহিবেন না। সেইরূপ করিলে অবশিষ্ট লোকেরা আত্মত্যাগের কর্মে উৎসাহ হারাইয়া ফেলিবে। কাজেই নেতার পক্ষে ইহা মোটেই স্বাভাবিক নহে যে, তিনি কৃতকার্যতার সুফল কয়েকজনের জন্য আগেই প্রকাশ করিয়া দিবেন। যদি বলা হয় যে, আল্লাহর পাঠান এই সুসংবাদ নবীর মাধ্যমে আসিয়াছে তাহা হইলে নবীকে অন্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইতে হয়। ইহাতে নবীকে (আ) খাট করিতে হয়।

২। যে দশজনকে লইয়া এই তথাকথিত ‘আশশারে মোবাম্বাশারা’ কথাটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিশালী প্রচারের সাহায্যে তাহা সমাজে বিশ্বাসযোগ্য কথারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজনও আনসার নাই। সবাই তাহারা মোহাজের। অথচ মোহাজেরগণের সংখ্যা ছিল আনসারদের তুলনায় অতি নগণ্য। মদিনাবাসীগণ প্রায় সবাই ছিলেন আনসার।

নবী এবং তাঁহার নীতিকে যাহারা আশ্রয় এবং সাহায্য দিয়াছিলেন সেই সকল মদিনাবাসীগণকে আনসার বলা হয়। ইসলাম এবং তাহার নবীকে আশ্রয়দাতা আনসারগণ ছিলেন বিশেষ সমর্পিত মনোভাবসম্পন্ন। তাহাদের মধ্য হইতে একজনও মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করিবার যোগ্য হন নাই একথা অবিশ্বাস্য।

৩। আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল আনসারগণের আত্মত্যাগের প্রশংসায় মুখর। কোরান ও হাদিসে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সেই সকল প্রশংসার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে হয়, যদি উক্ত দশজনের সুসংবাদ প্রাপ্তির কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

৪। রাসুলের (আ) জেহাদগুলির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে আনসারগণের অপারিসীম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মত অকাতরে জেহাদের ময়দানে জীবন দান করার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে আর নাই। তবুও তাহারা জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ জীবদ্দশায় পাইলেন না। তাহা পাইলেন এমন সব ব্যক্তিগণ যাহারা পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকারের ইসলামের দূশমনী করিতে মোটেই কসুর করে নাই।

৫। নবীর শিষ্যগণকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এক দলকে “আসহাবে সুফ্ফা” এবং অন্য দলকে “আসহাবে নবী” বলা যাইতে পারে। যে দশটি নামের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে আসহাবে সুফ্ফা দলের অন্তর্গত একজনের নামও নাই।

আসহাবে সুফ্ফা দলটি ছিলেন আধ্যাত্মিক শিক্ষায় এবং আমলগতভাবে অত্যধিক অগ্রসর। এই দলটিকে বিশেষভাবে নিয়োজিত রাখা হইয়াছিল ধর্মবিজ্ঞান এবং আমলগতভাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কাজে। এই কারণে তাহাদিগকে জাগতিক কাজে খুব কমই নিয়োজিত করা হইত। রাসুল্লাহ (আ) তাহাদিগকে ধর্ম প্রচারের কাজেই বিশেষভাবে নিয়োগ করিতেন। রাসুলের (আ) এন্তেকালের পরে তাহাদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যকার একজনের নামও এই তালিকায় নাই। কাজেই ইহা অস্বাভাবিক এবং মিথ্যা। মাওলা আলীর (আ) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণা ব্যতীত “আশশারে মোবাম্বাশারা” কথাটি আবিষ্কার করার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

মাওলা আলীর (আ) বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহারা রাষ্ট্রনীতি এবং সমরনীতি পরিচালনা করিয়া ধর্মকে মোহাম্মদী নীতি হইতে বিপথগামী করিয়াছে তাহাদের কার্যকলাপকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করিবার অপচেষ্টা হইল এই সকল মিথ্যা হাদিস রচনার মূল উদ্দেশ্য।

৬। রাসুল পাক তাঁহার রক্তের বংশধরগণের বহির্ভূত যে মহৎ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, সেই মহান ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসীও সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, রাসুল (আ) বলিয়াছেন, “সালমান আমার আহলে বাইত।”

“আম্মার বিন ইয়াসির কুফরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শাহাদাতপ্রাপ্ত হইবেন” এ কথা রাসুলপাক ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি মাওলা আলীর

পক্ষে যুদ্ধ করিয়া সফলতার মাঠে শাহাদাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শহীদ ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতবাসী। তাঁহার নামও উক্ত তালিকায় নাই।

যুক্তির প্রমাণগুলি খণ্ডন করার পর দলিলগত প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাইতে পারে। এই বিষয়টি বুঝার জন্য যুক্তির প্রমাণগুলিই যথেষ্ট।

৭। যে দশজনের নাম আমরা পাইতেছি তাহাতে কোন মেয়ের নাম নাই। ইহা অস্বাভাবিক। অথচ “খাতুনে জান্নাত” অর্থাৎ ‘জান্নাতের প্রধান নেত্রী’ কথাটি সমাজের সকল দলে আজও বহুল প্রচলিত আছে।

৮। মুসা নবীর ভাই হারুনকে (আ) জান্নাতবাসীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া কোনরূপ কথা রচনা করিলে তাহাকে ধন্য না করিয়া যেমন অপমানই করা হইবে সেইরূপ মাওলা আলীর (আ) নাম জান্নাতবাসীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখাইতে যাওয়া তাঁহাকে অপমান করার সমতুল্য।

যাহা হউক আলীর (আ) নাম যেখানে স্থান পাইল সেখানে “জান্নাতের দুই যুবক” এই নামে যাহারা সর্বদল কর্তৃক আখ্যায়িত আছেন সেই দুই ব্যক্তি উহাতে তালিকাভুক্ত কেন হইলেন না? অর্থাৎ ইমাম ভ্রাতৃত্ব : যাহাদিগকে “ইবনে রাসুল” বলা হয়। অবশ্য তাঁহাদের নাম এই তালিকাভুক্ত করিলে তাহাদিগকেও অপমানই করা হইত যেমন মাওলা আলীকে অপমান করা হইয়াছে। এ সকল তাহাদের রচনার গরমিল। আল্লাহর রাসুল হইতে কখনও এইরূপ গরমিল প্রকাশ পাইতে পারে না।

৯। বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কেহ যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় সে কাফের হইয়া যায় (৪ঃ৯২+৯৩) এবং (৪ঃ২৫)। কোরানের এই কথাটির সত্যতা খণ্ডন করার জন্য “আশশারে মোবাশশারা” নাম সৃষ্টি করিয়া অনেকগুলি হাদিস রচনা করা হইয়াছে। মাওলা আলীর (আ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েজ প্রমাণ করিবার জন্য এই সকল হাদিস পরবর্তীকালে আব্বাসীয় শাসনামলে রচনা করা হইয়াছিল।

যুক্তি সাপেক্ষ প্রমাণ যে কয়টি দেওয়া হইল আশা করি “আশশারে মোবাশশারা” নামক অধ্যায়ে বর্ণিত সব কয়টি হাদিস মিথ্যা প্রমাণের জন্য তাহাই যথেষ্ট।

যুক্তিগত প্রমাণ ছাড়া দলিলগত যে সকল প্রমাণ আছে তাহা এত ব্যাপক ও বহুল যে, তাহা বুঝাইতে একজন লোককে বহুদিন শিক্ষা দিতে হইবে। ঠিক যেমন ‘তবলীগ’ নামক বর্তমান যুগের সংস্থাটি সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে ধর্মবিরোধী এবং তাহাদের নিজ রচিত ভ্রান্ত একটি নীতিবাদ, অথচ এই সত্যটি বুঝাইতে শিক্ষার্থীকে দুই তিন বৎসর শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হইবে।

নচেৎ তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। অতএব ইসলামের মৌলিক জ্ঞান শিক্ষাদান না করিয়া দলিলগত প্রমাণ সংক্ষেপে পেশ করা সম্ভবপর নহে।

জান্নাতের সুসংবাদ পুরুষের জন্য একচেটিয়া হইয়া থাকিবে কেন? মেয়েদের স্থান একেবারেই থাকিতেছে না কেন? রাসুলুল্লাহকে (আ) কায়মনোবাক্যে কোন মেয়ে মানুষ গ্রহণ করিতে পারেন নাই কি?

ইসলাম ধর্মের সত্য ও মিথ্যা বিবরণসমূহের ক্ষুদ্র একটি তালিকা

(আমাদের দলীয় লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় হিসাবে)

ইসলাম নামে যে ধর্ম প্রচলিত আছে তাহার ভাবধারা মোটেই আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুলের দ্বারা প্রচলিত ইসলাম ধর্মের অনুরূপ নহে যদিও তাহা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুলের প্রচারিত ধর্মরূপেই মনে করা হইতেছে। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজশক্তির চক্রান্তে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব ইহাকে আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুলের প্রচারিত ধর্ম তথা “আসমানী ধর্ম” না বলিয়া ইহার বর্তমান রূপটিকে “রাজকীয় ধর্ম” বলাই অধিক শ্রেয়। এই তালিকায় মোহাম্মদী ইসলাম ধর্মের ভিত্তিমূলক কয়েকটি বিষয় দেখান হইল। কোরান ও হাদিসের অপপ্রচারসমূহের বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইলে সত্য ও মিথ্যা যাচাই করিবার মানদণ্ড হিসাবে যে সকল মূলনীতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) আমাদের মতবাদ (সত্যের যতটুকু আমরা বুঝিয়াছি বলিয়া মনে করিয়া থাকি)।

(খ) ব্যাপকভাবে প্রচলিত বিপরীত মতবাদ (যাহাকে আমরা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি)।

১। (ক) আল্লাহর কোন কথা ও কাজের মধ্যে পরিবর্তন নাই। অতএব

তাঁহার বাণীর মধ্যে কোথাও আত্মবিরোধী কথা থাকিতে পারে না।

(খ) বিপরীত মত - আল্লাহর কথা ও কাজের পরিবর্তন হইয়া থাকে। এইজন্য একই ধর্মগ্রন্থে বিপরীত কথার উপস্থিতি থাকিবেই।

২। (ক) আল্লাহর এক বাক্য দ্বারা অন্য বাক্য মনসুখ অর্থাৎ বাতিল হইয়া যাওয়া অবান্তর এবং সেইরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে করা অধর্ম।

(খ) বিপরীত মত - মানুষের প্রয়োজনবোধে, আল্লাহ তাঁহার কথা ও কাজের পরিবর্তন করিয়া থাকেন। কোন আদেশ জারি করিবার পর উহা অপ্রযোজ্য মনে করিলে তিনি উহা বাতিল করিয়া উহা হইতে উত্তম কথা নাজেল করিয়া থাকেন। এমন কি প্রয়োজনবোধে উহার বিপরীত একটি মত অথবা সংশোধিত একটি মত অল্প কিছুদিন পরেই প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ সংশোধনবাদী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া একই ধর্মগ্রন্থে বিপরীত উক্তি দান করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আদেশ আমল হিসাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশোধিত পরবর্তী কথা বলবৎ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। (ক) নবী আমাদের মত মানুষ নহেন। নবীকে আমাদের মত মানুষ মনে করা কুফরী। সুতরাং, কোরানের ব্যাখ্যায় অথবা যে সকল হাদিসে রাসুলুল্লাহকে (আ) আমাদের মত মানুষরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে সেগুলির প্রত্যেকটি মিথ্যা হাদিস এবং কোরানের সেইসব অংশের ব্যাখ্যাগুলি মিথ্যা রচনা। এই সকল মিথ্যা, রাজশক্তির রচিত মিথ্যা। কোন জাতির মধ্যেই মোমিনগণ তাহাদের নবীকে তাহাদের মত মানুষ মনে করে নাই। কেবলমাত্র কাফেরগণই নবী ও রাসুলগণকে তাহাদের মত মানুষ মনে করিয়া আসিতেছে। এইকথা বহুবার কোরানে বর্ণিত আছে।

(খ) বিপরীত মত - রাসুলুল্লাহ (আ) আমাদের মত মানুষ। এই কারণে তিনি জীবনে অনেক ভুলত্রুটি স্বাভাবিকভাবেই করিয়া ফেলিতেন। এবং একই কারণে তিনি আপন গুনাহ-খাতার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় তিনি এবাদত করিতেন প্রচুর। সাধারণ মানুষ হওয়ার কারণেই তাহা দ্বারা আত্মবিরোধী কথা ও আচরণ অত্যধিক প্রকাশ পাইয়াছে। এইজন্য তাঁহার বর্ণিত হাদিসগুলি বহুভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে- (১) সহি (২)

জইফ (৩) গরীব (৪) হাসানুন গরীবুন (৫) নাকেস ইত্যাদি। যেগুলি সহি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতেও দেখা যায় তিনি অত্যন্ত অসাবধান প্রবক্তা। নবী হিসাবে তাঁহাকে এত কথা বলিতে হইয়াছে যাহার ফলে তাঁহার আপন কথাগুলির মধ্যে মিল ও সঙ্গতি রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

৪। (ক) রাসুলুল্লাহ (আ) কোন কথাই ভুলিয়া যান না। অতএব তাঁহার বাণীর একটির সঙ্গে অন্যটির গরমিল হইয়া যাওয়া অবান্তর এবং অসম্ভব। রাসুলের পক্ষে কোন একটি কথাও ভুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কি-না ইহা প্রশ্নেরও অতীত। উচ্চাঙ্গের মোমিনগণকেও ভুলচুক হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

(খ) বিপরীত মত - তিনিও সাধারণ মানুষের মতই ভুলের অধীন। এইজন্য তাঁহার এক সময়ের কথার সঙ্গে অন্য সময়ের কথার মিল প্রায়ই পাওয়া যায় না। এমনকি একই বিষয়ের উপর তিনি বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন তেমন হাদিসের সংখ্যাও কম নহে। সঙ্গতিহীন কথা প্রকাশ করাই তাঁহার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহা বিশেষ কোন দোষের কথা নহে, কারণ হাজার হউক তিনি তো মানুষ।

৫। (ক) আল্লাহর রাসুল আল্লাহর নির্দেশেই কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং, তাঁহার কথার মধ্যে এবং আল্লাহর কথার মধ্যে মতবিরোধ বা গরমিল থাকিতে পারে না এবং সময়ের ব্যবধানের কারণে অথবা পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে রাসুলের দ্বারা কোন আত্মবিরোধী কথা প্রকাশ পাইতে পারে না। বরং সমগ্র কথার মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের একটি সুর সুস্পষ্ট থাকিবেই।

(খ) বিপরীত মত - রাসুলুল্লাহ (আ) সর্বক্ষণ আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকিতেন না। যতক্ষণ তাঁহার মাধ্যমে অহি প্রেরিত হইত ততক্ষণ তিনি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। বাকি সময়ের সবটুকু তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনই কাটাইতেন। সুতরাং তাঁহার কথার সঙ্গে আল্লাহর কথার গরমিল অবশ্যই থাকিবে। রাসুলের ভোলা মন তাঁহারই উক্ত সকল কথা তিনি স্মরণ রাখিতে পারিতেন না। সেইজন্য এক সময়ের কথার সঙ্গে অন্য সময়ের

কথার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহা অনিচ্ছাকৃত তাহার একটি ত্রুটি। এইজন্য কোরান এবং হাদিসের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য আশা করা যায় না। বোখারী ও মোসলেমের মত জগদ্বিখ্যাত মোহাদ্দেসগণের লিখিত হাদিসে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬। (ক) উলিল আজম নবীগণ জন্ম হইতেই 'মাসুম' অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে মনের দ্বারা সংলগ্ন ব্যক্তি। অতএব মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (আ) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তি মিথ্যা কথা, কারণ তিনি আজন্মই নবী। চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়ত ঘোষণা করিয়াছেন মাত্র। নবুয়তপ্রাপ্ত হন নাই। জন্মের পূর্বেও তিনি নবীই ছিলেন। সাধন-ভজন করিয়া নবী হওয়া যায় না।

(খ) বিপরীত মত - রাসুলুল্লাহ (আ) চল্লিশ বৎসর বয়সে সাধন-ভজন করিয়াই নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাসুম বলিতে নিষ্পাপ বুঝায়। সুতরাং আমাদের মত সাধারণ লোকের ছেলেমেয়েরাও শৈশবকালে মাসুম থাকে। অতএব মাসুম কথাটি তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। সৎ আমল অত্যধিক করিয়া মানুষ মর্যাদায় নবীকেও ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারিবেন, যদিও নবী আর কেহ হইতে পারিবেন না। কারণ তিনি হইলেন শেষ নবী।

৭। (ক) রাজকীয় ধর্মে কেয়ামত, সায়াত, হাশর, নশর, দ্বীন, দুনিয়া, জান্নাত, জাহান্নাম, কবর, মিজান ইত্যাদি অনেকগুলি ধর্মীয় মৌলিক শব্দের অর্থ পরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ উহাদের স্বরূপ পরিবর্তন এবং বিকৃত করিয়া উহাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে সত্য ধর্ম বিলীন হইয়া যায়। উহাদের সংজ্ঞাগুলির সঠিক স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে ধর্মদ্রোহী রাজাদের প্রবর্তিত অনেক অসত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হইয়া থাকে। বিকৃত অর্থে প্রকাশিত এই জাতীয় শব্দগুলির মোট সংখ্যা কম নহে। শতেক হইতে পারে। উহাদের সঠিক সংজ্ঞা না জানিতে পারিলে ধর্মের ভুল-ত্রুটি বুঝিয়া লওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। এই শব্দগুলির সঠিক সংজ্ঞা জানিতে পারিলে তাহাদের ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আবিষ্কারের অনেকাংশ ধরা পড়িবে। হাদিসের সত্য মিথ্যা যাচাই

করা অনেকাংশে সহজ হইয়া যাইবে এবং কোরানের বিকৃত তফসীর বুঝিতে সাহায্য করিবে।

(খ) বিপরীত মত - কোরানের উল্লেখিত মৌলিক শব্দগুলির প্রচলিত অর্থ নির্ভুল। রাজকীয় শ্রেষ্ঠ আলেমগণ বহু গবেষণা করিয়াই বর্তমানে প্রচলিত ধর্মীয় ভাবধারাগুলি সৃষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা সমাজের সংখ্যাধিক জনতা উহা নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অতএব এইগুলিতে সন্দেহ আরোপ করা চলিবে না। বহু রক্তপাত এবং হানাহানির পর সকল মতভেদ ডিঙ্গাইয়া প্রকৃত সত্য রাসুলুল্লাহর পাক মুখ হইতে নিঃসৃত কথাগুলি এবং তাহা দ্বারা ব্যক্ত করা তফসীর রাজাদের নিয়োজিত বিশিষ্ট আলেমগণের দ্বারাই সুনির্ধারিত হইতে পারিয়াছিল।

৮। (ক) কোরানের সূরাগুলির শানে নজুল এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন সূরার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর রাজকীয় তফসীরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক অলীক কাহিনী এবং মিথ্যা ঘটনাচক্রের অবতারণা করিয়া কোরানের সঠিক অর্থকে চাপা দেওয়া হইয়াছে। নাজেল হওয়ার ধারাবাহিকতা অনুসারে কোরান প্রকাশিত থাকিলে রাসুল জীবনের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে কোরানের গতি প্রবাহ মিলিয়াই থাকিত। সে অবস্থায় কোরানের কথা প্রবাহের শানে নজুল সন্ধান করিয়া বাহির করিবার কোন প্রয়োজনই থাকিত না। সমস্ত কথার শানে নজুল আপনা-আপনি রাসুলের জীবনের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সুস্পষ্ট হইয়া মিলিয়াই থাকিত। সেক্ষেত্রে কোরান নিজেই রাসুল জীবনের একটি ধারাবাহিক আলেখ্য হইয়া বিরাজ করিত। তাহা হইলে, বিরোধীগণের সপক্ষে মিথ্যা শানে নজুল পরবর্তীকালে সংযুক্ত করিবার কোনরূপ সুযোগ থাকিত না।

(খ) বিপরীত মত - রাসুলের নিকট যে ধারায় কোরান নাজেল হইয়াছিল তাহা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো। তৃতীয় খলিফা অধিকতর সামঞ্জস্যশীল করিয়া প্রকাশ করিবার খাতিরেই উহাকে প্রয়োজন মত আগে পিছে করিয়াছেন। এমনকি প্রয়োজনবোধে এক সূরার অংশবিশেষ কাটিয়া অন্য সূরার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন।

যে বাক্যগুলি তিনি সন্দেহযুক্ত মনে করিয়াছেন কেবল সেইগুলিই তাঁহার নিয়োজিত কোরান বোর্ড কর্তৃক ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কোরানের ভাবধারা অধিক সুদৃঢ় হইয়াছে এবং সমগ্র গ্রন্থটি ভাবগাভীর্যে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নাজেলের ধারা অনুসারে রাখিলে কোরান এত সুন্দর হইতে পারিত না। অতএব মানুষের খলিফা হিসাবে ইহা ছিল কোরানের প্রতি তাহার সুন্দর একটি অবদান। এই কারণে আজও তাহার নামে জুমার খোৎবাতে দোয়া পাঠ করা হয়।

- ৯। (ক) কয়েকজন হাফেজে কোরান তৈয়ারী করিয়া যাওয়া ছাড়াও রাসুলুল্লাহ (আ) নাজেলের ধারাবাহিকতা অনুসারে সুষ্ঠুভাবে সমগ্র কোরান মজিদ লেখকদের দ্বারা লিখিত আকারে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফার সময়ে হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন যাহারা রাসুলের সময়ের ধারা অনুসারে উহা মুখস্থ রাখিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় উদ্দেশ্যমূলক রাষ্ট্রীয় প্রকাশনাকে “কোরান সংগ্রহ করা বা সংকলন করা বা জমা করা” কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? এবং রাষ্ট্রনেতাকে কোরান জমাকারী বা সংকলক কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? কোরান তো হাজার হাজার কণ্ঠে জমা হইয়াই রহিয়াছিল। উহা হারাইয়া যাওয়ার মত অবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া ছিল না যাহার জন্য তৃতীয় খলিফাকে “জামিউল কোরান” অর্থাৎ কোরান সংকলক বা জমাকারী বলা যাইতে পারে। তাহাকে “জামিউল কোরান” বলিয়া মানিয়া লইলে এইকথাও মানিয়া লইতে হয় যে, মহানবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোরানকে সুষ্ঠুভাবে জমা না করিয়াই চলিয়া গেলেন, ভবিষ্যৎকালের মতভেদ এবং বিবাদের কথা একটুও চিন্তা করিতে পারিলেন না। ইহাও কি সম্ভব? না স্বাভাবিক? প্রকৃতপক্ষে রাসুল বংশের প্রতি শ্রদ্ধা করাই এইরূপ হইবার মূল কারণ ছিল না কি?

- (খ) বিপরীত মত - তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান কোরানকে নতুন করিয়া সংকলন না করিলে আজ আমরা বর্তমানকালে এমন সুষ্ঠু একটি কোরান কিছুতেই পাইতে পারিতাম না। এইরূপ সংকলন ছিল কোরানের প্রতি তাঁহার একটি বিশেষ অবদান।

- ১০। (ক) কোরানের মৌলিক কথা ত্যাগ করিয়া রাজাদের রচিত কাহিনীর মধ্যে কোরানের অর্থকে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছে যাহাতে সত্য কথার প্রকাশ সমাজে না থাকে। এইরূপে নিছক গল্পই তাহাদের তফসীরের বেশির ভাগ স্থান দখল করিয়াছে।
- (খ) বিপরীত মত - কোরানে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের পটভূমি হিসাবে সম্পূর্ণ কাহিনীগুলি বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত থাকার কারণে কোরানের ব্যাখ্যা বিস্তারিত ও মধুর হইয়াছে।
- ১১। (ক) ফেরেস্তাগণ দলে দলে বিভক্ত। ফেরেস্তাগণের একজন সরদার হইলেন জিবরাইল। জিবরাইল এবং অন্যান্য সকল ফেরেস্তাগণ নবী, রাসুল এবং উন্নতমানের মোমিনগণের খাদেম।
- (খ) বিপরীত মত - জিবরাইল রাসুলের (আ) চালক এবং শিক্ষক ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে সকল শিক্ষা জিবরাইল রাসুলুল্লাহকে (আ) শিক্ষা দিয়াছিলেন।
- ১২। (ক) নবী এবং রাসুলগণের আত্মশুদ্ধির জন্য আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহারাও যে সালাত পালন করিয়া থাকিতেন তাহা দলীয় লোকদিগের শিক্ষা দানের জন্য। নিজের জন্য নহে। ইহার কারণ সংযোগ লাভের জন্য পালন করিতে হয় সালাত। নবী ও রাসুলগণ সংযোগ লাভের মোকাম বহু পূর্বেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। মহানবী সম্বন্ধে তাহাও বলা চলিবে না।
- (খ) বিপরীত মত - নবী ও রাসুলগণ সাধারণ না হইলেও আমাদের মতই মানুষ। সেইজন্য তাহাদিগকেও আত্মশুদ্ধির জন্য না হইলেও আত্মোন্নতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সালাত পালন করিতে হইয়াছে। শুধু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নহে, তাহাদের নিজেদের জন্যও সালাত পালন করা অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসাবে থাকিয়াই যায়। ইহার কারণ নবী হইলেও একেবারে নির্দোষ কোন মানুষ কখনও হইতে পারেন না।
- ১৩। (ক) কোরানের সকল নির্দেশ মানুষের জন্য, রাসুলের জন্য নহে। এক বচনে ‘কা’ অর্থাৎ তোমাকে’ বলিয়া যত নির্দেশ কোরানে উল্লেখিত হইয়াছে উহাদের প্রায় সবগুলি মানুষকে এক বচনে সম্বোধন

করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু সরকারি তফসীরে এই হেদায়েতসমূহ মানুষের উপরে উল্লেখ না করিয়া রাসুলকেই হেদায়েত করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকে—তাঁহাকেও আমাদের মত গুনাহ-খাতার অধীন ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রমাণ করিবার জন্য।

- (খ) **বিপরীত মত** — একবচনে যে সকল উপদেশ ও নির্দেশ কোরানে দেওয়া হইয়াছে সেগুলি মুখ্যত রাসুল্লাহকে (আ) এবং গোঁণত তাঁহার অনুসারী সকল মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কোরানের বাণী দ্বারা নির্দেশ না দিলে রাসুল্লাহ তাঁহার কর্মকাণ্ডের হেদায়েত কোথা হইতে পাইতেন? রাসুলের গুনাহ-খাতা কম হইলেও অবশ্যই ছিল। এইজন্য হাদিসে তাঁহার গুনাহ-খাতার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অসহায় অবস্থা এবং মানবীয় দুর্বলতার উল্লেখ হাদিসে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইসব হাদিসের উল্লেখ না করিলেও আমরা তাঁহার মানবীয় দুর্বলতার প্রমাণ ও প্রকাশ কোরানেও দেখিতে পাই। এমনকি অতীতের গুনাহ তো তাঁহার ছিলই ভবিষ্যতে আরও গুনাহ তাহা দ্বারা হইয়া যাইবে তাহারও উল্লেখ কোরানে স্পষ্ট দেখা যায়। যথা : (৪৮ঃ১+২), (৩৩ঃ১) ইত্যাদি। এই দুইটি দৃষ্টান্ত তাঁহার নবী জীবনের শেষ পর্যায়ের বিষয় বা অবস্থা। অতএব আল্লাহর দৃষ্টিতে রাসুল্লাহ সহকারে সমগ্র মানবগোষ্ঠী গুনাহ-খাতা সম্পন্ন অপরাধী বান্দা। তাহাদের সবার হেদায়েতের জন্যই কোরান নাজেল করা হইয়াছে।

- ১৪।(ক) রাসুল্লাহ (আ) সর্বপ্রকার 'এলমে গায়েব'-এর অধিকারী মহানতম সত্যদ্রষ্টা। কাজেই অন্য সবার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ববিষয়েই নির্ভুল। কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন কিন্তু পরিণামে তাঁহার সিদ্ধান্তই সর্ববিষয়ে বলবৎ রাখিতেন এবং উহা নির্ভুল বলিয়া সর্বদাই প্রমাণিত হইতে দেখা গিয়াছে।

- (খ) **বিপরীত মত** — রাসুল্লাহর (আ) 'এলমে গায়েব' অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান ছিল না। তাঁহার যে পরিমাণ এলমে গায়েব ছিল তাহা

অপেক্ষা অধিক এলমে গায়েব অন্যান্য অনেক সৃষ্ট জীবের মধ্যেও আল্লাহতা'লা দান করিয়াছেন। অতএব তিনিও অন্য সবার মতই সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, এমনকি কোন কোন বিষয়ে দেখা গিয়াছে তাঁহার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা হযরত ওমরের সিদ্ধান্ত অধিক উন্নতমানের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। ইহা আমরা কোরানের অনেকগুলি তফসীরেও দেখিতে পাই। আমরা তাঁহার জীবনী হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি সবার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই সকল কাজ করিতেন। ইহাও তাঁহার সাধারণত্বের একটি প্রমাণ। নিজ বুদ্ধি দ্বারা সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেওয়ার পরিপূর্ণ জ্ঞান তাঁহার ছিল না।

- ১৫।(ক) নবী বংশীয় ইমামগণ কোরানের যেইরূপ ব্যাখ্যা প্রায় দুইশত বৎসর যাবত প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা ছিল রাসুল্লাহর দ্বারা প্রকাশিত এবং অনুমোদিত ব্যাখ্যার অনুরূপ। কারবালার ঘটনার পর নবী বংশের সমর্থক দল এত কমিয়া গিয়াছিল যে, সমাজ হইতে সত্য একেবারেই লোপ পাইতে লাগিল। বর্তমানে প্রচলিত রাজকীয় মিথ্যা ইসলাম তাহার স্থান দখল করিতে লাগিল। সত্য প্রকাশ করা সরাসরিভাবে প্রাণদণ্ডের কারণ হইয়া গেল। মারওয়ানের ছেলে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে মিথ্যা ইসলাম লিখিত পড়িতভাবে তাহার আপন স্থান দখল করিতে লাগিল।

তারপর আব্বাসী রাজত্বকালে ইমাম সাহেবদের প্রকাশিত ব্যাখ্যা যাহা মিয়মাণ অবস্থায় সমাজে তখনও বাঁচিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া সমাজ হইতে তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য যে সকল মিথ্যা হাদিস রচয়িতা রাজশক্তিকে সাহায্য করিল বোখারী তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। কোরানের বিশেষ বিশেষ কথার ব্যাখ্যা বোখারীর হাদিসে যেখানেই দেখা যায় উহাই এক একটি মিথ্যা ব্যাখ্যা এবং তাহার রচিত সেই হাদিসটি একটি মিথ্যা হাদিস। ইসমাইল বোখারী নিজের নামে কোরানের একটি বিস্তারিত মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রকাশ না করিয়া রাসুলের (আ) নাম করিয়া রাসুলের দ্বারা ই কোরানের অংশবিশেষের মিথ্যা ব্যাখ্যা হাদিসের মাধ্যমে প্রকাশ

করিয়াছেন। এইজন্য দেখা যায় যেখানেই বোখারীর হাদিসে কোরানের একটি উদ্ধৃতি সমেত একটি হাদিস লিখিত আছে উহাই একটি মিথ্যা হাদিস।

তারপর রাসুল বংশীয় ইমাম সাহেবদের দৈহিক উপস্থিতি শেষ হইয়া যাওয়ার পর মিথ্যার প্রতিষ্ঠা আরও পাকাপোক্ত হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল যেহেতু রাজশক্তির প্রচারিত মিথ্যাধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করিবার মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জগতে আর থাকিল না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাকালে মোহাম্মদী ইসলামকে জগত হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। যাহা রহিল তাহা মোহাম্মদের (আ) নামে মিথ্যা রাজকীয় ব্যবস্থা মাত্র।

- (খ) বিপরীত মত - ইমাম বোখারী মোহাম্মদসগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। ইহার কারণ ইমাম বোখারী অত্যন্ত সাবধানতার সহিত হাদিস সংগ্রহ করিয়াছেন যেন ভুল না থাকে। অতএব তাহার প্রকাশিত হাদিসের সত্যতার উপর অবিশ্বাস করিলে জাহান্নামে পড়িতে হইবে এবং ইসলামী শাসন সমাজে কায়ম থাকিলে প্রাণদণ্ডই তাহার জন্য একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবে থাকিবে। বর্তমান জগতে যেইরূপ ইসলাম ধর্ম রহিয়াছে তাহা মূলতঃ খাঁটি মোহাম্মদী ইসলামই রহিয়াছে। শাখা-প্রশাখার বিচার-বিশ্লেষণ বিস্তারিত রূপ ধারণ করার কারণে কালক্রমে ইহাতে অনেক মতভেদ আসিয়া হাজির হইয়াছে। অবশ্য এই মতভেদগুলি তাহাদের মতে মৌলিক নহে।

- ১৬।(ক) যৌন দুর্বলতা নবী ও রাসুলগণকে স্পর্শ করে না। তাঁহারা ইহার বহু উর্ধ্বে। রাজকীয় প্রকাশনা অনুযায়ী তিনি মহানবী হইয়াও যৌন দুর্বলতায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন, বিশেষ করিয়া যুবতী স্ত্রী আয়শাকে লইয়া অতিমাত্রায় মত্ত থাকিতেন। এই জাতীয় অসংখ্য মিথ্যা কথা ধর্মীয় সাহিত্যে সগৌরবে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, আয়শা এবং হাফসা রাসুলকে (আ) পদে পদে জ্বালাতন করিয়াছিলেন। তাহাদের কর্মকাণ্ডগুলি লুত নবী এবং নূহ নবীর অবাধ্য স্ত্রীর সঙ্গে তুলনীয় ছিল (৬৬ঃ১০-১২)। হাফসাকে

তালাক দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু আয়শা সাময়িকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার কারণে তাহাকে তালাক দেওয়া হয় নাই কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল মাওলা আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইমানহারা হইয়াই গেলেন। এই কঠিন সত্যটি চাপা দেওয়ার জন্য এবং মাওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েজ অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য রাজশক্তি মিথ্যা হাদিস রচনা করাইয়া তাহাকে মহীয়সী রমণীরূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

- (খ) বিপরীত মত - রাসুলুল্লাহ (আ) যেহেতু আমাদের মতই রক্ত-মাংসের মানুষ সেইহেতু তাঁহার যৌন দুর্বলতা থাকা অতি স্বাভাবিক। শরীয়তের আইনানুগ যৌন দুর্বলতা মোটেই দোষণীয় নহে। আয়শার প্রতি তাঁহার মনের যে অত্যধিক টান ছিল উহা আয়শার প্রতি গভীর ভালবাসারই নিদর্শন মাত্র।

- ১৭।(ক) রাসুলুল্লাহ (আ) উচ্চতম এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নবুয়ত নবীর চরিত্রের তথা নফসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। নবুয়ত নবীর নফসের মধ্যে আল্লাহ হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি সেফাত বিশেষ। বাহির হইতে প্রাপ্ত কিছু পরিমাণ কথার বোঝা বহন করিয়া মানুষের নিকট তাহা পৌছাইয়া দেওয়া নবুয়ত নহে। নবুয়ত একটি বিশেষ প্রকার গুণ এবং যোগ্যতার নাম-যাহা নবীর সমগ্র নফসের অভিব্যক্তির সঙ্গে মিশিয়া থাকে। মহানবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (আ) স্বরূপটি তাহা হইতেও স্বতন্ত্র মহানতম উন্নত বিশেষ একটি রূপ।

এইজন্য অহি বাহির বাহির পাওয়া বাণী নহে। ভিতর হইতে উৎসারিত বাণীর অপার নাম অহি। মহানবীর অহির হাল এত উচ্চমানের যে, তাহা অন্যান্য নবীগণের পক্ষেই কেবল বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে। সাধারণ মানুষ ইহার কিছুমাত্র বুঝিবার ক্ষমতাও রাখে না। প্রত্যেক নবী চব্বিশ ঘন্টার সর্বক্ষণের মধ্যেই তিনি নবী। অতএব মহানবীকে যাহারা চব্বিশ ঘন্টার সর্বক্ষণের জন্যই নবী মনে না করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মদ্রোহী এবং ভ্রান্ত মতবাদ বহন করে।

- (খ) বিপরীত মত - সাধারণ মানুষও নবী নিযুক্ত হইতে পারে। ইহা আল্লাহর মর্জি মাত্র। যে কোন একজন সাধারণ মানুষকে বাছাই

করিয়া তাহাকে নবী নিযুক্ত করেন। নবীকে মুখস্থ করিবার শক্তি দান করিয়া কতকগুলি কথা ফেরেস্তু মারফত পাঠাইয়া দেন মানুষের নিকট উহা ব্যক্ত করিবার জন্য। অতএব নবী চব্বিশ ঘন্টা জীবনের কিছুক্ষণ তিনি নবী বাকি সময় তিনি সাধারণ মানুষ। যতক্ষণ তিনি নবুয়তের কাজে লিপ্ত থাকেন ততক্ষণ তিনি নবী আর বাকি সময় তিনি আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। ঠিক যেমন একজন রাজকর্মচারী-যতক্ষণ তিনি কর্মচারীর আসনে আছেন ততক্ষণ কর্মচারী।

১৮।(ক) 'সরহে সদর' অর্থাৎ হৃদয় সম্প্রসারণ। সাধারণ কথায় ইহাকে 'সিনা চাক' বলা হইয়া থাকে। ফেরেস্তু দ্বারা অস্ত্রোপচার করিয়া রাসুলুল্লাহর (আ) সিনা চাক করার বিষয়ে যে সকল হাদিসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকটি মিথ্যা রচিত হাদিস। দৈহিক অস্ত্রোপচার করিয়া অন্তর পাক করার উদ্ভট মিথ্যা রটনা খুবই হাস্যকর। রাসুলকে গুনাহগার সাধারণ মানুষরূপে দাঁড় করাইবার জন্য শত শত মিথ্যা আবিষ্কারের মধ্যে ইহাও অন্যতম একটি মিথ্যা আবিষ্কার।

(খ) বিপরীত মত - রাসুল আমাদের মত একজন মানুষ। সুতরাং যে সকল দোষ-ত্রুটি মানুষের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক তাঁহার মধ্যেও সেইরূপই ছিল। আল্লাহপাক তাঁহাকে নবুয়তের কাজের যোগ্যতা দান করিবার জন্য এবং মেরাজ ভ্রমণের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া লওয়ার জন্য অন্তরের পাপ ধুইয়া ফেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ফেরেস্তু মারফত। এইরূপ শুদ্ধিকরণ তাঁহার জীবনে দুই, তিন অথবা চারিবার করা হইয়াছিল। সিনা চাক হওয়া বিষয়টি অন্যান্য সকল নবী হইতে মহানবীর একটি বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে।

১৯। পেটে পাথর বাঁধা :

(ক) ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাদ্যাভাবে নবী পেটের উপর পাথর বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া যে সকল উক্তি হাদিসে উল্লেখিত আছে তাহা একেবারেই মিথ্যা। নবী কখনও পেটে পাথর বাঁধেন নাই। নবীকে তুচ্ছ এবং হীন প্রমাণ করিবার জন্যই এইসব কথা এবং গল্পের আবিষ্কার করা হইয়াছে। মক্কায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি।

হিজরতের পর মদিনায় তিনি রাষ্ট্রনায়ক। এমতাবস্থায় ক্ষুধার যাতনায় কাতর হওয়ার প্রশ্ন আসে না। যদি ইচ্ছা করিয়া না খাইয়া থাকেন যেমন রোজার অবস্থায় থাকিতে হয় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধার কথা জগতে কোথাও প্রচলিত নাই এবং পূর্বেও কোন নবীর আদর্শের মধ্যে তাহা ছিল বলিয়া মনে হয় না। নবীকে যাত্রার দলের অভিনেতার মত রঙ্গিলা রাসুলরূপে যতরকমে সাজাইয়া লইয়াছে পেটে পাথর বাঁধা তাহার মধ্যে অন্যতম।

(খ) বিপরীত মত - রাসুলুল্লাহ (আ) ধৈর্য ও তিতিক্ষার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। পেটে পাথর বাঁধা তাহারই একটি নমুনা। পাথর বাঁধার হাদিসগুলি নিঃসন্দেহে সত্য কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেসের পুস্তক বোখারী শরীফে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

২০।

হালিমা :

(ক) আরবের তৎকালীন রীতির দোহাই দিয়া রাসুলুল্লাহকে (আ) দাই হালিমা দ্বারা প্রতিপালিত হইবার মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দুষ্ট রাজশক্তির দুইটি উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। প্রথমত, ইহাতে নবীকে কাফের রমণীর দুধ পান করাইবার অপবাদ দিয়া তাঁহাকে তুচ্ছ ও হীন প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা এইকথাও বুঝাইতে চাহে যে, শৈশবকালে নবী সত্যিকার নবী ছিলেন না। আমাদের শিশুগণের মতই সাধারণ একজন অবোধ শিশু ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত তাঁহার মায়ের দ্বারা লালন পালন ইত্যাদি বিষয়ের অলৌকিক মহিমার সকল বিষয় হইতে জনগণের দৃষ্টি সরাইয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে। মাতা আমেনাকে অস্পষ্ট এবং অজানা একটি সাধারণ ব্যক্তিরূপে জনমনের অবহেলার অন্ধকারে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি মহানবী হইয়া কিছুতেই কাফের রমণীর দুধ পান করিতে পারেন না। ইহার একটি প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি মুসা নবীর বাল্য জীবনে। মুসা নবী মায়ের দুধ ছাড়া ফেরাউনের রাজবাড়িতে অন্য কোন ধাত্রীর দুধ পান করেন নাই। ইহা আমরা ভাবিতেই পারি না যে, কেমন করিয়া স্বামীর শোকে জর্জরিত সদ্য বিধবা স্ত্রী তাঁহার সদ্যজাত একমাত্র সন্তানকে

কোল-ছাড়া করিয়া দিন কাটাইতে পারেন। তাহাছাড়া ধাত্রীকে বাড়িতে নিয়োগ করিয়া তাহার দ্বারা প্রতিপালন করাই ছিল সকল যুগের বড় লোকদের ব্যবস্থা। গরীবের বাড়িতে অনিশ্চিত অবস্থায় কিছুতেই সদ্যজাত শিশুকে ফেলিয়া রাখা যায় না। অতএব ধাত্রী মাতা সম্বন্ধীয় হাদিসগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা হাদিস।

- (খ) বিপরীত মত - রাসুলুল্লাহর (আ) ধাত্রী মাতা হালিমা সম্বন্ধে কত সুন্দর এবং অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং সেইগুলি এত বিস্তারিত যে, তাহা অতি আকর্ষণীয় এবং বাস্তবধর্মী। তাহা ছাড়া এইসব হাদিস সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদেদ মাহান ইমাম ইসমাইল বোখারীর লিখিত সহি বোখারী শরীফে উল্লেখিত আছে। কোরান শরীফের পরেই হইল বোখারী শরীফের স্থান। অতএব উম্মতে মোহাম্মদীকে হালিমা সংক্রান্ত সকল কথা বিশ্বাস করা প্রয়োজন।

২১। আশ্বারে মোবশ্শারা :

- (ক) মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'লা জান্নাতের সুসংবাদ তাহার নবীর মাধ্যমে যে দশ ব্যক্তিকে দিয়াছেন বলিয়া হাদিসে প্রকাশ আছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এইরূপ সুসংবাদ প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অবাস্তব এবং কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী। মাওলা আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে প্রমাণ করার জন্য পরবর্তীকালে এই সকল হাদিস রচনা করা হইয়াছে।

- (খ) বিপরীত মত - হাদিস গ্রন্থে “আশ্বারে মোবশ্শারা” নামক অধ্যায়ে এই দশজন ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। সুতরাং এইগুলি তাহাদের পরিচয় দানকারী বর্ণনা এবং চরম সত্যের প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

২২। মহানবীর পিতামাতা ও চাচা আবু তালেব :

- (ক) রাসুলুল্লাহর (আ) চাচা আবু তালেব আলাইহে সালাম খৃষ্টান হিসাবে তৎকালীন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এলহামের অধিকারী ছিলেন। রাসুলের পিতা আবদুল্লাহ (আ) তিনিও ছিলেন একজন খৃষ্টধর্মাবলম্বী মোমিন ব্যক্তি। রাসুলের মাতা মহীয়সী খৃষ্টান মহিলা আমেনা সালামাল্লাহে আলাইহা ছিলেন এলহামের অধিকারী একজন বিশিষ্ট মোমেনা।

- (খ) বিপরীত মত - রাসুলুল্লাহর (আ) মাতা-পিতা উভয়ই কাফের ছিলেন। তাহার পালনকারী চাচা আবু তালেব এমনই শক্ত প্রকৃতির কাফের ছিলেন যে, সারা জীবন রাসুলের সংশ্বে থাকিয়াও তাহাকে চিনিতে পারে নাই এবং নবী বলিয়া স্বীকারও করেন নাই যদিও ভাতিজা হিসাবে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহার ফলে তিনি তাহাকে ও তাহার প্রচারিত ইসলামকে শক্তিশালী আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। তিনি এমন কাফের ছিলেন যে, মৃত্যুর সময়েও রাসুলের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ইসলামের উপর এবং নবীর উপর ইমান আনার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রাসুল বহু অনুরোধ করিলেন শুধু একবার কানের কাছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” মুখে উচ্চারণ করিবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা উচ্চারণ করিতে রাজি হইলেন না।

২৩। কোরান নাজেলের স্থান বিষয়ে মতভেদ :

- (ক) ১১৪টি সূরার মধ্যে কোন্ সূরা মক্কায় এবং কোন্ সূরা মদিনায় নাজেলা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন্ একটি মতভেদ থাকাও সম্ভব নহে এবং তাহা মোটেই স্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমরা আজ কমপক্ষে ২০টি সূরা সম্বন্ধে মতভেদের চিত্তারোপে ভুগিতেছি। ১৪ শত বৎসর পরেও ইহা স্থির করা সম্ভব হইল না। ইহা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের প্রথম আশ্চর্য বিষয়। মক্কায় ১৩ বৎসরে কতটুকু নাজেলা হইয়াছিল এবং মদিনায় দশ বৎসরে পরবর্তী কোন্ সূরাগুলি নাজেলা হইয়াছিল তাহা লক্ষাধিক অনুসারী থাকা সত্ত্বেও বেমালাম ভুলিয়া গিয়াছিল কি? ইহা ভুলিয়া যাওয়া কি সম্ভব? আসলে কেহই ভুলে নাই। কিন্তু পরবর্তী রাজশক্তি তাহাদের ক্ষমতার বলে জনমত বদলাইয়া লইয়াছিল। এইজন্য এই বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

- (খ) বিপরীত মত - মতভেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বহু যুগ অতীত হইয়া গেলে সব বিষয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু মতভেদ আসিবেই। সুতরাং নাজেলের স্থান বিষয়ে বর্তমানকালের মতভেদ কোন্ দলের নিজস্ব সৃষ্টি নহে। ইহা স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে।

জনৈক পাঠকের মন্তব্য

মানবজীবন ধর্মনির্ভর। ধর্ম মানে ঘটনা, ঘটনা মানে সময়। আর সময় হচ্ছে ধর্মের ব্যাপ্তিকাল বা Duration. প্রত্যেকটি ধর্ম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমাদের কাছে আসে, আবার চলে যায়। আল কোরাআনের ভাষায় ধর্মের এই Duration কে বলা হচ্ছে “ইয়াওমুদ্দিন” অর্থাৎ দ্বীনের কাল (Duration of Dharma)। ধর্ম নিত্য বা স্থায়ী (Static) ব্যাপার নয়, পরিবর্তনশীল। ধর্ম অনিত্য, ধর্মের উদয় আছে, ধর্মের বিলয় আছে। তাই ধর্ম অসার, ধর্ম অনাত্ম। ধর্মের উপর নির্ভর করা যায় না।

ধর্ম বা নফস কি?

একমাত্র গুরু ছাড়া, মোহাম্মদ (আ) ছাড়া বাকি সব কিছু নফস বা ধর্ম। তথাকথিত বিশ্বাস ও অবিশ্বাস ধর্ম। ভক্তি-অভক্তি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-ভয়, কামনা, জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু, জন্ম, সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, জ্বালা-যন্ত্রণা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ভাবসমূহ বা মন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক কথায় আমাদের দেহ ও মনে যা কিছু রয়েছে অর্থাৎ গোটা অস্তিত্বের সবটাই নফস বা ধর্ম। আর এই নফসের বন্ধনই আমাদের বন্দীদশা। মানুষের যে কোন ভাব ও অবস্থা তার মধ্যকার লোভ, দ্বेष এবং মোহ-এই তিন অবস্থা থেকে জন্মলাভ করে। আমাদের সপ্ত ইন্দ্রিয়ের এক একটিতে অনবরত ধর্ম বা বিষয়ের আঘাত দৃশ্য, শব্দ স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, ভাব ইত্যাদি রূপে লোভ, দ্বেষ ও মোহ-এই তিন যোগ শক্তির দ্বারা সংস্কার বা স্মৃতিতে পরিণত হয়। এই স্মৃতি বা সংস্কারগুলোর নামও ধর্ম বা নফস। কিন্তু সকল রকম ধর্ম, সংস্কার বা নফসের বন্ধন মুক্তির জন্য ‘ইসলামের’ প্রয়োজন। ইসলাম ছাড়া মুক্তির ব্যবস্থা নেই। ইসলামই মুক্তির একমাত্র এবং মোক্ষম বিধান।

তাহলে ইসলামটা কি?

প্রাথমিকভাবে ইসলাম অর্থ ভক্তি বা সমর্পণ। মহাগুরু মাওলা মোহাম্মদ (আ) ও তাঁহার সন্তানের উপর সমর্পণের নাম ভক্তি বা ইসলাম। মহামানবের উপর ভক্তিহীন, সমর্পণহীন অবস্থায় ইসলাম হয় না। কিন্তু মূলত ইসলাম মানে যারা প্রভু গুরুর উপর শর্তহীন সমর্পণের দ্বারা নিজেকে পরিপূর্ণ খালি বা

সংস্কার শূন্য করল; অর্থাৎ ধর্ম বা নফস মুক্ত হলো। সেটি হলো ইসলামের পূর্ণ সাফল্য। জ্বী তার স্বামীমুখী, কেন্দ্রমুখী হয়ে থাকল। সেটিও ইসলাম হলো। নিম্নতর মন, উচ্চতর মনের উপর নির্ভরশীল, সেই অবস্থার নামও ইসলাম। তাই বিশ্ব সংসারে ইসলামটা নেই কোথায়? এছাড়া ইসলামের আরো একটি বক্তব্য হচ্ছে জ্ঞানান্তর বা রূপান্তরবাদ। কিন্তু সত্তার উপাদান বা সংস্কারহীনতার কারণে সে আবার ফিরে আসে না, এটিও ইসলামে নিহিত আছে। শব্দময় উচ্চারণের দ্বারা ইসলাম হয় না, আবার ইসলামহীন জীবন অসম্ভব।

স্থায়ী বিধি-বিধান ও ধর্মরূপে সম্যক গুরুর নিয়ন্ত্রণহীন যে ইসলামকে সমাজ আজ গ্রহণ করেছে, সেই ধর্ম ব্যবস্থায়ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্নতা দেখা যায়। ধর্ম সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির অভাবে অনড় ও অপরিবর্তনীয় অল্প কিছু সংখ্যক কর্ম এবং অনুষ্ঠানকে তারা ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে। এই অপরিবর্তনশীল ধর্ম ও বিভিন্ন গোত্র এবং সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, আর তখনই আসে একটির সাথে অপরটির দ্বন্দ্ব। মোটামুটিভাবে এই কারণটিই লেখকের “ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ” রচনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

মোহাম্মদ (আ) এবং তৎপূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের জীবন দর্শনে কোন পার্থক্য নেই-থাকতে পারে না-থাকবেই না। মোহাম্মদ (আ) এবং তৎপ্রতিনিধি স্থানীয় লোক ছাড়া যে কেউ কোরানে হাত দিলে ভুল হওয়া বা ভুল ব্যাখ্যা হওয়া স্বাভাবিক। একটা ধর্ম বা বিধানের নির্যাস যখন কোন সত্তা আহরণ করে এবং মজ্জাগত করে তখন তার চেয়ে উন্নত ধর্ম বা বিধান একমাত্র সম্যক গুরুই প্রদান করবে এবং এইভাবে সর্বধর্মের সত্য আহরণের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী ধর্মে পৌছতে হবে। ধর্ম কোন Static ব্যাপার নয়-পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনশীলতা জীবন-দর্শন হাসিলের জন্য আনয়ন করতে হবে গুরুর মাধ্যমে।

ধর্মের উদ্দেশ্য বা বিধানের উদ্দেশ্য ওটাকে স্থায়ীভাবে ধারণ করা যায়। বরং আপাতত ধারণ করে সত্য, আহরণের পর ওটাকে পরিণামে বর্জন করাই উদ্দেশ্য এবং এরও কারণ ওটা পরিবর্তনশীল। একক সত্তার বা নির্দিষ্ট উপাস্যের পূজা ততদিন সম্ভব নয়, যতদিন না শেরেক বর্জন করা যায় এবং সূক্ষ্ম অর্থে ধর্মকেও বর্জন করা যায়।

মানুষ (?) মোহাম্মদ-ঈসা-মুসা-দাউদ-বুদ্ধ ও কৃষ্ণের ধর্মেই শুধু মতভেদ সৃষ্টি করে ক্ষান্ত নয় বরং তাদের যে কোন একজনের নামের উপরও চলেছে হাজারো মতভেদ। এই মতভেদের মূলে কারা, সেটা জানা ধর্মের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি। কারণ এসব না জেনে ধর্মের পথে পা বাড়ানো অন্ধের হাতি দেখার শামিল। বিভিন্ন নবী-রাসুলদের প্রচারিত দর্শনে যদিও কোন পার্থক্য নেই তবুও ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে জাগতিক উচ্ছিষ্ট-ভোগী একদল বেয়াকুব বা জ্ঞানপাপী মতভেদ সৃষ্টি করে সর্বজনীন শান্তির ঐক্যকে বিনষ্ট করে চলেছে এবং সেই জ্ঞানপাপীদের একটা অংশ মোহাম্মদী ইসলামকেও ভেঙ্গে খান খান করে তার আসল রূপ সরিয়ে দিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ফেরকা বা মতভেদ। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার সূফী সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী সাহেব তাঁর রচিত “ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ” গ্রন্থে চোখে আব্দুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কেন আখেরী নবী, নবীকুলের সর্দার, গুরুদের গুরু, মহাগুরু মাওলা মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোস্তফা (আ) প্রবর্তিত ধর্মে আজ এত মতভেদ। এই মতভেদের স্বরূপ কি? কে কখন কারা কেন এই মতভেদের বুনিয়াদী ভিত্তি স্থাপন করেছিল? “ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ” বলে গ্রন্থকার মোহাম্মদী ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। সালাতওয়ালা মা সালাতী সত্তা ছাড়া এসব মতভেদের কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। সূফী সাধক সদর উদ্দিন সাহেব একজন সালাতওয়ালা সত্তা এবং তাঁহার আত্মার ফলকে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা যা অনুভব করেছেন তা সত্যসন্দানী সত্তার জন্য গ্রন্থাকারে পরিবেশন করেছেন। সাধারণ পাঠকদের জন্য এই গ্রন্থ তাদের মননে ও চিন্তায় আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং অগ্রগামী পাঠকদের জন্য এটা মোহাম্মদী দ্বীনের শাস্ত্র আলোর পথের আলোকবর্তিকা বহনকারী একখানা গ্রন্থ। যারা সত্য পেতে চায় বা সত্য ধারণ করতে চায় বা সত্য জানতে চায়, তাদের জন্য সত্যানুসরণের পদ্ধতি আবিষ্কারে এবং তা ধারণে সহায়ক এই গ্রন্থ। মোহাম্মদী ইসলামে কেন এত মতভেদ, এত ফেরকা তা না জানলে ধর্মের ব্যাপারে বর্ণ পরিচয়ই হলো না। বিভিন্ন ফেরকার মাঝে বন্দী থেকে সত্য পাওয়া যায় না। এই সত্যটুকু অনুভব করে তারপর গুরুর মাধ্যমে ধর্মের পথে এগুলো সেখান থেকে অনুশীলনী সত্তার কল্যাণ আশা করা যায়। মোহাম্মদী ইসলামকে জানতে হলে মোহাম্মদকে জানতে হবে—যিনি গুরুদের গুরু, ইমামদের ইমাম,

মহাগুরু ও মহা ইমাম-নবীদের সর্দার। অত্যন্ত অনুতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, মোহাম্মদ (আ)-কে জানার উৎস হচ্ছে কোরান ও ইতিহাস। অথচ কোরানের মোহাম্মদ ও ইতিহাসের মোহাম্মদ (আ) এক নয়, রাজশক্তির রচিত ইতিহাস থেকে কোরানের মোহাম্মদ (আ) পাওয়া যায় না। এবং এজন্যই আজ এত মতভেদ। মোহাম্মদকে (আ) না জেনে মোহাম্মদী ইসলাম জানা, মানা ও পালন করা সম্ভব নয়। কাজেই মোহাম্মদকে (আ) জানতে হলে জানতে হবে কোরানের আলোকে। কোরানের তফসীরের উপরও রয়েছে রাজশক্তির যথেষ্ট প্রভাব। প্রচলিত কোরানের অনুবাদ ও তফসীরে রাজশক্তির প্রভাব বিদ্যমান থাকায় সেখান থেকেও পরিপূর্ণভাবে মোহাম্মদকে (আ) জানা সম্ভব হচ্ছে না। মাওলাইয়াতকে অস্বীকার করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে সেটাকে ভিত্তি করে উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজশক্তির বলয়ে তাদের দালালদের দ্বারা রচিত ইতিহাস ও তফসীর থেকে মোহাম্মদকে (আ) জানা আদৌ সম্ভব নয়। আর মোহাম্মদকে (আ) না জেনে মোহাম্মদী ইসলামকে জানার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। বর্তমানে মোহাম্মদকে (আ) জানার একমাত্র উৎস হচ্ছে কোরান এবং এর জন্য দরকার কোরানের ভাব উদ্ধার করা। পুঁথিগত বা হাওলাত করা বিদ্যায় কোরানের ভাব উদ্ধার সম্ভব নয়। আত্মার ফলকে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সাধনা করলে অর্থাৎ সালাতওয়ালা হলেই কেবল কোরানের ভাব উদ্ধার সম্ভব। কোরানের ভাব উদ্ধার করতে না পারলে মোহাম্মদকে (আ) জানা হবে না—মোহাম্মদকে (আ) জানা না হলে মোহাম্মদী ইসলামকে জানা হবে না এবং মোহাম্মদী ইসলাম জানা না হলে মোহাম্মদী ইসলামে যে মতভেদ চলছে তা জানা, বুঝা বা আবিষ্কার করা বা সত্য গ্রহণ বা মিথ্যা বর্জন কিছুই হবে না, সবই বৃথা। এমতাবস্থায় আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের তাকদীর বা কর্মবৃত্তের অবনতি স্বাভাবিক। এই অবনতির হাত থেকে মুক্তি পেতে সত্যসন্দানী অনেক সত্তাই এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছে এবং বিভিন্ন ফেরকাবাজির বলয়ে নাজেহাল হচ্ছে। যারা ফেরকাবাজিতে বা মতভেদে বিশ্বাসী তারা সত্য থেকে দূরে। শ্রদ্ধেয় সদর উদ্দিন সাহেবের গ্রন্থখানা যে সত্যসন্দানীদের জন্য কতটুকু সহায়ক, সেটা কেবল তারাই অনুভব করতে পারবে যারা সত্যের অভাব অনুভব করছে। কোরানের ভাব উদ্ধারে সালাতের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে গ্রন্থকার যে সত্য দেখতে পেয়েছেন, সে সত্যই তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। “ইসলাম

ধর্মে মতভেদের কারণ” এসব গ্রন্থের একটি। সম্যক ইমাম বা গুরু বা তাঁদের লিখিত গ্রন্থের অনুসরণ ও অনুশীলন ছাড়া সত্য পাওয়া বা বুঝা বা ধারণ করা সম্ভব নয়—আমরা যারা সাধারণ সত্তা (মানব) তাদের জন্য। গ্রন্থকারের অবদান মিথ্যার পরিধিকে কেন্দ্রবিন্দুতে না নিয়ে গেলেও এর পরিধিকে যে ছোট করে দেবে এটা একেবারে নিশ্চিত। যে আত্মা যা অর্জন করে—সে আত্মা তাই ভোগ করে এবং যা অর্জনে নেই সে তা পাবেও না কাজেই অর্জন করে নেওয়া চাই গুরুর শিক্ষার মাধ্যমে। অথচ অর্জন হচ্ছে না ফেরকাবাজির বা মতভেদের গোলকধাঁধায়। তাই ফেরকাবাজির উর্ধ্বে উঠে গুরুর নির্দেশে সঠিক পথে এগুতে পারলে অর্জন আরম্ভ হবে বা অর্জনের পথ পাওয়া যাবে। ফেরকাবাজি বা মতভেদের অবসানের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং তা অবলোকনে গ্রন্থকারের অবদান সত্যসন্দ্বাদী সত্তার চিত্তে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে বিরাজ করবে।

হযরত আলী (আ)-এর কিছু ভাষণ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে বিধায় সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদিত “নাহজুল বালাগা” সম্বন্ধে দু’একটি কথা বলার তাগিদ অনুভব করছি। গ্রন্থকার সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী তাঁর গ্রন্থে যে কয়টি ভাষণ সন্নিবেশিত করেছেন, সেগুলো হুবহু Reproduce করে তারপর অনুবাদ করেছেন এবং তা করেছেন পাঠকবর্গের সুবিধার্থে যাতে প্রক্ষেপ বা পরিত্যাগ-এর কোন প্রশ্নই না উঠে। এতে করে গ্রন্থকারের সততার পরিচয়টুকু স্পষ্ট। অপরপক্ষে আলী আহসান সাহেব যে অনুবাদ করেছেন তাতে আন্তরিকতা ও সততার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্যের বিষয়। ভাষণের পর টীকা এবং ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি যেন শিয়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। অনুবাদ করেননি। তিনি করেছেন ভাবানুবাদ। তাও আবার তাঁর বা তাঁদের সুবিধামত যা গ্রহণ করার, গ্রহণ করেছেন এবং যা পরিত্যাগ করার, পরিত্যাগ করেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আল্লামা রাজীর সংকলনটিতে প্রক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ ক্রমশ বিভিন্ন সময়ে ঘটে থাকবে। প্রক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ আছে কিনা আমরা জানি না। থাকতেও পারে-নাও থাকতে পারে। যদি থাকে সে দায়িত্ব সংকলনকারীর, অনুবাদকের নয়।

অনুবাদক হিসেবে সৈয়দ আলী আহসান সাহেব কেন যে এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তা বুঝা দুষ্কর। নাকি আলীর (আ) সাথে তার

স্বপ্নে যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে বলে দিয়েছেন যে, “এই ভাষণ বা ভাষণের অংশ আমার নয়—প্রক্ষেপ, আপনি এগুলো পরিত্যাগ করে অনুবাদ করুন”—তা কেবল আলী আহসান সাহেবই জানেন। যদি স্বপ্নযোগে এই অহি পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি যথার্থ কাজ করেছেন এবং যদি না হয় তাহলে ফেরকাবাজির ভিতকে মজবুত করতে তিনি অনুবাদক হিসেবে আন্তরিকতা ও সততাকে পরিহার করেছেন। শিয়াদের দোষত্রুটি নেই তা নয়। তবুও শিয়াদের মৌলিক ভিত্তিগুলো যে আলী আহসান সাহেবদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী তা জেনেই “নাহজুল বালাগা” অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি এসব তালগোল পাকিয়েছেন। কারণ হুবহু অনুবাদ করলে যে শিয়াদের হাতই শক্তিশালী হবে এটা তিনি ভাল করেই জানেন। অনুবাদক হিসেবে হুবহু অনুবাদ করা তার উচিত ছিল। তিনি পাঠককে জানতেই দেবেন না কোন ভাষণে কি ছিল, এটা তার মত লোকের কাছ থেকে আশা করা কষ্টকর ব্যাপার। তিনি অনুবাদকের ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কার স্বার্থে এটা বুঝা খুব কঠিন নয়। তার অনূদিত “নাহজুল বালাগার” ৭২ পৃষ্ঠায় মোটা হরফে আলী (আ)-এর ভাষণের একটি বাক্য “যদি কেউ বলে, আমি এরকম শুনেছি, তবে তাকে মিথ্যা ধরবে। সত্য স্পষ্ট হবে, বলতে হবে আমি দেখেছি।” এখন আলী আহসান সাহেবের কাছে প্রশ্ন—আপনি কি নিশ্চিত যে, আল্লামা রাজীর সংকলনে প্রক্ষেপ আছে এবং যদি নিশ্চিত হন তাহলে তার ভিত্তি কি? আলী (আ) এর সাথে কি আপনি কথা বলেছেন, নাকি তাঁর ভাষণগুলো আপনি শুনেছিলেন? যদি তাই না হয় আপনি প্রক্ষেপের অজুহাতে কেন ভাষণের অংশবিশেষ পরিত্যাগ করেছেন তা আমরা জানি না। যেহেতু আপনার অবলম্বন ছিল আল্লামা রাজীর সংকলন, সেহেতু সেটার প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত ছিল। কারণ সেটা আপনার নিজস্ব সৃষ্টি ছিল না যে, আপনার মনগড়া মত যা ইচ্ছে তাই করবেন। আর যদি সেটার প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধ না-ই থাকে তবে এটা অনুবাদ করতে যাওয়া আপনার ঠিক হয়নি এবং ঠিক হয়নি অনুবাদক হিসেবে আন্তরিকতা ও সততাকে পরিহার করা। আলী আহসান সাহেব “অনুবাদকের নিবেদন”—এ উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম খলিফা মোহাম্মদ (আ)-এর সর্বশেষ অসুস্থতার সময় ইমামতী করেছেন বিধায় তাঁকেই রাসুলের অবর্তমানে মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সাব্যস্ত করেছিলেন। যদি এটাই সত্য হয় তাহলে প্রথম

খলিফা নির্বাচনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেন? ইমামতি যদি সত্য হয় এবং খেলাফতের মাপকাঠি হয়, তাহলে নির্বাচন কেন? আর নির্বাচনের দোহাই দিয়ে ইমামতির দোহাই কেন? আর এই নির্বাচনে কারা অংশগ্রহণ করেছিল এবং কোথায় হয়েছিল সেটা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জ্ঞাত। তিনি আরো লিখেছেন প্রথম খলিফার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খলিফা নির্ধারণে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ প্রথম খলিফাই দ্বিতীয় খলিফা মনোনীত করে গিয়েছেন বিধায় বিশ্বাসী মুসলমানেরা প্রথম খলিফা আবু বকরের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। অথচ বিশ্বাসী মুসলমানেরা মোহাম্মদ (আ) এর গাদিরে খুমের সিদ্ধান্তকে মানতে পারছেন না, নাকি মানলেন না-সে সম্পর্কে আহসান সাহেব কোন আলোকপাত করেননি। নাকি এড়িয়ে গিয়েছেন সেটা তিনিই জানেন। আবু বকরের সিদ্ধান্ত না মানলে কি, সেটার উত্তর আলী আহসান সাহেবরা বরাবরই কৌশলে এড়িয়ে যান। আলী আহসান সাহেবের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুবাদের নামে বিচারকের ভূমিকা সালাতী সত্তা বা সত্যসন্ধানী (আমানু) সত্তার নিকট পরিষ্কার। তাঁর অনুবাদের টং, ভূমিকা ও টীকার বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি ফেরকাবাজিতে বন্দী হয়ে আছেন এবং তার মস্তিষ্কে যথেষ্ট অস্পষ্টতা বিদ্যমান এবং এটা সালাতী সত্তা ছাড়া আমাদের মত সাধারণ সত্তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সাধারণ সত্তার ধারক উপরন্তু ফেরকাবাজির বন্দীত্ব বা দাসত্ব গ্রহণ করে আলী (আ)-এর ভাষণের মূল্যায়নে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ধৃষ্টতার শামিল। ফেরকাবাজিতে বিশ্বাসী লোকের পক্ষে সত্য আবিষ্কার সম্ভব নয়। “আলী আহসান সাহেব কি বুকে হাত রেখে বলতে পারবেন যে, তার মস্তিষ্কে কোন রাইবা অস্পষ্টতা নেই তিনি যা লিখেছেন তা সত্য এবং সালাতের মাধ্যমে অর্জিত? তিনি আরো একটি কথা লিখেছেন তার ভূমিকায়-সেটা হলো “বিশ্বাসী মুসলমান”। এ শব্দদ্বয় দ্বারা কি তিনি মুসলমানকে ভাগ করে দিলেন? যারা বিশ্বাসী তারাই মুসলমান। মুসলমান মাত্রই বিশ্বাসী। সেখানে বিশ্বাসী মুসলমান বলে কাদেরকে তিনি অবিশ্বাসী মুসলমান বানালেন সেটা তিনিই জানেন। মোদ্বাকথা, “বিশ্বাসী মুসলমান” একটা যেমনি বিভ্রান্তিকর, তেমনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আবু বকরের সিদ্ধান্ত মেনে একদল হলো বিশ্বাসী মুসলমান এবং না-মেনে আরেক দল হলো অবিশ্বাসী মুসলমান এবং এভাবে সেই থেকে মোহাম্মদের (আ) উম্মতদের ভাগাভাগি করে আজ পর্যন্ত নিয়ে

এসেছে। অথচ কারো মুসলমানিত্বে এতটুকু আঘাত আসছে না। অপূর্ব আলী আহসান সাহেবদের মুসলমানের সংজ্ঞা! শিয়াদের সামনে রেখে তিনি যে অনুবাদের নামে তালগোল পাকিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর। এবং বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা বিতারিত সত্তার কাজ বিধায় হজ্জের পর গাদিরে খুমের ঘটনা, আলী ও আমি অথও নূর হতে উদ্ভূত, আলী আমার আহলে বাইত, আলীর সাথে কারো বিরোধ হলে জানবে আলীই সঠিক পথে রয়েছেন, আমি জ্ঞানের নগর আলী হচ্ছে সেই নগরের একমাত্র দরজা, জামাজোড়া ওয়ায়েস করনীকে প্রদান এবং ওটা হস্তান্তরে ১১ বছর বিলম্ব, কোথাও প্রতিনিধি প্রেরণ করলেই আলীকে নির্বাচন করা, যে আলীকে গালি দেয় সে আমাকেই গালি দেয়, যে আলীকে বোগজ করে সে আমাকে বোগজ (হিংসা) করে। আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। আমি আলী হতে এবং আলী আমা হইতে। আলী (আ)-এর অনুকূলে এরকম আরো বহু শক্তিশালী প্রমাণ (হাদিস) থাকা সত্ত্বেও কেন যে আলী আহসান সাহেবরা সবকিছু বেমালুম ভুলে যান বুঝা কঠিন। বাগে ফিদাক নামক বাগানের দলিল-যার দাতা ছিলেন মোহাম্মদ (আ), গ্রহীতা ছিলেন ফাতেমা (আ), লেখক ছিলেন আলী (আ) এবং সাক্ষী ছিলেন হাসান ও হোসাইন (আ)। এমন একটি দলিলকে বাজেয়াপ্ত করে বাগে ফিদাককে সরকারীকরণের মাধ্যমে আলী (আ)-কে ইহুদীদের দিন-মজুরে কে পরিণত করেছিল? মোহাম্মদের (আ) দাফন কার্যে মাওলাইয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা প্রকারান্তরে খেলাফত প্রতিষ্ঠাকারীরা কেন অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং কেনই বা আল্লাহর নবীর মনোনীত লোককে খলিফা হিসেবে না নিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করেছিল? সেখানে কেন নির্বাচনের প্রক্রিয়া এসেছিল? কার নেতৃত্বে আলী (আ) এর গৃহে আগুন দেয়া হয়েছিল। কার লাথির আঘাতে মা ফাতেমার (আ) হাত ভেঙ্গেছিল এবং তাঁর গর্ভজাত সন্তান নষ্ট হয়েছিল? কেন একটি বংশকে নির্বংশ করা হয়েছিল? এসবের বুনিয়াদী ভিত্তি কে বা কারা, কেন স্থাপন করেছিল? শিয়াদের এসব প্রশ্নের উত্তরে আলী আহসান সাহেবরা কি বলবেন জানি না। তবে এটা জানি যে, তারা কোন উত্তর দিতে পারবে না, কিন্তু প্রলাপ বকতে পারবে। কারণ প্রলাপ বকার পাকাপোক্ত ভিত্তি উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজশক্তি আলী আহসান সাহেবদের জন্য রচনা করে রেখেছেন। যা হোক কাদাতে নামলে পায়ে কিছুটা কাদা লাগা স্বাভাবিক। আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থ “ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ”-

এ নাহাজুল বালাঘা'র কয়েকটি ভাষণ থাকাতে আলী আহসান সাহেবের অনুবাদটির উপর কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। কারণ তাঁর অনুবাদ এবং সদর উদ্দিন চিশ্তী সাহেবের অনুবাদে আন্তরিকতা ও সততার দিক থেকে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাঁর অনুবাদের মূল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য পাঠক সমাজকে বিভ্রান্তিকর পরিবেশে না ফেলা।

পরিশেষে গ্রন্থকারের গ্রন্থটির বহুল প্রচার আশা করছি সত্যসন্ধানী সত্তার কাছে। যারা সত্যসন্ধানী এবং ইসলাম ধর্মে মতভেদ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী এবং অগ্রসর পাঠক, তাদের জন্য এই গ্রন্থ একটি মাইল ফলক। সত্যের জয় হোক, মিথ্যার ক্ষয় হোক—সব মতভেদের অবসান হোক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

“মাওলার অভিষেক” ও “ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ”

বই দুটি সম্পর্কে বিজ্ঞ জজদের মতামত ও রায়

২৪-৯-৯০

১৩-১০-৯০

১৩-১১-৯০

১-১২-৯০

HEADING OF JUDGEMENT OF APPELLATE COURT, COURT OF SESSIONS, APPELLATE JURISDICTION.

The

1990

Cr.Appeal No.560/1984.

Present: জনাব মোঃ ফজলুল করিম, অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য়
আদালত, ঢাকা।

Appeal from the order of
of

Magistrate
dated

JUDGEMENT :

ইহা কেরানীগঞ্জ পি, এস, কেইস নং ৪ (১২) ৮৩ হইতে উদ্ভব হওয়া জি, আর নং ১১/৮৪ মামলায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের বিগত ৩০/১০/৮৪ ইং তারিখের রায় ও দণ্ডদেশের অসম্মতিতে আপীলকারী আসামী সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতীর পক্ষে আনীত ফৌজদারী আপীল।

সংক্ষেপে প্রসিকিউশন পক্ষের বক্তব্য হইল যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৪/১১/৮৩ ইং তারিখের ৯০৯ HA/ROLL (III) নং স্মারক মোতাবেক কেরানীগঞ্জ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাদী হইয়া ২২/১২/৮৩ইং তারিখে এজাহার দায়ের করেন। এজাহারে উল্লেখ করা হয় যে, আসামী সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতি “ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ” ও “মাওলার অভিষেক” নামক বই দুইখানির লেখক এবং উক্ত বই দুইখানি লেখা হইয়াছে—

“With the deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of the Muslims of Bangladesh.” উপরোক্ত

এজাহারের ভিত্তিতে তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, আলামত জন্ম করেন এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার অভিযোগপত্র দাখিল করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিচারের সময় আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২৯৫ (এ) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া আসামী সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতিকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করতঃ ১,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৪ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত রায় ও জরিমানার অসম্মতিতে আসামীপক্ষ হইতে অত্র ফৌজদারী আপীল আনয়ন করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় :

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিগত ৩০/১০/৮৪ ইং তারিখের রায় ও দণ্ডদেশ সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিবার সংগত কোন কারণ আছে কি?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

নিম্ন আদালতের নথি, প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ, আসামী পক্ষের সাক্ষ্যই সাক্ষীগণের সাক্ষ্য, বিরোধীয় বই দুইখানি ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের ৩০/১০/৮৪ ইং তারিখের তর্কিত রায় পর্যালোচনা করা হইল।

নিম্ন আদালতের নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রসিকিউশন পক্ষে সর্বমোট ৩ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে এবং আসামী পক্ষে ৩ জন সাক্ষীই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। পক্ষগণ পরস্পরের সাক্ষীগণকে জেরা করিয়াছে।

প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী সহকারী দারোগা সফিকুল ইসলাম (পি, ডব্লিউ-১) তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, ২৮/৩/৮৩ ইং তারিখে তিনি পুলিশ সুপারের নির্দেশে এই মামলার আসামী সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতির কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়ার চিশতিয়া আস্তানা হইতে “ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ” ও “মাওলার অভিষেক” নামক দুই প্রস্তকার ৪টি বই জন্ম করেন। তিনি (পি, ডব্লিউ-১) জন্মনামা (প্রদ-১) প্রমাণ করেন। তিনি (পি, ডব্লিউ-১) জবানবন্দীতে আরো বলেন যে, ঐ জন্মকৃত পুস্তকগুলি স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নেওয়া হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সরকারী নির্দেশ মোতাবেক এই মামলা

রুজু হয়। সাক্ষী কনষ্টেবল আব্বাস আলী (পি, ডব্লিউ-২) তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, ২৮/৩/৮৩ইং তারিখে তিনি সহকারী দারোগা সফিকুল ইসলামের সাথে চিশতির আস্তানায় যান এবং সেখানে ৪টি বই জন্ম করা হয়। তিনি (পি, ডব্লিউ-২) জেরায় বলেন যে, ঐ এলাকার লোকজন তাহাদের কাছে কোন নালিশ করে নাই। তদন্তকারী অফিসার মোঃ আকরাম হোসেন (পি, ডব্লিউ-৩) তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৪/১১/৮৩ইং তারিখের HA/POLL(III) নং স্মারকের নির্দেশ মোতাবেক মামলা রুজু করেন এবং নিজেই তদন্তভার গ্রহণ করেন। তিনি (পি, ডব্লিউ-৩) জবানবন্দীতে আরো বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত স্মারক বিরোধীর বই দুইখানা সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে— “With the deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of the Muslims of Bangladesh, which is an offence punishable U/S 295A B.P.C.”

তিনি (পি, ডব্লিউ-৩) জবানবন্দীতে আরো বলেন যে, তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, সাক্ষীগণের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন, বিরোধীয় বই দুইখানি পর্যালোচনা করেন এবং আসামীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তিনি (পি, ডব্লিউ-৩) তাহার সাক্ষ্যে এমন কোন কথা বলেন নাই যে, এই আসামীর লিখিত বিরোধীয় পুস্তক দুইটি সম্পর্কে কখনো কেহ কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। তিনি (পি, ডব্লিউ-৩) জেরায় বলেন যে, উল্লেখিত বইয়ের ব্যাপারে স্থানীয়ভাবে কোন বিক্ষোভ দেখেন নাই। তিনি (পি, ডব্লিউ-৩) জেরায় আরো বলেন যে, (অভিযোগপত্রে বলা হইয়াছে) এই মর্মে কোন সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই, কারণ যেহেতু সরকার এই ব্যাপারে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিয়া নির্দেশ দিয়াছেন তাই তিনি ইহা প্রয়োজন মনে করেন নাই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৪/১১/৮৩ ইং তারিখের স্মারকের কোথাও উল্লেখ নাই যে, বিরোধীয় পুস্তক দুইটির কোন কোন অংশ বা উক্তি আপত্তিকর। তদন্তকারী অফিসারের চার্জশীটেও বিরোধীয় পুস্তক দুইটির কোন কোন অংশ বা উক্তি আপত্তিকর তাহার কোন উল্লেখ নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের ৩ জন সাক্ষীই পুলিশের

কর্মকর্তা কনষ্টেবল। তাহারা কেহই তাহাদের সাক্ষ্য বিরোধীয় পুস্তক দুইটির কোন্ কোন্ অংশ বা উক্তি আপত্তিকর তাহা উল্লেখ করেন নাই। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার ৩০/১০/৮৪ ইং তারিখের রায়ে বিরোধীয় বই দুইখানির কোন্ কোন্ অংশ বা উক্তি আপত্তিকর পাইয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। বরং তিনি তাহার রায়ে উল্লেখ করেন যে “আসামীপক্ষ সব সময় চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্থানীয়ভাবে কোন লোক বই দুইখানা সম্পর্কে আপত্তি অভিযোগ উত্থাপন করে না। উহার জবাবে বলা যায় যে, বই দুইখানি অনেকটা উচ্চস্তরের ভাবধারায় রচিত যা সাধারণের বোধগম্য না হওয়ারই কথা।”

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পক্ষগণের প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করিয়া আমি সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, আসামী সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতির লিখিত বই দুইখানিতে বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে এমন উক্তি থাকিবার দাবি প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই আপীলকারী আসামীকে দণ্ডবিধির ২৯৫ (এ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন বিধায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত রায় ও দণ্ডদেশ বহাল থাকিতে পারে না।

অতএব,

আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী আপীল মঞ্জুর হয়। এতদ্বারা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের বিগত ৩০/১০/৮৪ ইং তারিখের রায় ও জরিমানা বাতিল করা হইল।

সত্বর নিম্ন আদালতের নথি ফেরত পাঠানো হউক।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত এবং আমা দ্বারা সংশোধনকৃত,

স্বাঃ/মোঃ ফজলুল করিম

অতিঃ দাঃ জজ, ঢাকা

১৬/৯/৯০ ইং

স্বাঃ/মোঃ ফজলুল করিম

অতিরিক্ত দায়রা জজ,

৩য় আদালত, ঢাকা।

১৬/৯/৯০ ইং।

অনুলিপিকারী :

২৪-৯-৯০

৩-১০-৯০

১৩-১১-৯০

তুলনাকারী

১-১২-৯০

হাইকোর্ট ফরম নং (জ) ১৩

ফরম অব অর্ডার সীট

জেলা-ঢাকা

মোকাম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা

আসীনঃ জনাব মোঃ ফজলুল করিম, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ

ফৌঃ আপীল নং ৫৬০/৮৪

সদর উদ্দিন আহম্মদ চিশতি আপীলকারী = বনাম সরকার

১৬/৯/৯০ রায় ভিন্ন কাগজে লিখা হইল। ফৌজদারী আপীল মঞ্জুর

হয়।

এতদ্বারা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের বিগত ৩০/১০/৮৪ ইং তারিখের রায় ও জরিমানা বাতিল করা হইল।

স্বাঃ/মোঃ ফজলুল করিম

অতিঃ দাঃ জজ

তুলনাকারী :

অনুলিপিকারী :